অচ্ছুৎ গল্পকার ও ফাঁসির দড়ি

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

চীনা ভাষার অক্ষর (ক্যারেকটার) হুবহু মুখস্ত করা আর অষ্টপদী নিবন্ধ (পা-কু ওয়েন) চর্চার পরীক্ষা পদ্ধতি সনাতনী চীনা শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি স্বরূপ ছিল। ৪ঠা মে আন্দোলনের পর থেকে সাদামাটা নগণ্য একজন চীনা ব্যক্তিও তাঁর অতীত এবং বর্তমান বিষয়ে সচেতন হল। 'শিন চিঙ্ নিয়েন' আর 'শিন চাও' এর মতো পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করল। মান্ধাতার আমলের চীনা ঐতিহ্য জিজ্ঞাসায় দগ্ধ হতে লাগল। এই জিজ্ঞাসা যেমন একদিকে 'চীনা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' এবং প্রায় লুপ্ত পাণ্ডুলিপির মুদ্রণ কার্যে ব্যস্ত হয়, অন্যদিকে চীনা বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকরা ইউরোপীয় (বিশেষতঃ রুশ সাহিত্যের) অনুবাদে সচেষ্ট হন। ক্রমে গড়ে ওঠে নিজস্ব সাহিত্যের নিরিখ, যে সাহিত্যে গল্প উপন্যাস জোরাল ভূমিকা নেয়। আধুনিক চীনা সাহিত্যের চর্চা (আন্দোলন) দ্বিখণ্ডিত এক আপেল যার এক টুকরোয় রয়েছে চিরায়ত সাহিত্য 'দ্য রোমান্স অফ থ্রি কিংডমস্,' 'অল মেন আর ব্রাদাস" প্রভৃতির পুনর্মুদ্রণ ও অনুবাদ কর্ম। ১৯১৭-২৭ এর এই দশকটিকে চীনারা বলেন: সাহিত্যের বিপ্লব থেকে বিপ্লবী সাহিত্য। আর ১৯২৮ থেকে যে দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত তা মূলতঃ সৃজনশীল লেখা। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত সনাতনী 'ওয়েন ইয়েন' ভাষাই ছিল সাহিত্য এবং সরকারী কাজকর্মের একছত্র অধিপতি। এবং গল্পের আন্দোলন আদতে চীনা সাহিত্য, রেনেশা, বিপ্লব, যাই বলিনা কেন, তার পুরোধা।

সনাতন চীনা সাহিত্যের রাজকীয় দরবারে গল্প অচ্ছুৎ। দরবারী সাহিত্যের মর্যাদা থেকে দীর্ঘকাল বঞ্চিত এক গ্রাম্য পরিব্রাজক। আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় ওই পরিব্রাজক রসিক জনের কাছে নিবেদন করত গল্প, অনায়াস আঙ্গিকে। আর বিংশ শতকের ত্রিশের দশকে গল্প উপন্যাস লেখার জন্যে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হয়েছে কমপক্ষে চল্লিশ জন চীনা গল্পকার এবং ঔপন্যাসিককে।

অন্তবর্তী এই পরিক্রমার মধ্যেই নিহিত রয়েছে দাস অস্তিত্বের গ্লানির বিরুদ্ধে গদ্যকারের প্রতিবাদ যা ৪ঠা মে আন্দোলন থেকে চীন বিপ্লবের বিভিন্ন স্তরের দীর্ঘ যাত্রায় একাগ্র, সামিল। চীনা সাহিত্যে গল্প নিয়ে বিপ্লব কার্যত পরিণত হয় বিপ্লবের গল্পে। সাহিত্যে রেনেশাঁ কেবল সুচারু, মার্জিত অদম্য কৌতূহল বা জ্ঞানের নির্যাস নয়, তা দাবী করে চীন দেশের তামাম মানচিত্র। মান্ধাতার আমলের 'অষ্টপদী নিবন্ধের বিরোধিতা' ক্রমে লেখক বুদ্ধিজীবীকেও দাঁড় করায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, চিয়াঙের কুয়োমিনতাঙ বিরোধী ফাঁসির দড়ির মুখোমুখি, আবার তা বেথুনের মতো মানুষকে টেনে আনে চীন দেশের ভূখণ্ডে।

আধুনিক চীনা গল্প : এডগার স্নো-র সঙ্গে লু শুন-এর আলোচনা

(১৯৩৫ সালে এডগার স্নো 'লিভিঙ চায়না' নামে চীনা গল্পের একটি সঙ্কলন প্রস্তুত করবার সময় লু শুন এর সঙ্গে দেখা করেন। এই গ্রন্থে সংযোজিত নিম্ ওয়েলশ্ লিখিত 'আধুনিক চীনা সাহিত্যের আন্দোলন' নামে একটি প্রবন্ধে এডগার স্নো-র সঙ্গে আলোচনা কালে লু শুন-এর একটি বিবৃতি উদ্ধৃত হয়েছে। চীনা গল্পের এই বাঙলা সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলির রচনা কাল ১৯৪৪ সালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কারণে ১৯৩৫ সালে ব্যক্ত লু শুন-এর নিম্নোক্ত বিবরণ খুবই প্রাসঙ্গিক। —সম্পাদক)

আধুনিক সাহিত্য আন্দোলন শুরু হবার পর এ-পর্যন্ত যেসব লেখকদের আবির্ভাব ঘটেছে তার মধ্যে সম্ভবতঃ মাও তুন, শ্রীমতী তিঙ লিঙ, কুয়ো মো-জো, চাঙ তিয়েন-ঈ, ইয়ং তা-ফু, শেন ৎসুঙ ওয়েন ও তিয়েন চুন-এর নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যেই রয়েছেন সেরা ছোট গল্পকার ও ঔপন্যাসিকরা। এ পর্যন্ত সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ কোন ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব ঘটেনি। শেন ৎসুঙ-ওয়েন, ইয়ু তা ফু, লাও শ ও অন্যান্যদের উপন্যাসগুলি কিন্তু আঙ্গিকের বিচারে আসলে 'নভেলেট' বা বড় গল্প এবং রচয়িতাদের য খ্যাতি সেটা ছোটগল্পকার হিসেবে, উপন্যাস লেখার প্রচেষ্টার জন্য নয়।

চীনা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছোট গল্পের বিকাশ। গঠন ভঙ্গি, বিষয়বস্তু, রচনাশৈলী, বস্তুত পক্ষে সব দিক থেকেই ছোট গল্প ঐতিহ্যগত চীনা সাহিত্য জগতে একেবারে নবাগত। নাটক কিন্তু, সেদিক দিয়ে পুরানো ঐতিহ্যর কাছে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী। আজকের দিনে সেরা নাট্যকাররা হলেন কুয়ো মো-জো, তিয়েন হান, হুঙ শেন এবং সাও ইয়ু নামে এক আধুনিক বামপন্থী লেখক।

কবিতায় পিঙ শিন, কুয়ো মো-জো, হু শি এবং আরো অনেকে ভালই লিখেছেন কিন্তু পরীক্ষানিরীক্ষা বাদে আধুনিক কবিতা একটি ব্যর্থতা।

প্রবন্ধে আমরা এর চেয়ে ভাল কাজ করেছি। গুরুত্বপূর্ণ প্রাবন্ধিক হিসেবে চৌ শো-জেন, লিন্ ইয়ু-তাঙ, চেন তু শিউ এবং লিয়াঙ চি-চাও'-এর নাম করা যায়।

বর্তমানে আমাদের সেরা লেখকরা প্রায় বিনা ব্যতিক্রমে সবাই বামপন্থী। মনে হয় এরকম হবার কারণ হল এই যে, একমাত্র এদের লেখার মধ্যেই রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা যা সত্যিই বুদ্ধিজীবীদের আগ্রহ জাগাতে পারে। সেরা বামপন্থী লেখকদের মধ্যে আছেন মাও তুন, শ্রীমতী তিঙ লিঙ, শা টিঙ, রৌ শ্র, কুয়ো মো-জো, চাঙ তিয়েন চ্যান, ইয়ে ৎজু, আই উ ও চৌ ওয়েন। তিয়েন চ্যান-এর (যার আসল নাম সিয়াও চ্যান) স্ত্রী সিয়াও হুঙ আমাদের মহিলা লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাবনাময়। তাঁর লেখা দেখে মনে হয় হয়তো তিনি তিঙ লিঙ-এর চেয়েও এগিয়ে যেতে পারবেন। যেমন তিঙ লিঙ একদিন পিঙ শিন-কে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছলেন।

চীনের পক্ষে আজ যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন বুর্জোয়া বিকাশের পর্ব অতিক্রম করা সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে খাঁটি বুর্জোয়া ক্রমবিকাশের পর্ব অতিক্রম করা। আমাদের সে সময়ও নেই, আর ভালমন্দ বেছে নেবার সুযোগও নেই। আজকের দিনে চীনে কেবল একটি সংস্কৃতিই সম্ভব, বামপন্থী বিপ্লবী সংস্কৃতি। আর এর বিকল্প হল: উপনিবেশ হিসেবে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতিকে স্বীকার করে নেওয়া। অর্থাৎ স্বাধীন বা জাতীয় সংস্কৃতি বলে কিছু না থাকা। সারা দুনিয়া যখন এরোপ্লেন ব্যবহার করছে, চীন তখন গায়ে-চাকা লাগানো স্টীমার ব্যবহার করতে পারেনা। এ কথাটা কর্মক্ষেত্রে যতটা সত্যি, তেমনি সত্যি শিল্পক্ষেত্রে। বিশ্বের পরিস্থিতি অনুযায়ী আজ যা সবচেয়ে মূল্যবান ও অর্থবহ তার ওপর আমাদেরও ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে অগ্রণী হয়ে।

ঠিক এই কারণেই সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক ধ্যানধারণা থেকে প্রলেতারিয়ান সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণার জগতে এই যে ঝাঁপ; তার জন্যেই আধুনিক চীনা সাহিত্যের ভিতটা মজবুত নয়। এদিক দিয়ে চীনা সাহিত্যের বিকাশের ধারা বোধ হয় অনন্য। রেনেশাঁস আন্দোলনের একেবারে শুরু থেকেই তীব্র বামপন্থী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এটা একটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে চীনে কোন গুরুত্বপূর্ণ বুর্জোয়া লেখকের আবির্ভাব ঘটেনি। এমনি কি লিন ইয়ু-তাঙকেও ওই গোত্রে ফেলা যায় না। সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশ থেকে উদ্ভূত প্রাচীন পণ্ডিতীয়ানার যে সাহিত্যিক ঐতিহ্য আছে তার মধ্যেই তাঁর অবস্থান, আধুনিক বুর্জোয়া চিন্তাজগতে নয়। বস্তুতপক্ষে আধুনিক বুর্জোয়া চিন্তাধারা তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্য। পিঙ শিন-এর অবস্থান-

ও বুর্জোয়াদের মধ্যে নয়। তাঁর রচনায় কখনোই কোন সাংস্কৃতিক সমস্যা স্থান পায়নি। তাঁর বেশীর ভাগ রচনাই শিশুদের জন্য।

একই সঙ্গে এটাও অতি সত্যি যে চীনের কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে থেকে আজো কোন প্রকৃত প্রলেতারিয়ান লেখকের আবির্ভাব ঘটেনি। বামপন্থী সাহিত্য এখনো বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী এবং পেটি বুর্জোয়াদের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

চীনা সাহিত্য ও সমাজে উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী

১৯১৭	কথ্য ভাষাকে (পাই-হুয়া) সাহিত্যের মাধ্যম করার জন্য হু শি'র আন্দোলন।
মে ১৯১৮	নিউ ইয়ুথ পত্রিকায় লু শুন-এর 'উন্মাদের রোজনামচা' গল্পটি প্রকাশিত।
১৯১৯	৪ঠা মে র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন।
৩রা জুন ১৯১৯	আন্দোলনে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর যোগদান। '৪ঠা-মে আন্দোলন' সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত।
১৯২০	কুয়ো মো-জো পরিচালিত 'ক্রিয়েশান সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত।
জানুয়ারী ১৯২১	মাও তুন সহ বারো জন সদস্য কর্তৃক পিকিঙে 'লিটারারি রিসার্চ সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত। পরে শাংহাইয়ে স্থানান্তরিত। লু শুন রচিত 'আ কিউ-এর সত্য কাহিনী' প্রকাশিত ও পাই-হুয়া আন্দোলনের সার্থকতা স্বীকৃত।
১লা জুলাই ১৯২১	আনুষ্ঠানিক ভাবে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত।
১৯২২	'ক্রিয়েশান কোয়ারটারলি' পত্রিকা প্রকাশিত।
১৯২৩	ক্রিয়েশান সাপ্তাহিক-এ কুয়ো মো জো 'বিপ্লবী সাহিত্য'-র শ্লোগান তোলেন।
	নিউ ইয়ুথ পত্রিকায় বিপ্লবী সাহিত্যের তাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত।
	লু শুন-এর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'না হান' প্রকাশিত ও ব্যাপক ভাবে সমাদৃত।

১৯২৪ প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ শুরু। উত্তর চীনের যুদ্ধবাজ সামন্ত সরকারের বিরুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালনা করেন বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ।

লু শুন কর্তৃক 'টাটলার' সংস্থা গঠন ও 'টাট্লার সাপ্তাহিক (পরে পাক্ষিক) প্রকাশিত।

১৯২৫ মর্ডান রিভিউ পত্রিকায় হু শি প্রত্যক্ষভাবে ছাত্র আন্দোলনের বিরোধিতা করেন ও যুদ্ধবাজ সামন্ত প্রভুদের পক্ষ নেন।

৩০ শে মে আন্দোলন ক্রিয়েশান সোসাইটির বিপ্লবে যোগদান। কুয়ো মো জো, চাও ফাঙ-য়ু-র প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধে যোগদান।

১৯২৭ জনপ্রিয় সাহিত্যের জিগির তুলে লু শুন'কে আক্রমণ করে নিবন্ধ রচিত। বিপ্লবী সাহিত্য যুগের শুরু।

১৯২৮ চিয়াঙ কাই-শেক জাতীয় সরকারের একনায়ক হয়ে বসেন। চিঙকাঙশানে চু তে ও মাও সে-তুঙ মিলিত হয়ে প্রথম লাল ফৌজ গঠন করেন।

১৯৩০ জাতীয় সাহিত্য আন্দোলন।

লু শুন যথার্থ অর্থে বিপ্লবী দর্শনে বিশ্বাসী হন।

২রা মার্চ ১৯৩০ বামপন্থী লেখকদের লীগ গঠন : লু শুন, মাও তুন, য়্যু তা-ফু, শেন তুয়ান-শিয়েন, চিয়াঙ কুয়াঙ-ৎজু, রৌ শ্র প্রভৃতি পঞ্চাশ জন সদস্য।

১৯৩১ জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ। চিয়াঙ কাই-শেক কর্তৃক সাময়িক ভাবে লাল ফৌজের বিরুদ্ধে আক্রমণ স্থগিত।

১৯৩২ জাপানের শাংহাই আক্রমণ ও কুয়োমিনতাঙের 'নীল কুর্তা' বাহিনীর সাহায্যে জাপানীদের কমিউনিস্ট নিধনের চেষ্টা।

নভেম্বর ১৯৩৩ শাংহাইয়ে কুয়োমিন্তাঙের দালালদের দ্বারা ই হুয়া ফিলম কম্পানি, কয়েকটি বইয়ের দোকান, সিনেমা ও থিয়েটার আক্রান্ত।

১৯৩৪ কেবলমাত্র শাংহাইয়ে লু শুন, কুয়ো মো-জো, মাও তুন, পা চিন প্রভৃতি লেখকের ১৪৯টি গ্রন্থ কুয়োমিনতাঙ কর্তৃক নিষিদ্ধ।

১৯৩৫ লঙ মার্চের শুরুতে মাও ৎসে-তুঙ পার্টির ও সৈন্য বাহিনীর কার্যকর নেতা নির্বাচিত। দক্ষিণাঞ্চলের

বাহিনী মাও-এর নেতৃত্বে ৬০০০ মাইল পথ পায়ে অতিক্রম করে এক বছর বাদে উত্তর-পশ্চিম চীনের ঘাঁটি অঞ্চলে পেঁছিয়। জাপান চীনকে দুই অংশে ভাগ করার দাবি জানায়। ৯-ই ডিসেম্বর পিকিঙের ছাত্র বিক্ষোভ সারা দেশ জুড়ে জাপান-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঢেউ তোলে। চিন্তাধারা সংশোধনের নামে কুয়োমিনতাঙের 'নীল কুর্তা' ফ্যাসিস্ট বাহিনী দু'শো জন সাহিত্যিক, ছাত্র, শিল্পী ও অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করে তিয়েন্‌সিনে।

১৯৩৬ কুয়োমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে 'জাপানী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্য'।
অক্টোবরে মতামত প্রকাশের ও স্বাধীনতার পক্ষে ও বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে লেখক ও শিল্পীদের ঐক্যের ঘোষণা।

১৯৩৭ জাপানের ব্যাপক ভাবে চীন আক্রমণ। লাল ফৌজের নতুন নামকরণ 'অষ্টম রুট বাহিনী' ও 'নতুন চতুর্থ বাহিনী'।

১৯৩৮ মাও ৎসে-তুঙ পার্টির অবিসংবাদিত নেতা নির্বাচিত। জাপানের উত্তর চীন দখল। চিয়াঙ বাহিনীর পশ্চাদ-অপসারণ। কমিউনিস্টরা শত্রু কবলিত অঞ্চলের মধ্যেও প্রস্তুতি চালিয়ে যায়।
শত্রুকে প্রতিরোধ করার জন্য সারা দেশ জুড়ে চীনা লেখক শিল্পী ফেডারেশন গঠিত।

১৯৪০-৪১ কমিউনিস্টদের ও চিয়াঙ কাই-শেকের জাতায়তাবাদীদের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন। মার্কিনী সাহায্য পুষ্ট চিয়াঙ বাহিনীর 'নতুন চতুর্থ বাহিনী'কে আক্রমণ।

২রা মে ১৯৪২ শিল্পকলা বিষয়ে ইয়েনানে মাও ৎসে তুঙের বক্তৃতা।

১৯৪৩ চিয়াঙের প্রভাব ক্রমশঃ পড়তির দিকে। কমিউনিস্ট পার্টির বিপুল সদস্য বৃদ্ধি, ফৌজে পাঁচ লক্ষ সৈন্য এবং মুক্তাঞ্চলের অধিবাসীদের সংখ্যা এক হাজার লক্ষ।

১৯৪৫ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়। মার্কিন অস্ত্র সজ্জিত চিয়াঙ বাহিনীর বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট বাহিনীর

উত্তর চীন ও মাঞ্চুরিয়া অভিযান।
মার্কিন সরকারের উদ্যোগে ইয়েল্টা চুক্তি।

১৯৪৬ জাতীয়তাবাদী ও কমিউনিস্টরা যুক্ত সরকার গড়ায় অরাজী।
জুনে শুরু দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ যা মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত।

১৯৪৭ জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে রণনীতি ও কৌশল নির্ধারণ করেন মাও ৎসে-তুঙ।

১৯৪৮ মার্কিন সাহায্য সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদীদের চূড়ান্ত পরাজয়।

১৯৪৯ চিয়াঙ কাই শেকের তাইওয়ানে পলায়ন। গণমুক্তি ফৌজের চরম বিজয়।
মার্চে মাও ৎসে-তুঙের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পিকিঙ আগমন।

১৯৪৯ থেকে……গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের জয়যাত্রা

নিহত সাংস্কৃতিক কর্মীর একটি আংশিক তালিকা

১৯১৮ জেন্ কুয়ো চেন।

১৯৩০ ৎসাঙ্ হুই (বামপন্থী লীগের নাট্যকার। নানকিঙে খুন করা হয়েছিল)

৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ নিম্নোক্ত ছ'জনকে দিয়ে নিজের হাতে তাদের কবর খোঁড়ানো হয় তারপর তাদের বধ করা হয়—

রৌ শ্রি (বয়স ৩০)

ফেঙ কুং (মহিলা ঔন্যাসিক। বয়স ২৪)

ৎসুঙ হুই (বয়স ২১)

ইন ফু (বয়স ২২)

লি ওয়েই সেন (বয়স ২৮)

হু ইয়ে পিঙ (বয়স ২৬। লেখিকা তিঙ লিঙের স্বামী)

১৯৩৩ ডক্টর ইয়াঙ চিয়েন (বিজ্ঞানী)

তিঙ চিন (মে মাসে তিঙ লিঙের সঙ্গে পালাবার সময়) তাই চিঙ চুন।

পান ৎজু-নিয়েন।

ৎসু চু-পো।

১৯৩৪ হুঙ লিঙ-ফাই।

১৯৩৫ লিউ ইয়েন পেঙ-ৎজু।

পান শুন (পান শিয়েন) (ন' দিন অনাহারে রেখে হত্যা)

১৯৪৫ য়্যু তা-ফু (শিঙ্গাপুরে জাপানী কন্‌সেন্‌ট্রেশান শিবিরে নিহত)

……ও আরো বহু, বহু অজানা মানুষ।

পর্যন্ত এখন তারা পড়াচ্ছে বলে সেই জন্যে টাকা চাইছে! বস্তুগত লাভ ছাড়া ওরা আর কিছু কেয়ার করে না—বস্তুবাদ বিষিয়ে দিয়েছে ওদের। নিজের কাজের মধ্যে দিয়ে তুমি ভাই যে সুন্দর আদর্শ স্থাপন করছ, জনগণের নৈতিক চরিত্রের ওপর তার দারুণ এক হিতকর প্রভাব পড়বেই। যে সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তনের দাবিতে সবাই এখন সোচ্চার, সে কথাটাই একবার ভেবে দেখ। এটি যদি প্রবর্তিত হয় তাহলে কত শত শিক্ষকের প্রয়োজন পড়বে। আর তারা যদি এই অধ্যাপকদের মতো খেতে চায়, তখন? যা দুর্দিন, অত খাদ্যবস্তু আসবে কোত্থেকে? এই শঠ পৃথিবীটাতে তোমার মতো মহৎ চরিত্রের জুড়ি মেলে না—'মাঝনদীতে এক নিঃসঙ্গ শিলা'র মতো। প্রশংসনীয়! প্রশংসনীয়! লেখা-পড়া কিছু করেছ? যদি করে থাকো তো বলো, আমি তোমায় একটা কলেজের অধ্যক্ষ হবার জন্য আমন্ত্রণ জানাবো। শীগ্‌গিরই খুলবো কলেজটা। 'চারখানা পুঁথি'* যদি পড়া থাকে তাহলেই কাজ চলে যাবে। এত গুণ তোমার—ছাত্রদের সামনে চমৎকার এক উদাহরণ খাড়া করতে পারবে!

"পারবে না? শরীর ভাল নেই বড়ই? দুঃখের কথা! বড়ই দুঃখের কথা! এতেই বোঝা যাচ্ছে, সমাজের জন্যে নিজেকে যে উৎসর্গ করে দিয়েছে তাকেও কিন্তু নিজের শরীরের যত্ন না নিলে চলে না। বড়ই দুঃখের কথা যে এই ভাবে তুমি শরীরটাকে উপেক্ষা করেছ! এ কথা যেন ভেবে বসো না যে আমার হৃষ্ট-পুষ্টির কারণ সুখী জীবনযাপন। বস্তুত এ কেবল স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অবদান, বিশেষ করে মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান। 'ভদ্রলোক মাত্রেই সত্যাসত্য নিয়ে চিন্তিত, দারিদ্র্য নিয়ে নয়।' কিন্তু তুমি যে কমরেড সব পরিত্যাগ করেছ এটাও খুব গৌরবজনক। বড়ই দুঃখের কথা এখনো তোমার একখানা পাতলুন রয়েছে। এর জন্যে না আবার ইতিহাসে তোমার নামের পাশে একটা কলঙ্ক চিহ্ন থেকে যায়!

"ও হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। তোমায় আর বলে দিতে হবে না। জানা কথা তুমি এই পাতলুনটাও চাও না—সব কাজই একেবারে নিখুঁত ভাবে সারতে চাও। খুব স্বাভাবিক। বুঝতে পারছি এখনো ওটা কাউকে দেবার সুযোগ পাওনি। নিজেও আমি চিরকাল সর্বস্ব ত্যাগে বিশ্বাসী এবং অন্যদেরও এবংবিধ সৎ কাজে সাহায্য করতেই ভালবাসি। তা ছাড়া তোমার আমার মধ্যে কমরেডের সম্পর্ক—আমার কর্তব্যই হল, তোমাকে একটা সন্তোষজনক পথ বাতলে দেওয়া। মানুষের জীবনের সমাপ্তি পর্বটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে! একবার একটা ভুল পদক্ষেপ করেছ কি, বৎস—সব হয়তো মাটি করে বসবে।

---

* চারখানা কনফুসীয় ক্লাসিক—'মহৎ শিক্ষা', 'মধ্যপন্থার নীতি', 'অ্যানা-লেক্টস' ও 'মেনসিউস'।

"ঠিক সময় মতো হয়েছে যাহোক—আমাদের বাড়ির একটি বাঁদী মেয়ের একখানা পাতলুনের দরকার ছিল···। অমন করে আমার দিকে তাকিও না বন্ধু, মানুষ কেনাবেচার আমি ঘোর বিরোধী, ব্যাপারটা এত অমানবিক না! কিন্তু সেবার দুর্ভিক্ষ হল আর তারপর থেকেই মেয়েটা আমার কাছে গচ্ছিত রয়েছে। আমি যদি ওকে না নিতাম তো ওর বাপ-মাই ওকে পতিতালয়ে বেচে দিত। ভেবে দেখ, সেটা কি দুঃখের ব্যাপারই না হত! তাই শুধুমাত্র দয়াবশত ওকে রেখেছি। তাছাড়া একে তো আর কেনা বলে না—ওর বাপ-মাকে শুধু ক'টা ডলার দিয়েছিলাম এবং তারা ওকে আমার কাছে রেখে গেছল। এই তো ব্যাপার। ইচ্ছে ছিল ওকে নিজের মেয়ের মতোই, না না, বোনের মতোই দেখব। দেখব নিজের রক্ত-মাংসের একজন হিসেবেই। দুর্ভাগ্য, আমার পত্নী আবার এক সেকেলে মহিলা, এসব কথা শুনতে চান না। তুমি তো জানো, একজন সেকেলে মহিলা যদি জেদ ধরে তাহলে কি ঝামেলাটাই হয়। এখন তাই অন্য একটা উপায় বার করবার চেষ্টা করছি, যাতে···

"কিন্তু বহুদিন যাবৎ মেয়েটার একটাও পাতলুন নেই। আমি জানি উদ্বাস্তুদের এই মেয়েটিকে তুমি খুশি মনেই সাহায্য করবে। দু'জনেই আমরা গরীবের বন্ধু। তাছাড়া এ কাজটা সেরে ফেলা মানেই একটা মহান জীবন তার চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করল। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার নামে একটা চিত্তাকর্ষক ব্রোঞ্জের মূর্তি বানিয়ে দেবো, আকাশ ছোঁবে সেটা। আহ্, দরিদ্ররা শ্রদ্ধায় তার সামনে মাথা নত করবে···

"এই তো—জানতাম তুমি রাজী হবে। তোমার আর মুখ ফুটে বলার দরকার নেই। যাই হোক, পাতলুনটা এখানে যেন আবার খুলে ফেলো না! বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যে রকম বেশভূষা পরেছি তাতে এখন যদি ওই ছেঁড়াখোঁড়া পাতলুনটা বয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে লোকে ভুরু কুঁচকে তাকাবে এবং আমাদের 'স্বার্থত্যাগ করো' অভিযান এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। একালের লোকগুলো সব আস্ত নির্বোধ। ভাবো একবার, শিক্ষকরা অবধি খেতে চাইছে—কদর বুঝবে কি করে শুনি আমাদের উদ্দেশ্যর বিশুদ্ধতার? ঠিক ওরা ভুল বুঝে বসবে আর তুমি বন্ধু তখন ভালো কিছু করতে তো পারবেই না, উল্টে মন্দ করে বসতে পারো।

"কয়েক পা হাঁটতে পারবে কোন রকমে? না? ঝামেলা বাধালে একটা! হামাগুড়ি দিতে পারবে? বেশ। তাহলে হামাগুড়ি দাও। শক্তি থাকতে থাকতে হামাগুড়ি দিয়ে ওখানে পৌঁছতে চেষ্টা করো। মনে জোর রাখো, শেষ মুহূর্তে যেন ভরাডুবি না হয়। আর হামাগুড়ি দেবার সময় খেয়াল

রাখবে যাতে হাঁটুর ওপর বেশি ভর না পড়ে, আঙুলে ভর রেখে এগোবে। নয়তো পাথরকুচি আর খোয়ায় লেগে পাতলুনটা ছিঁড়ে যাবে, আরো জীর্ণ হয়ে পড়বে। উদ্বাস্তুদের গরীব মেয়েটির তাহলে আর বিশেষ কোন লাভ হবে না, তোমার সব প্রয়াসও বৃথাই যাবে। এখনই পাতলুন খুলে ফেলাটা ভাল হবে না। প্রথমত দেখাবে খারাপ, দ্বিতীয়ত—পুলিসী হস্তক্ষেপের ভয় আছে। কাজেই পাতলুন পরেই হামাগুড়ি দাও। আমরা দু'জনা তো আর অপরিচিত কেউ নই বন্ধু, কেন ঠকাবো তোমায় বলো? পূবদিকে গিয়ে উত্তর দিকে মোড় নেবে, তারপর দক্ষিণ দিকে। দেখবে রাস্তাটার উত্তর প্রান্তে একটা লালরঙা গেট আর দুটো শোফরা গাছ আছে—এই হল তোমার গন্তব্যস্থল। ওখানে পৌঁছেই পাতলুনটা খুলে নেবে আর দ্বাররক্ষীকে বলবে তোমার মনিব এটা তোমার মাইজির কাছে দিয়ে আসতে বলেছেন। দ্বাররক্ষীর সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র এটা বোলো কিন্তু, নয়তো ভিখিরি ভেবে প্রহার লাগাতে পারে। আহ্, কিছুদিন যাবৎ ভিখিরির সংখ্যা এত বেড়েছে না–কাজও করবে না লেখাপড়াও করবে না, খালি ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে! আমার দ্বাররক্ষী তাই ওদের একটা উচিত শিক্ষা দিতে উত্তম মধ্যম লাগায়। তবেই না জানতে পারবে যে ভিখিরিদের মার খেতে হয়। তবেই না বুঝবে যে কাজ করা বা পড়াশোনা করাটাই সবচেয়ে ভাল…

"চললে তাহলে? ভাল, ভাল! কিন্তু কাজটা শেষ হবার পর হামাগুড়ি দিয়ে সরে পড়তে কালবিলম্ব কোরো না, বাড়ির চত্বরের মধ্যে থেক না। ন'দিন কিছু খাওনি, কিছু যদি ঘটে তো গাদা ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে। জনগণের হিতার্থে যে মূল্যবান সময়টা এমনিতে আমি উৎসর্গ করি তার বেশ খানিকটা খোয়াতে হবে তখন। আমরা দুজন তো আর অপরিচিত মানুষ নই, তাই আমি জানি যে নিজের কমরেডকে তুমি বিপদে ফেলতে চাইবে না। যাক্—এসব বাজে কথা এখন থাক।

"এগোতে শুরু করে দাও তাহলে! বেশ বেশ! তোমার জন্যে একটা রিক্সা ডেকে দিতে পারতাম ঠিকই, কিন্তু জানি তো, পশুর জায়গায় মানুষ মানুষকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এ তুমি সহ্য করতে পার না। সত্যিই, ব্যাপারটা একেবারেই অমানবিক। আমি এখন চললাম তাহলে। তোমার এবার গাত্রোত্থান করা উচিত। কিন্তু অমন ক্লান্ত আর দুর্বল দেখাচ্ছে কেন হে? হামাগুড়ি দাও বন্ধু! চটপট কমরেড, হামাগুড়ি দিয়ে পুব দিকে এগিয়ে চলো…"

অনুবাদ / সিদ্ধার্থ ঘোষ

উৎসবের দিন ॥ লু সুন

"তফাত নেই বললেই চলে—"এই অভিব্যক্তিটির প্রতি সম্প্রতি ফাও শুয়ান্‌-চি-ও অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে পড়েছেন। এটা এখন তাঁর এক প্রকার মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেছে। শুধু যে কথার ফাঁকে ফাঁকেই এটির আবির্ভাব ঘটে তা নয়, এটি এখন তাঁর চিন্তাধারাকেও নিয়ন্ত্রিত করছে। আগে ওনার প্রিয় অভিব্যক্তি ছিল—"এ তো একই ব্যাপার—"। বর্তমানে খুব সম্ভবত এটিকে অনুপযুক্ত জ্ঞানে উনি "তফাত নেই বললেই চলে—" কথাটি ব্যবহার করছেন।

এই আবিষ্কারের পর থেকেই সরস সরল সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তিটি যেমন তাঁর বহু দীর্ঘশ্বাসের কারণ হয়েছে, আবার সেই সঙ্গে এটি তাঁকে স্বস্তিও দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বয়স্ক লোকেরা তরুণদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে দেখলে আগে উনি ক্রুদ্ধ হতেন। এখন কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণ গভীর চিন্তার শেষে উনি এই সিদ্ধান্তে পেঁছিন যে আজকের তরুণেরা যখন পিতা হবে তারাও তখন ঠিক এই ভাবে কর্তৃত্ব জাহির করবে। এই চিন্তা তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করে. বিক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করে।

উদাহরণ আরো আছে। উনি যখন দেখেন কোন সৈন্য একটা রিক্সা-ওলাকে মারছে, উনি আর আগের মতো ক্ষেপে যান না। উলটে চিন্তা করেন, রিক্সাওলাটা যদি সৈন্য হত আর সৈন্যটা রিক্সাওলা, তাহলেও এরা ঠিক এই ভাবেই একে অন্যকে পেটাত। এই সান্ত্বনাপ্রদ চিন্তা ওনার মনকে প্রশান্ত রাখে। এইভাবে যুক্তি প্রয়োগ করার সময় কালেভদ্রে অবশ্য ওনার মনে হয় যে সামাজিক পাপাচারের বিরুদ্ধে লড়বার সাহস নেই বলেই বোধহয় উনি নিজের চেতনাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে এই পন্থা বার করেছেন।

উনি ভাবেন, "আমি বোধহয় 'সু'ও'কু'-এর সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়েছি এবং এখন সর্বাগ্রে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ানো উচিত।" কিন্তু উনি যাই ভাবুন না, এযাবৎকাল নতুন মুদ্রাদোষটি তাঁর মস্তিষ্কের মধ্যে আরো গভীরে শিকড় বিস্তারে কোন বাধা পায়নি।

সর্বজনসমক্ষে তিনি তাঁর এই "তফাত নেই বললেই চলে—"শীর্ষক তত্ত্বটি সর্বপ্রথম পেশ করেন পিকিঙের "প্রধান মহত্ত্ব" স্কুলে, তাঁর ক্লাসের ছাত্রদের কাছে। একটা ঐতিহাসিক ঘটনা না কি যেন নিয়ে তখন আলোচনা হচ্ছিল।

উনি বললেন, 'কী প্রাচীন, কী আধুনিক, বিভিন্ন কালের মানুষের মধ্যে তফাত নেই বললেই চলে। এমনিতে যতই পৃথক বলে মনে হোক, সবারই এক চরিত্র।'

তারপর তিনি ছাত্রসমাজ ও সরকারী নীতির বিষয়ে আলোচনা শুরু করার পর এই বক্তৃতা চরমে পেঁছল।

"আজকালকার ফ্যাশানই হচ্ছে সব দোষ সরকারী কর্মচারীদের ঘাড়ে চড়ানো।" প্রতিপক্ষদের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রবল আক্রমণ। "ছাত্ররাই আবার বিশেষ ভাবে ওদের ওপর ক্ষুব্ধ। কিন্তু ঠিকমত চিন্তা করলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে সরকারী কর্মচারীরা কোন বিশেষ গোত্রের মানুষ নয়, আর পাঁচজনের মতো ওরাও তো মানুষেরই বংশধর। আজ যারা সরকারী কর্মচারী, কাল তারা অনেকেই ছাত্র ছিল। তাছাড়া সাবেকী আমলের সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গেও এদের কোন তফাত নেই বললেই চলে। মানুষ অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেয়—তাই চারপাশের মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলোই এদের চিন্তায়, কথায়, আচরণে ও অভ্যাসে ফুটে উঠেছে। দেখো একবার, ছাত্র সংগঠনগুলো কি কাণ্ডটাই না করবার চেষ্টা করছে। এরাও কি বহু ভুল করছে না? ছাত্রদের বহু কার্যকলাপই কী বৃথা যায়নি?…আর দুঃখ বেশি হয় এর জন্যেই যে, এই ছাত্ররাই আসলে দেশের ভবিষ্যৎ।"

শ্রোতৃমণ্ডলী বলতে জনা কুড়ি ছাত্র ক্লাসঘরের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে ছিল। ওদের কেউ তাঁর কথা শুনে বিমর্ষ হয়ে পড়ল, হয়তো বা তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে মতেও মিলেছে। অন্যেরা একেবারে ক্রুদ্ধ। "পবিত্র তরুণদের" ওপর এই অপমান স্তূপীকৃত করায় বিক্ষুব্ধ। কয়েকজন আবার হাসছে, ওদের বোধহয় ধারণা উনি নিজের সাফাই গাইছেন, কারণ ফাঙ শুয়ান্-চি-ও শুধু শিক্ষকতাই করেন না, সেই সঙ্গে একটি সরকারী পদেও তিনি অধিষ্ঠিত।

ছাত্ররা সকলেই ভুল বুঝেছিল। তাঁর কথাগুলো আক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়, স্রেফ্ ফাঁকা বুলি আওড়ে অসন্তোষ ব্যক্ত করা। ও'র দৌড়ও এই অবধিই। অসন্তোষ না নির্বুদ্ধিতা ঠিক কোন্‌টার জন্য না জানলেও এটা উনি আন্দাজ করেছিলেন যে নিজে তিনি খাটিয়ে মানুষ নন। একবার তাঁর বিভাগের কর্তা তাঁকে "পাগল" বলেছিল। এর প্রতিবাদে তিনি ঠোঁট দুটোকেও নাড়াননি। যতক্ষণ চাকরিটা বহাল থাকছে আর সরকারী কর্মচারী হিসেবে মাইনে পেয়ে কষ্টেসৃষ্টে চালিয়ে যেতে পারছেন ততক্ষণ তিনি কিছু করতে রাজী নন। শিক্ষকরা ছ'মাসের ওপর যখন মাইনে পায়নি তিনি একটি টুঁ শব্দ উচ্চারণ করেননি। উপরন্তু শিক্ষকরা যখন

জোট বেঁধে বকেয়া মাইনে দাবি করল, তিনি মনে মনে তাদের অমার্জিত ও গোলযোগ সৃষ্টিকারী বলে দোষারোপ করলেন। এরপর কিন্তু তিনি শুনলেন, কিছু সরকারী সহকর্মী শিক্ষকদের বিদ্রূপ করতে গিয়ে অত্যন্ত কটু মন্তব্য করছে। এবার তিনি উপলব্ধি করলেন যে এরাও খুব বাড়াবাড়ি করছে। অবশ্য পরে পুরো ঘটনাটা পুনর্বিবেচনা করে তিনি স্থির করেছেন যে সে-সময়ে অর্থাভাবে পড়ার জন্যই তাঁর এসব কথা মনে হয়েছিল। বোধশক্তির অভাবের জন্য তিনি তাঁর সরকারী সহকর্মীদের মার্জনা করে দিয়েছেন।

অত্যন্ত অভাবে পড়েও উনি শিক্ষক সংগঠনে যোগ দেননি। তা সত্ত্বেও শিক্ষকরা যেই হরতাল শুরু করল তিনিও ক্লাস নেওয়া বন্ধ করলেন। শেষকালে শোনা গেল সরকার শিক্ষকদের বলেছেন, "টাকা দেওয়া হবে কিন্তু তার আগে ক্লাসে পড়ানো শুরু করতে হবে।" অতঃপর তিনি "ক্ষুধার্ত বাঁদরদের সামনে ফল ধরে তাকে উত্যক্ত করার" এই সরকারী নীতির প্রতি কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ বোধ করলেন। তবু তিনি মুখ খোলেননি। মুখ তিনি খুললেন যখন জানতে পারলেন এক "খ্যাতনামা" শিক্ষাবিদ মন্তব্য করেছেন যে শিক্ষকদের পক্ষে "এক হাতে কেতাব নিয়ে অন্য হাত অর্থের জন্য বাড়িয়ে ধরা" একটি "হীন" কাজ। তিনি মুখ খুললেন ঠিকই কিন্তু সে শুধু তাঁর স্ত্রীর কাছে।

"শুনছো! আজ কেবল দুটো পদ রান্না হল যে?" দুপুর বেলা খাবারের থালার দিকে তাকিয়ে উনি কৈফিয়ত তলব করলেন। আজই তিনি ওই "হীন" উপাধির কথা শুনেছেন।

এই দম্পতি হাল ফ্যাশানের কিছুই রপ্ত করতে পারেনি তাই ফাঙ শুয়ান্-চি-ও-য়ের এমন কোন মনোরম নাম নেই যা ধরে স্বামী তাঁকে সম্বোধন করবেন। সাবেক প্রথা অনুযায়ী "গিন্নি" বলে ডাকা চলে কিন্তু সেটা বড়ই সেকেলে ধরনের ব্যাপার। "শুনছো" কথাটার আবিষ্কার তাই প্রয়োজনে পড়ে। ওদিকে তাঁর স্ত্রীর ভাগ্যে কিন্তু একটা "শুনছো" গোছের শব্দ অবধি জোটেনি যে স্বামীকে সম্বোধন করবেন। তবে কথা বলতে বলতে তিনি যখন স্বামীর দিকে ঘাড় ফেরান, ফাঙ শুয়ান্-চি-ও অভ্যাসবশতই ধরে নেন যে কথাটা তাঁকে উদ্দেশ্য করেই বলা হচ্ছে।

টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে উনি স্বামীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "গত মাসে তো মাইনের পনের শতাংশ মাত্র পেয়েছ। সবই খরচ হয়ে গেছে। কাল আবার ধারে চাল কিনতে হয়েছে। ধারে কিছু কিনতে যাওয়া যে কী ঝকমারি কাণ্ড!"

"ওরা কী বলছে জানো এখন? কাজ করে বলেই শিক্ষকরা যে তার দোহাই দেখিয়ে পয়সা চাইবে এটা নাকি একটা 'হীন' ব্যাপার। ওরা কী এই সরল সত্যটাও বোঝে না যে মানুষ না খেয়ে বাঁচতে পারে না! আর খেতে হলে লাগবে চাল, আর চালের জন্যে লাগবে পয়সা…"

"ঠিক বলেছ। পয়সা না পেলে চাল কিনব কি করে, আর চাল না পেলে কি করে…"

স্ত্রীর কথা শুনেই প্রচণ্ড বিরক্তিতে তাঁর গালদুটো কেমন চুপসে যায়। তাঁর প্রিয় তত্ত্ব আর স্ত্রীর কথার মধ্যে "তফাত নেই বললেই চলে"। অতঃপর উনি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসেন। প্রকারান্তরে একটি আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা করার সময় উনি এই রীতিটাই অনুসরণ করেন।

একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে শিক্ষকরা এরপর সরকারের কাছ থেকে সামান্য কিছু টাকা পেয়ে গেলেন। অবশ্য তার আগে তাঁরা দলবদ্ধভাবে মিছিল করে "নিষিদ্ধ শহরের সিনহুয়া তোরণের" সামনে এসে বকেয়া মাইনে মেটানোর জন্য দাবি জানিয়েছিলেন। সেদিন শীতল বাতাস আর অবিশ্রাম বৃষ্টির মধ্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের মাথায় "জাতীয়" সৈন্যেরা বাড়ি কষিয়েছিল। ফাঙ কিন্তু কিছুটি না করে শুধু ঘরে বসেই তাঁর নিজের ভাগের বরাদ্দ টাকা পেয়ে গেছেন। টাকাটা তিনি কিছু কিছু ধার মেটাতে খরচ করেছেন। কিন্তু এখনো তাঁর অনেক টাকা প্রয়োজন। সরকারী কর্মচারীদের মাইনে এখনো বাকি পড়ে আছে বলেই বর্তমানে তাঁর এই দুর্গতি। এতদিন যাঁরা অর্থ সম্বন্ধে খুব উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন সেইসব অত্যন্ত অভিজাত মনোভঙ্গির কর্মচারী ভাবতে শুরু করেছেন যে বাকি মাইনের জন্য দাবি জানানো হয়তো প্রয়োজন হয়ে পড়বে। একাধারে শিক্ষক এবং সরকারী কর্মচারী বলে স্বাভাবিক কারণেই ফাঙের মন সহকর্মী শিক্ষকদের প্রতি গভীর সমবেদনায় এমন ভরে উঠছে যা আগে কখনো হয়নি। হরতাল অব্যাহত রাখার জন্য শিক্ষকরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উনি সেটি অধিক মাত্রায় সমর্থন করবেন বলে মনোবাসনা ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য সিদ্ধান্তটি যে সভায় গৃহীত হয়েছিল সেখানে ফাঙ উপস্থিত ছিলেন না।

সরকার এতদিনে অল্প আরো কিছু টাকা দিয়েছে এবং শিক্ষকরাও কাজে যোগদান করেছেন। কয়েকদিন আগে ছাত্র সংগঠন সরকারের কাছে পিটিশান মারফৎ দাবি জানিয়েছিল, "শিক্ষকরা যতদিন না ক্লাস নিচ্ছেন তাঁদের একটিও পয়সা দেওয়া চলবে না!" এই পিটিশানের দরুন কোন নতুন অসুবিধা সৃষ্টি না হলেও এটা কিন্তু ফাঙকে সরকারের সেই পূর্বতন ঘোষণা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল—"টাকা দেওয়া হবে কিন্তু তার আগে কাজ শুরু

করতে হবে।" ফাঙের মনে ভেসে উঠেছিল "তফাত নেই বললেই চলে"র ভৌতিক প্রতিচ্ছবি। এই জন্যেই সেদিন তিনি ক্লাসে ওই বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং সে বিবরণ আগেই দেওয়া হয়েছে।

এটা নিশ্চয় এখন পরিষ্কার যে ইচ্ছে করলে লোকে তাঁর "তফাত নেই বললেই চলে" তত্ত্বটিকে একপ্রকার আক্ষেপ বলে বর্ণনা করতে পারে। ভেবে দেখলে এটি একেবারে নিঃস্বার্থ আক্ষেপ নয় কিন্তু। এ কথা ভাবলে ভুল হবে যে নিজে সরকারী কর্মচারী বলেই উনি নিজেকে বাঁচাতে এই অভিব্যক্তিটি প্রয়োগ করেন। তবে উনি যখন চীনের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে আলোচনা শুরু করেন এবং কার্যত নিজেকে একজন দেশপ্রেমী ঠাউরে বসেন তখন তিনি সেই চিন্তাই করেন। কী পরিতাপের কথা যে মানুষ নিজেদেরই ভাল করে চেনে না।

*

এবার কিন্তু সত্যিই "তফাত নেই বললেই চলে" এমন আরেকটি ঘটনা ঘটেছে। প্রথম দিকে সরকারী উপেক্ষা কেবল গোলযোগসৃষ্টিকারী শিক্ষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এযাবৎকাল যাঁরা সদাচার করে এসেছেন সেইসব সরকারী কর্মচারীদের ভাগ্যেও এখন একই ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছে। মাসের পর মাস মাইনের দিন পিছিয়ে যাচ্ছে দেখে শেষ পর্যন্ত বেশ কিছু উচ্চপদে অধিষ্ঠিত সরকারী চাকুরে বকেয়া পাওনা আদায়ের দাবিতে আয়োজিত এক জনসভায় একরকম হঠাৎই বীর যোদ্ধার ভূমিকা গ্রহণ করে বসলেন। এঁরাই একদিন শিক্ষকরা টাকা দাবি করেছে বলে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন।

খবরের কাগজে এবার এঁদেরও বিদ্রূপ করে প্রবন্ধ লেখা শুরু হয়ে গেছে। ফাঙ অবশ্য সে জন্যে বিন্দুমাত্র অবাক হননি, বিচলিতও নয়। তিনি তাঁর "তফাত নেই বললেই চলে" তত্ত্বানুসারে বিশ্লেষণ করে বুঝতে পেরেছেন যে সাংবাদিকরা এখনো মাইনে পাচ্ছে। যে মুহূর্তে সরকার বা ওদের কাগজের প্রভাবশালী পৃষ্ঠপোষকেরা অর্থসাহায্য বন্ধ করবে ওরাও হয়ত জনসভা ডাকবে।

ফাঙ তাঁর সহকর্মী শিক্ষকদের প্রতিবাদ জ্ঞাপনের ব্যাপারে যেমন সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন এবারও তেমনি সর্বান্তঃকরণে তাঁর সরকারী সহকর্মীদের কাজটি সমর্থন করলেন। কিন্তু তা বলে সবাই যখন দল বেঁধে দাবি জানাতে গেছল উনি তাঁদের সঙ্গে যাননি। তিনি ঠায় বসেছিলেন অফিসে। কেউ কেউ

তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল, "এত মহান একজন ব্যক্তির পক্ষে মাথা নত করা অসম্ভব।" ওরা কিন্তু ভুল বুঝেছে। আসলে এসব কাজে তিনি মোটেই পারদর্শী নন এবং সেকথা তিনি নিজের মুখেই কবুল করেছেন। ফাঙ বলেছেন যে জন্মাবধি টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে এমন সব লোকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যাদের সকলেই তাঁর কাছে ধার চাইতে এসেছে। উনি কখনো কারুর কাছে ধার চাইতে যান না। ফাঙ এমন কথাও বলেছেন যে বিত্তশালী লোকের সঙ্গে দেখা করতে যেতেও তিনি পুরোপুরি নারাজ। তবে অফিসের বাইরে যদি এমন কারুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয় যে বৌদ্ধধর্মের ওপর বক্তৃতা দিচ্ছে, হাতে রয়েছে "মহাযানে দীক্ষাদান" নামক ধর্মগ্রন্থ, তিনি বুঝতে পারেন যে এই লোকটি নিঃসন্দেহে দয়ালু। এঁর কাছে আর্জি পেশ করা সম্ভব। কিন্তু লোকের হাতে যতক্ষণ ক্ষমতা থাকে তাদের মুখগুলো নরক-রাজের মতো ভয়ঙ্কর দেখায়। এরা সবাইকে নিজেদের ক্রীতদাস বলে মনে করে আর নরক-রাজের মতোই এমন আচরণ করে যেন সাধারণ মানুষের জীবন-মরণ সবই তাদের হাতে। এই সব কারণেই ফাঙ নাকি ওদের সঙ্গে দেখা করতে যেতে বিলক্ষণ ভয় পান। এই মনোভাবের দরুন ফাঙও নিজের সম্বন্ধে ভেবেছেন যে, তাঁর মতো "এত মহান এক ব্যক্তির পক্ষে মাথা নত করা সম্ভব নয়"। অবশ্য হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে তিনি নিজেই অনুভব করেছেন যে এসবই বোধহয় মিথ্যা যুক্তি। আসলে তিনি কোন কাজেরই যোগ্য নন।

*

সমস্যা থেকে সমস্যান্তরে পৌঁছনোর জন্যে সব রকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে এবং জীবনও যথরীতি কোনক্রমে গড়িয়ে চলেছে। কিন্তু ফাঙের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন নিকৃষ্টতম। এই জন্যেই স্ত্রী পর্যন্ত তাঁকে তেমন শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখছে না। যে সব দোকানীদের সঙ্গে তাঁর লেনদেন বা যে ছোকরাটা তাঁর ফাইফরমাশ খাটে তাদের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। তাঁর স্ত্রীকে এই প্রথম স্বাধীনভাবে মতামত ঘোষণা করতে দেখা যাচ্ছে। উনি আর আগের মতো স্বামীর কথার প্রতিধ্বনি তোলেন না, বরং মাঝে মাঝে বেশ রণং-দেহি গোছের ব্যবহার করেন। পঞ্চম মাসের চতুর্থ দিবসে দুপুরে খাবার সময় সেই সবে ফাঙ কর্মস্থল থেকে ফিরে বাড়িতে পা দিয়েছেন অমনি তাঁর স্ত্রী পাওনাদারদের একগোছা বিল আচমকা নাকের সামনে বাড়িয়ে ধরলেন। এরকম ঘটনা এই প্রথম।

"কম করেও একশো আশি ডলার লাগবে বিলগুলো মেটাতে। মাইনে পেয়েছ কি?" স্বামীর দিকে না তাকিয়েই তিনি প্রশ্ন করলেন।

"কালই আমি চাকরিতে ইস্তফা দিচ্ছি। সরকার একটা চেক্ পাঠিয়েছে কিন্তু বাকি মাইনে আদায়কারী সংঘের প্রতিনিধিরা টাকা দিতে অস্বীকার করেছে...ওরা প্রথমে বলেছিল যে সংঘে যারা যোগ দিয়েছে তারাই কেবল টাকা পাবে, তারপরে আবার ঘোষণা করেছে যে প্রত্যেককে সশরীরে হাজিরা দিয়ে টাকা নিয়ে আসতে হবে। সবে আজ ওরা টাকায় হাত দিয়েছে আর এরই মধ্যে দ্যাখো, ওদের মুখগুলো নরক-রাজের মতো হয়ে উঠেছে। ওদের দিকে তাকাতেও আমার ভয় করে। আমার টাকা চাই না, এ-চাকরি করার আর আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই—কী দুর্ভোগ..."

ফাঙের এই ন্যায্য কারণে ক্রুদ্ধ হবার ভাবটি এত অস্বাভাবিক যে ফাঙ-পত্নী অবাক। তাঁর তেজ প্রশমিত হয়।

"তা নিজেই না হয় গেলে! তাতে ক্ষতিটা কি?" স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন।

"তাতে আমি রাজী নই। এটা আমার পরিশ্রমের মূল্য—সরকারী বেতন। দান-খয়রাতি নয়। নিয়ম অনুযায়ী হিসাবরক্ষকের অফিস থেকেই মাইনেটা আমাকে পাঠিয়ে দেবার কথা।"

"কিন্তু ওরা যদি না পাঠায় তখন আমরা কি করব? কাল রাত্তিরে তোমাকে বলিনি কিন্তু ছেলেরা বলছিল স্কুল থেকে নাকি মাইনে চেয়েছে। মাইনে না দিলে..."

"রাবিশ! এই যে আমি—সন্তানের জনক—শিক্ষকতা করেই বলো আর সরকারী কাজে অংশগ্রহণ করেই বলো, কিছুই তো পাই না। আর এই যখন অবস্থা, আমিই বা কেন ছেলের স্কুলের মাইনে দেবো?"

ফাঙ-পত্নী দেখছেন তাঁর স্বামী অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে চেঁচাচ্ছেন। যেন ফাঙ-পত্নী স্বয়ং ছেলেদের স্কুলের অধ্যক্ষ। ফাঙ-পত্নী স্থির করলেন এখনকার মতো আর কিছু বলা সমীচীন হবে না।

নীরবে দুজনে আহার সারলেন। খাওয়া শেষ হলে বসে বসে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন ফাঙ। তারপর বিষণ্ণ পদক্ষেপে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

*

গত কয়েক বছর ধরে ফাঙ সাধারণত নববর্ষ বা অন্য কোন উৎসবের প্রাক্কালে দীর্ঘসময় বাইরে কাটিয়ে মাঝরাত করে বাড়ি ফেরেন। তারপর

বাড়ি ঢুকেই পকেট হাতড়ান আর স্ত্রীকে ডেকে বলেন, "শুনছো ! এই নাও !" যথেষ্ট পরিমাণ গর্ব সহযোগে তিনি তখন স্ত্রীর হাতে তুলে দেন 'ব্যাঙ্ক অফ চায়না' বা 'ব্যাঙ্ক অফ কমিউনিকেশান'-এর ছাপমারা একগোছা করকরে নতুন নোটের বাণ্ডিল। কিন্তু আজ রাত্তিরে পঞ্চমী উৎসবের প্রাক্কালে এত দিনের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল। সাতটা বাজার আগেই উনি বাড়ি ফিরে এসেছেন। ফাঙ-পত্নী ব্যাপার দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন। ভাবেন সত্যিই চাকরিটা ছেড়ে দিল কিনা কে জানে ! ফাঙ-পত্নী কিন্তু স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই নিশ্চিন্ত হলেন। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন যে এরকম কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি।

"এত তাড়াতাড়ি যে ?...কি ব্যাপার ?" স্বামীর মুখ পর্যবেক্ষণ করতে করতে তিনি বিড়বিড় করে বললেন।

"আজ আর টাকা পেলাম না। টাকা তোলবার সময় ছিল না— উৎসবের জন্যে ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গেছে। আট তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।"

"তুমি নিজেই মাইনে আনতে গেছলে ?" বিচলিত ভাবে স্ত্রী প্রশ্ন করেন।

"না। সে শর্তটা ওরা তুলে নিয়েছে। আগের মতো হিসাবরক্ষকের অফিসই টাকা পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু আজ অনেক দেরি হয়ে গেছল আর ব্যাঙ্কও এখন তিনদিন বন্ধ থাকবে। আট তারিখ সকাল অবধি আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।"

মিস্টার ফাঙ বসে পড়েন। তাঁর দৃষ্টি মেঝের ওপর। স্ত্রীর হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে একটা চুমুক লাগান। তাঁর কাহিনী এখনো শেষ হয়নি। আবার বলতে শুরু করেন ফাঙ।

"ভাগ্য ভাল যে অফিসে আর এই নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠবে বলে মনে হচ্ছে না। এখন নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি যে আট তারিখে মাইনে হবেই...মুস্কিল কি জানো ? এমনিতে যারা খোঁজ-খবর রাখে না এরকম কোন আত্মীয় বা পরিচিত মানুষের কাছ থেকে ধার নেওয়াটাই অত্যন্ত বিরক্তিকর। আজ বিকেলে একরকম মরিয়া হয়েই চিন ইয়ঙ-শোঙের সঙ্গে দেখা করতে গেছলাম। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। আমি বকেয়া মাইনে আদায়ের দাবিতে সংঘে যোগ দিইনি বলে আর নিজে গিয়ে হাত পেতে টাকা নিতে অস্বীকার করেছি বলে উনি আমার প্রশংসা করলেন। বললেন, তাঁর মতে কাজটা খুবই মহান এবং প্রশংসনীয়। সবারই এই উদাহরণ অনুসরণ করা উচিত। এরপর আমি ওনার কাছে পঞ্চাশ ডলার ধার চাইলাম। ব্যস্—হয়ে গেল ! উনি এমন

মুখ করলেন যেন আমি ওনার মুখে একমুঠো নুন পুরে দিয়েছি। ভুরুটুরু কুঁচকে উঠল বিরক্তিতে। বললেন যে ব্যবসায় নাকি মন্দা চলেছে, ভাড়া আদায় করতেও পারছেন না। তারপর আবার উপদেশ দিলেন, নিজের সহকর্মীর কাছে গিয়ে হাত পেতে মাইনের টাকা নেবার মধ্যে তেমন দোষের আর কি আছে! বলতে বলতেই উনি আমায় রাস্তা দেখিয়ে দিলেন।

"এত বড় একটা উৎসবের মুখে কে আর টাকা দেয়!" ফাঙ-পত্নী একটুও বিস্মিত হননি বোঝা গেল।

ফাঙ শুয়ান্-চি-ও হাতের ওপর মাথার ভার রাখলেন। এবার বুঝতে পারছেন যে তাঁর এত অবাক হবার কোন কারণ ছিল না। তাছাড়া চিন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুও নয়। অন্য আরেকটা কথাও এবার তাঁর মাথায় খেলে গেল। মনে পড়ে গেল যে শহরে তাঁর জন্ম সেখানকার এক পরিচিত ভদ্রলোক গত বছর নববর্ষের প্রাক্কালে তাঁর কাছে দশ ডলার ধার চেয়েছিলেন। লোকটি পরে টাকা শোধ করতে পারবে না আন্দাজ করে তিনি অসহায়ের ভাণ করে বলেছিলেন যে, অফিস আর স্কুল দু'জায়গাতেই মাইনে বাকি পড়ে আছে। কাজেই ইচ্ছে থাকলেও তাঁর পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। আসলে কিন্তু অফিসের মাইনে বাবদ পিছনে সই-করা চেক্‌টা তখন তাঁর পকেটের মধ্যেই নিশ্চিন্তে অবস্থান করছিল। অতিথিকে তিনি শেষ পর্যন্ত শূন্য হাতেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সে-সময় তাঁর মুখখানা কেমন দেখিয়েছিল আগে তিনি কখনো ভাবেননি। এতদিনে তাঁর সে কথা মনে পড়ছে। ফাঙের ঠোঁট কেঁপে ওঠে, সারা দেহে যেন বিদ্যুৎ-শিহরণ খেলে যায়।

একটু বাদেই একটা দুর্দান্ত আইডিয়া এল ফাঙের মাথায়। উনি ছোকরা ভৃত্যটিকে পাঠিয়ে দিলেন ধারে এক বোতল 'ম্লান-পদ্ম' মদ আনতে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস দোকানী কোন ঝামেলা করবে না। ভাববে সচরাচর উৎসবের পরের দিন যেমন পেয়ে থাকে তেমনি কালই মদের পুরো দাম পেয়ে যাবে। তা সত্ত্বেও ব্যাটা যদি অস্বীকার করে তো ঔদ্ধত্যের উচিত সাজা পাবে। এক কানাকড়িও মিলবে না।

ভৃত্যটি 'ম্লান-পদ্ম'র বোতল নিয়ে ফিরে এল। বয়েক গেলাস পেটে পড়তেই ফাঙের মুখের পাণ্ডুর ভাব কেটে গিয়ে রক্তিম ভাব দেখা দিল। মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ হবার পর দেখা গেল তিনি উদ্যম ফিরে পেয়েছেন। একটা দামী সিগারেট ধরিয়ে হু-শি-র "পরীক্ষা" বইটা হাতে নিয়ে বিছানার ওপর লম্বা হয়ে পড়তে শুরু করলেন।

"কাল দোকানীদের কি বলব ?" ফাণ্ড-পত্নী প্রশ্ন করে বসলেন। উনি স্বামীর পিছু পিছু খাটের ধারে এসেছিলেন। প্রশ্ন করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন স্বামীর মুখের দিক।

"দোকানী...বলে দিও আট তারিখে আসতে, বিকেলে—"

"বললেই তো আর হবে না। বিশ্বাসই করবে না। ওরা ব্যাপারটাকে অত সহজে মিটতে দেবে না।"

"বিশ্বাস করবে না মানে ? ইচ্ছে থাকলে অনুসন্ধান করেই দেখুক। অফিসের একটি প্রাণীও কিছু পায়নি। সবাইকে আট তারিখ অবধি অপেক্ষা করতে হবে।" এই বলে উনি তর্জনী দিয়ে বাতাসে একটি অর্ধ-বৃত্ত আঁকলেন। ফাণ্ড-পত্নীর দৃষ্টি তাঁর হাতটাকে অনুসরণ করে দেখল, উনি "পরীক্ষা"র পাতা ওলটাচ্ছেন।

তাঁর এই নিরুদ্বেগ ক্ষণেকের জন্য ফাণ্ড-পত্নীর বাকশক্তি হরণ করে। "এভাবে আমাদের চলতে পারে না।" উনি নতুন ভাবে কথাটা বলার চেষ্টা করলেন। "কিছু একটা করতেই হবে। তোমাকে অন্য কোন উপায় বার করতে হবে..."

"আমি কি করতে পারি ? আমি এত গোবেচারা নই যে কেরানী হবো, আবার এত শক্তিমান নই যে ইঞ্জিনে কয়লা ঠেলার কাজ করবো। করবার আর কি আছে ?"

"তুমি এককালে সাংহাইয়ের প্রকাশকদের জন্যে কি সব লিখতে না—?"

"সাংহাইয়ের প্রকাশক ? আরে ওরা তো শব্দ গুনে গুনে পয়সা দেয়। পাণ্ডুলিপির মধ্যে ফাঁকা জায়গা থাকলে তার জন্যে পয়সা দেয় না। দেখ না, পরের দিকে যে কবিতাগুলো লিখেছি তার মধ্যে কতখানি করে ছাড় রয়েছে। একটা পুরো বইয়ের জন্যে তিরিশটার বেশি তামার পয়সা মিলবে না। আর গ্রন্থ-স্বত্বের কথা যদি বল, কম করে ছ' মাসের আগে তো কিছু আসছেই না। কথায় বলে না 'দূরের জলে কাছের আগুন নিববে না'। নাঃ—কারুর পক্ষেই অত ধৈর্য ধরা সম্ভব নয়।"

"খবরের কাগজে তো লিখতে পারো ?"

"খবরের কাগজ ? দ্যাখো, নামকরা কাগজগুলোর একটার সম্পাদক আমার পুরনো ছাত্র বটে কিন্তু হাজার শব্দ পিছু এত কম পয়সা পাব যে ভোর থেকে শুরু করে রাত অবধি লিখলেও সংসার চালাতে পারব না। তাছাড়া প্রবন্ধ লেখার মতো আমার বিদ্যে নেই।"

"তাহলে উৎসবের পর কি হবে ?"

"উৎসবের পর ? যথারীতি অফিস করতে শুরু করব। কাল দোকানীরা

এলে বলে দিও আট তারিখে দেখা করতে।"

ফাঙ আবার বইয়ে মনোনিবেশ করলেন। ফাঙ-পত্নীর আপ্রাণ চেষ্টা যাতে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, নিজের বক্তব্যটা শোনান যায়। আমতা আমতা করে উনি বললেন, "তোমার কি মনে হয়? উৎসবের পর আট তারিখে, আমাদের একটা লটারীর টিকিট কাটলে ভাল হত না?"

"রাবিশ! অতি নীচ বংশে জন্ম বলেই তুমি একথা ভাবতে পারলে..."

কথা বলতে বলতেই একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল ফাঙের। চিন ইয়ঙ-শেঙ খেদিয়ে দেবার পর অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে তিনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাও শিয়াচ শুনের মিষ্টান্ন বিপণী পেরোবার সময় দরজার ওপরে আটকানো কয়েকটা পোস্টার চোখে পড়েছিল। বড় বড় হরফে লেখা ঃ "পুরস্কার-বিজয়ী দশ হাজার ডলার পাবে!" এখন যেন মনে হচ্ছে পত্নীর আইডিয়াটাই তখন মাথায় খেলেছিল, হয়ত কয়েক পা মন্থর গতিতেও হেঁটেছিলেন। কিন্তু পকেটে পড়ে থাকা সর্বসাকুল্যে ষাট সেন্ট প্রাণ ধরে খরচ করতে পারেননি বলেই হয়তো এই প্রলোভন এড়িয়ে দৃঢ়পদক্ষেপে চলে আসতে পেরেছেন।

কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় ফাঙের মুখটা বিবর্ণ হয়ে ওঠে। ফাঙ-পত্নী ভাবেন যে নীচ বংশে জন্ম বলেই বোধহয় স্বামী তাঁর ওপর রুষ্ট হয়েছেন। মনের ভাব প্রকাশ না করেই তিনি সরে যান। ফাঙেরও আর কথা শেষ করা হয় না। যাই হোক উনি শেষ পর্যন্ত হাত-পা এলিয়ে দিয়ে হাতে তুলে নেন কাব্যগ্রন্থ "পরীক্ষা"। সরবে পড়তে শুরু করেন কবিতাগুলো।

অনুবাদ / সিদ্ধার্থ ঘোষ

লম্বা নাকু ॥ মাও তুন

বৃহত্তর সাংহাই শহরের ত্রিশ লক্ষ মানুষের মধ্যে আমাদের নায়কটিই বোধহয় সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব।

'আধুনিক জল সরবরাহ' ব্যবস্থার গর্ব স্বরূপ হাউসিং ডেভোলাপমেণ্ট নামক তিনতলা 'পাহাড়' বা গ্রামাঞ্চলের মিশমিশে কালো বিশাল লোহার গেট গলে আমরা তাকে গা ঢাকা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখি। লুকিয়ে চুরিয়ে সিমেণ্টের বড় বড় ডাস্টবীনের আবর্জনার জঙ্গলে পৌঁছে কুকুরদের সঙ্গে ঘাপটি মেরে বসে 'মূল্যবান' কিছু পাবার দুরন্ত আশায় ও আবর্জনার স্তুপে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান চালায়। মাংসের পোঁচ লাগা কোন হাড়ের টুকরো যদি ও কোন রকমে কুকুরদের নজর এড়িয়ে একবার হাতাতে পারে তবে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে ও সেটাকে পরীক্ষা করে দেখে। অবশ্য পচা দুর্গন্ধের চোটে সাধারণত ওকে বাধ্য হয়েই সেটাকে আবার কুকুরদের সামনে ছুঁড়ে দিতে হয়। আত্মরক্ষার ব্যাপারে কুকুরগুলো ওর চেয়েও অনেক বেশি দড়। কদাচিৎ ওর কপালে হয়তো জুটে যায় পচা গলা একটা আস্ত আপেল কিংবা আধখানা বুড়ো শালগম। কুকুররা পছন্দ না করলেও এগুলো ওকে এত খুশীর খোরাক যোগায় যে আনন্দে ওর রুগ্ন শীর্ণ খুদে খুদে আঙুলগুলো ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে শুরু করে।

…কুকুরদের মতো এই হেলেটিও ডাস্টবীনের নীচে ছোট্ট ফোকরটার সামনে বসে ভেতরের দিকে উঁকি মারে। হঠাৎ কখনো নজরে পড়ে ঝকঝকে কোন জিনিস—একটা পুরনো বোতল কিংবা ধনীর দুলালদের পরিত্যক্ত কোন ভাঙাচোরা খেলনা। ঠিক এই মুহূর্তে প্রচণ্ড খিদের জ্বালা ভুলে শীর্ণ হাতটাকে সে ডাস্টবীনের দিকে বাড়িয়ে দিতে পারে। তারপর আবর্জনা-গুলোকে খামচে খামচে অনায়াসে একটা ছোট্ট ফোকর খোঁড়ে। আনন্দের আতিশয্যে ওর তখন সমস্ত শরীরটাকে নিয়ে ডাস্টবীনের খুদে দরজাটা গলে ভেতরে সেঁধিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সাধারণত ঠিক এই সময়েই অবধারিত ভাবে তার পশ্চাদ্দেশে এসে পড়ে পুরু চামড়া মোড়া গোদা পায়ের

একখানি লাথি। অভিজ্ঞতাই তাকে শিখিয়েছে যে এই করিতকর্মা পুরুষটি ওই 'পাহাড়' বা 'গ্রামগুলোর' পাহারাদার ছাড়া আর কেউ নয়। আর তাই পেটের তলায় লেজ-গোটানো কুকুরগুলোর সঙ্গে সেও ছুট লাগিয়ে কালো মিশমিশে লোহার গেট পেরিয়ে উধাও হয়ে যায়। তারপর আবার শুরু হয় বিপজ্জনক পেশাটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য নতুন কর্মক্ষেত্রের অন্বেষণ।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে পাহারাদারদের চোখ এড়িয়ে সে এই 'জল সরবরাহ ব্যবস্থার গর্ব' তিনতলা বাড়িগুলোর কোন একটার খিড়কির দরজার সামনে এসে হাজির হবে। দরজাটি যদি খোলা থাকে আর ঘটনাচক্রে রাঁধুনী যদি তখন গত রাতের বাসী খাবারগুলো ময়লার ঝুড়িতে ফেলতে গামলা হাতে বেরিয়ে আসে, তাহলে সে চেষ্টা করবে তার সঙ্গে কথা বলতে। যদিও তখন তার কণ্ঠস্বর শুনতে না পাওয়ারই কথা। একেবারে ফিস ফিস করে কতকগুলো শব্দ উচ্চারণ করলেও রাঁধুনীটি ঠিক বুঝতে পারবে ও কি বলতে চাইছে। এরপর সে হয়তো আধ বাটি পাতলা ঝোল পেতে পারে কিংবা খানিকটা ঘৃণা-ভরা দৃষ্টি আর তা না হলে সহানুভূতির ছিটেফোঁটা—অথচ তার কাছে এ সব মন্তব্য প্রায় অর্থহীন—'দূর হ'! পালা, পালা এখান থেকে! বলছি না কিচ্ছু হবে না! লোকে এগুলো গাঁটের কড়ি দিয়ে কেনে, বুঝলি? তারপর চাষীদের কাছে বিক্রি করে।"

খুব ভোরবেলা ধনীর দুলালরা যখন পরম সুখে তাদের তুলতুলে নরম বিছানায় শুয়ে আরাম করে ঘুমোয় ঘটনাগুলো ঠিক তখনই ঘটে। পরে, বেলা বাড়লে, কর্মচঞ্চল কোন রাস্তার মোড়ে ওর দেখা মিলতে পারে। কোন পেটমোটা ভদ্দরলোকের হয়তো পিছু ধাওয়া করছে। যাঁর পাশে পাশে হাইহীল জুতো পরে গটগটিয়ে চলেছেন তাঁর কেতাদুরস্ত মহিলা সঙ্গিনী। অস্ফুট কাঁপা কাঁপা স্বরে শিশুটি তখন কাকুতি মিনতি করে বলবে —"বাবু, ও বাবু, মাগো, একটি উপকার করুন।" কিংবা সুচাও ক্রীকের ব্রীজটার মুখে হঠাৎ তাকে দেখা যাবে একগাদা লোকের মাঝ থেকে একটা নেংটি ইঁদুরের মতো ছিটকে বেরিয়ে এসেছে এবং যে রিকশাওয়ালাটি তখন ব্রীজের ওপর রিক্সা টেনে তুলতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে তাকে ও ব্রীজের মাথা অবধি উঠতে সাহায্য করবে আর সেই সুযোগে রিকশা যাত্রীর কাছে আবেদন জানাবে এবং অনুনয় বিনয় করে বলবে—"বাবু, দয়া করে একটি উপকার করুন।"

কিন্তু তবু জীবিকার প্রয়োজনে হলেও এ ধরনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া বেশ বিপজ্জনক। যদি কোন পুলিসপ্রবর শিশুটিকে দেখতে পায় তাহলে সে তার লগুড়াঘাতে তাকে শিক্ষাও দিতে পারে। কিংবা "একটি মহৎ কার্য সম্পাদন করবে" বলে যদি সে তাকে না দেখার ভাণও করে তবু ব্রীজের

দু'ধারের অন্যান্য বাচ্চারা অতটা সহনশীল নাও হতে পারে। আমাদের নায়কের চেয়ে বয়সে কিছু বড় এবং অভিজ্ঞতায় দড় এই ছেলেগুলো তখন পুলিসটিকে গালিগালাজ করে মারধোর করতে শুরু করবে আর এই সময়টাতেই আমাদের নায়ক পায় কাজ করার স্বাধীনতা।

তবু এই বিপজ্জনক পেশায় নিযুক্তদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা অর্থনৈতিক গণ্ডির মধ্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 'একচেটিয়া অধিকার' ভোগ করে এবং তাদের প্রত্যেকেরই এক একজন অদৃশ্য প্রভু আছে। কারণ অবাধ প্রতিযোগিতার কোন সুযোগ এ ব্যবসায় নেই।

তবু এ ছাড়াও এমন অনেক সময় আছে যখন আমাদের নায়ককে দারুণ সাফল্য অর্জন করতে দেখা যায়।

বিশেষ করে সেই সময়টায়, যখন প্রধান সড়কগুলোর ওপর লাল সবুজ নিয়ন আলোগুলো তাদের আলোক বিতরণ সমাপ্ত করেনি আর নির্জন গলি-ঘুঁজির আলোর প্রয়োজন মেটাতে শুধু রাস্তার মোড়ের ছোট ছোট ঠাণ্ডা ম্লান আলোগুলো জ্বলছে, তখন আমাদের ক্ষুদে নায়ক হয়তো ঘটনাচক্রে অন্ধকার গলির একটি দলের মধ্যে ভিড়ে যেতে পারে। যে দলে পাঁচ, ছয়, এমনকি দশটিও সমবয়সী সঙ্গী থাকতে পারে। ওরা ওত পেতে থাকে। যতক্ষণ না কোন হোটেল বয় গভীর রাতের খরিদ্দারের এঁটো বাসন নিয়ে হোটেলে ফিরে যাচ্ছে ততক্ষণ ওরা নিরন্তর প্রতীক্ষা করে। অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য বারো তেরো বছরের যে সব ছেলে-পুলেরা ঘাপটি মেরে বসে থাকে বয়সে ও তাদের চেয়ে ছোটই হবে। বেশীর ভাগ সময় ওর হাতের ডিশগুলো খালিই থাকে আর হাতে ঝোলানো কাঁসার বালতিতে যেটুকু ভাত পড়ে থাকে তা একটা খুদে পেট ভরানোর পক্ষেও যথেষ্ট নয়। অবশ্য ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে বাটিতে ঝোলের তলানি কিছুটা পড়ে থাকতে পারে কিংবা কয়েক টুকরো হাড় বা খানিকটা তরকারীর ঘ্যাঁট। এমনকি বালতিটায় হয়তো একটা স্বাস্থ্যবান কুকুরের পেট ভরানোর মতো যথেষ্ট পরিমাণ ঠাণ্ডা ভাতও থাকতে পারে। ওদিকে আমাদের নায়ক আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা দলে বেশ ভারী, কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে হোটেল বয়টি কোনরকম বাধা দেবার চেষ্টা করবে না এবং আমাদের নায়ক তখন অনায়াসে তেলতেলে ডিশগুলোকে চেটে সাফ করে বিজয়গর্বে হর্ষধ্বনি করতে করতে ছুটে পালাবে। কিন্তু বেশীর ভাগ দিনই আমাদের নায়কবাবুর কপালে যা জোটে তা হল গালিগালাজ, শাপ-শাপান্ত, মারধোর আর লাথির গুঁতো। একটা রাস্তার কুকুরকেও বোধহয় এত কষ্ট সহ্য করতে হয় না।

২

বৃহত্তর শাংহাই শহরের তিরিশ লক্ষ বাসিন্দার মধ্যে আমাদের নায়কের মতো কতজন শিশু আছে তার সঠিক হিসাব আমার জানা নেই। কথাটাকে অন্য ভাবেও বলা যেতে পারে। বৃহত্তর শাংহাই-এর তিরিশ লক্ষ বাসিন্দার মধ্যে কতজন শিশু আছে যারা তাদের তুলতুলে নরম বিছানায় শুয়ে যখন আরামে ঘুমোয় আর আমাদের নায়ক জাতীয়রা তাদেরই পরিত্যক্ত কোন খেলনা পাবার আশায় আবর্জনার স্তুপ ঘাঁটতে ঘাঁটতে পাহারাদারের লাথি খাচ্ছে এ বিষয়েও আমরা নিশ্চিত নই। সংখ্যার দিক দিয়ে এদের মধ্যে খুব বড় একটা ব্যবধান ছিল কিনা কিংবা নরম তুলতুলে বিছানায় শুয়ে আরামে নিদ্রামগ্ন শিশুরাই সংখ্যায় কম কিনা এ নিয়ে এ মুহূর্তে আমাদের মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন নেই।

তবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে বৃহত্তর শাংহাই শহরের তিরিশ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে আমাদের নায়কের বয়সী এমন তিন চার লক্ষ শিশু আছে যারা রেশম কারখানা, ইলেকট্রিক কারখানা এবং আরো বিভিন্ন ধরনের কারখানায় কাজ করে। ভোর ছটা থেকে সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত সেইসব কারখানার মেশিনগুলো তাদের রক্ত শোষণ করে। আর এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে এদের এই রক্তই খাদ্য ও পুষ্টি জোগায় নিশ্চিন্তে আরামে নিদ্রামগ্ন ধনীর দুলালদের আর তাদের পিতামাতাদের।

আমাদের নায়ক প্রায়ই দেখে শীর্ণকায় বালকরা বিজলী বাতির কারখানা বা যে কোন কারখানার গেট দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে, তার পেটে যদি তখন খিদের আগুন জ্বলে তাহলে ওদের দেখে তার হিংসে হতে পারে। চালাঘর হলেও ওদের তবু ফিরে যাবার মতো আস্তানা আছে। কিছু না হলেও ফিরে গিয়ে তারা এক টুকরো হাতে গড়া পিঠেও পেতে পারে। কিছু না হলেও ছাত-নামক একটা কিছুর তলায় তারা ভোর পাঁচটা অবধি নিশ্চিন্তে ঘুমতে পারবে।

অবশ্যই ওর একথা কোন দিনই মনে হয়নি যে, এই যে ছেলেগুলোকে ও এত ঈর্ষা করে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই মেশিনগুলো তাদেরও সব রক্ত শুষে নিয়ে ছিবড়ে করে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তখন এক টুকরো হাড়ের জন্য কুকুরদের সঙ্গে যোঝার ক্ষমতা বা ব্রীজের ওপর রিকশা ঠেলে তোলার শক্তিও

আর তাদের থাকবে না। কিন্তু এসব নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ কি? তার চেয়ে আমরা বরং আমাদের নায়কের প্রসঙ্গেই ফিরে যাই।

জন্মলগ্নে যদিও তার একটা ঘর ছিল, কিন্তু সে কথা আজ আর ওর পরিষ্কার ভাবে মনে নেই। আবছা ভাবে সেই বছরটার কথা মনে পড়ে, শাংহাইয়ে যুদ্ধের ঢেউ এসে পৌঁছল আর 'লোহার পাখিরা' বোমা ফেলল, আগুন ধরালো। কিছু কিছু বোমা বড় বড় অট্টালিকার ওপর পড়লেও বেশীর ভাগই পড়েছিল দরিদ্র মানুষদের বসতির ওপর আর তারপর থেকেই সে গৃহহারা।

ঠিক এই সময়ই তার বাবা মা তার জীবন থেকে হারিয়ে গেল। কোথায়, তা তার জানা নেই। কিছুতেই সে মনে করতে পারে না তারা কেমন দেখতে ছিল—কারণ সে যখন বাবা মাকে হারায় তখন তার বয়স মাত্র সাত। অবশ্য বাবা মা যখন কাছেও ছিল তখনো আমাদের নায়ক তাদের ভালো করে দেখার সুযোগ কখনো পায়নি। দিনের আলো ফোটার আগেই তারা বেরিয়ে যেত আর ফিরত অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর। তারাও নিশ্চয় কোথাও না কোথাও মেশিনের খোরাক হত।

যা-ই হোক না কেন সে কিন্তু ভুলতে পারে না এক সময় তার বাবা ছিল, মা ছিল। ভুলতে পারে না সেই বিপর্যয়ের কথা যার জন্য সে তাদের হারিয়েছে। যারা এর জন্যে দায়ী। আরো মনে পড়ে বাবা মা হারিয়ে যাবার পর বৃদ্ধ ও শিশুদের বিরাট একটা দলের সঙ্গে তাকে এমন একটা জায়গায় পাঠানো হয়েছিল যেখানে তাদের খাবার বলতে জুটত শুধু খানিকটা পাতলা ঝোল বা কোন কোন সময় অখাদ্য কয়েক টুকরো পোড়া রুটি। এর প্রায় মাস ছয় পর, হঠাৎ একদিন এক হোমরাচোমরা ভদ্দরলোক তাদের একটি কক্ষে ডেকে পাঠিয়ে এক এক করে প্রত্যেককে জেরা করতে শুরু করেছিল। বেশ মনে পড়ে তার পালা আসতে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল –

"তোমার কি বাড়ি আছে?"

ও তখন মাথা নাড়িয়ে জানিয়েছিল, নেই।

"তোমার কি কোন আত্মীয় পরিজন আছে?"

আবার ও মাথা নাড়িয়েছিল। এবার ভদ্রলোকও ওর সঙ্গে মাথা নাড়ায় যোগ দিয়ে একফালি কাগজের ওপর একটা দাগ মেরে নম্বর ধরে পরের জনকে ডেকেছিলেন। এরপর ক'দিন না যেতেই আমাদের নায়ক অবাক হয়ে নিজেকে আবিষ্কার করল একেবারে রাস্তার ওপর। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়াই সে ভিড়ে গেল তারই মতো আরো কয়েকটি শিশুর এক দলের মধ্যে। কোন কোন সময় তারা বেশ মিলেমিশে থাকতো, আবার কখনো

কখনো নিজেদের মধ্যে মারপিট বেধে যেত। কখনো বুনো কুকুরদের সঙ্গে দোস্তি জমাত আবার কখনো তাদের সঙ্গে লড়াই করত। এই ভাবেই সে কয়েক বছর কাটিয়ে দিয়েছে আর ক্রমশ এই জীবনটা তার ধাতস্থ হয়ে এসেছে। ওর একটা অস্পষ্ট ধারণা হয়েছে যে তার মতো যারা, তাদের বোধহয় এইভাবেই টিকে থাকতে হয়।

৩

কাজেই এটা দেখা যাচ্ছে যে আপাতদৃষ্টিতে আমাদের নায়কের জীবনটা খুবই অসাধারণ মনে হলেও আসলে কিন্তু তা একেবারেই সাদামাঠা। প্রতিদিনই সে অসাধারণ সব অভিযান চালায়। কিন্তু চাঞ্চল্য সৃষ্টিতে অতীব প্রয়াসী প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রগুলো অবধি এর কোন সংবাদ মূল্য আছে বলে বিবেচনা করে না। বেশ, এবার আমরা নিজেরাই তাহলে ওর অসাধারণ অথচ যথেষ্ট সাদামাঠা জীবন থেকে একটি অসাধারণ ঘটনা বেছে নিই।

ঘটনাটা কবে বা কোন্ বছর ঘটেছিল সেটা সঠিক বলা যাবে না। তবে যাই হোক সেদিনটায় তেমন গরমও ছিল না আবার তত ঠাণ্ডাও ছিল না। সুন্দর ঝরঝরে একটা দিন—বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া কি তেমন রোদও ছিল না।

এই দিনটিকে কেন তার জীবনের এক অসাধারণ দিন বলে ঘোষণা করা হচ্ছে সেটা এবার পরিষ্কার হয়ে যাবে সেদিনের পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করলেই।

যেদিনের কথা হচ্ছে সেদিন দুপুর প্রায় দুটোর সময় ও একটা ছোট্ট ইঁটের বাড়ির দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে ঝিমোচ্ছিল। এই ছোট্ট বাড়িটা শাংহাই-এর একটি সাধারণ শৌচাগার। এটা ওর জায়গা। জায়গাটা ও-ই আবিষ্কার করে আর এখানে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে রক্তও ঢালে। ওর এই আবিষ্কারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। বেশ কয়েক মাস আগে। এই অপূর্ব শৌচাগারটি যেদিন ওর প্রথম নজরে পড়ে, ও অবাক হয়ে গিয়েছিল। নিরক্ষর বলে বাড়িটার দেওয়ালে কি লেখা আছে পড়তে পারেনি। অবাক হয়ে ও ভেবেছিল এই ছোট্ট ছিম্‌ছাম্ গৃহটি কি কোন লোকের বাড়ি? নাকি কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অফিস? লম্বা কালো গাউন পরা এক বিশাল-বপু ভদ্রলোক গৃহটির মধ্যে প্রথম প্রবেশ করল। তারপর পিস্তল ও বেল্ট-সমেত একজন সেপাই। সেপাই-এর পর ঢুকল বিলিতী পোশাক পরা এক ভদ্দরলোক—বাপ রে! সবাই তো দেখি গণ্যমান্য ব্যক্তি! উঁচুতলার লোক! এরা ইচ্ছে করলেই তো যে কোন সময়

তাকে লাথি মারতে পারে। সে অধিকার এদের আছে। বাড়িটার খুব কাছে এগোবার সাহস হল না তার।

শেষ পর্যন্ত সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে বাড়িটা নিশ্চয় একটা অফিস গোছের কিছু হবে। প্রগাঢ় শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে সে তাই বাড়িটার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল। কিন্তু অকস্মাৎ আমাদের নায়ক দেখল বাড়িটার অপর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল একজন মহিলা। বেশবাস দেখে মনে হল না কোন বড় ঘরের মেয়ে। একটু পরেই একটি শিশু এসে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। কিন্তু তার অবস্থা আমাদের নায়কের তুলনায় কোন অংশে ভাল নয়। বেশ ক্ষেপে গিয়েই কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে ও এগিয়ে এল, সমস্ত ব্যাপারটার ওপর একবার ভাল করে চোখ বুলিয়ে নেবার জন্য।

এতক্ষণে ও বুঝতে পারল এই মাননীয় ব্যক্তিগণ এই ছোট্ট বাড়িটার অভ্যন্তরে কি ধরনের 'ব্যবসায়িক' লেনদেন করছে। অকারণে এত ভয় পাওয়ায় ওর মনে হল ও যেন প্রতারিত হয়েছে। প্রতিশোধ স্পৃহায় ও এবার ছটফট করতে লাগল। প্রথমেই ভাবল ভেতরে ঢুকে সারা বাড়িটাকে একবার ভিজিয়ে দেবে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ওর নজরে পড়ল একজন আগন্তুক এসে দরজার গোড়ায় উপবিষ্ট এক বৃদ্ধাকে একটি তামার পয়সা দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তার ধারণা হল এর মধ্যে নিশ্চয়ই 'বিশেষ' কিছু একটা ব্যাপার আছে যা এখনও সে আবিষ্কার করতে পারেনি। কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো সবেগে ভেতরে প্রবেশ করার সাহস হল না। শেষ পর্যন্ত অপমানজনক ভাবে বাড়িটার গায়ে থুথু ছিটিয়ে প্রবেশপথের কাছাকাছি দেওয়ালের গা ঘেঁষে এক ফালি জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে বসে পড়ল।

ঠিক সেই মুহূর্তে—জায়গাটাকে ও নিজের রাজ্য হিসেবে সংরক্ষণের কথা মোটেও চিন্তা করেনি। কিন্তু যখন সেই শিশুটি কিছুক্ষণ আগেই যাকে সে ভেতরে ঢুকতে দেখেছিল, বেরিয়ে এসে তার পাশটিতে ঠিক তার মতো করেই দেওয়ালের গায়ে পিঠ দিয়ে পা ছড়িয়ে বসল—এতটা বাড়াবাড়ি সহ্য করতে পারল না ও।

"আরে! এই খুদে কচ্ছপের বাচ্চাটা এল কোত্থেকে?" সরবে সে নিজেকে প্রশ্ন করল।

"গালাগালিটা কাকে দিচ্ছিস রে ঘেয়ো-মাথা?"

শুরু হয়ে গেল লড়াই। প্রতিদ্বন্দ্বীরা কেউ কারুর চেয়ে কম যায় না। তবু যে কোন ভাবেই হোক আমাদের নায়কের মাথাটা ইঁটের দেওয়ালে ঠুকে গিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল। অপরজন তখন, হয় অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে ভেবে কিংবা নিজেকে বিজয়ী হিসেবে গণ্য করে বিদ্যুৎ

বেগে সেখান থেকে ছুট লাগাল। অতঃপর আমাদের নায়ক জায়গাটির দখল নিল। সেই থেকেই সাধারণ শৌচাগারের দেয়াল ঘেঁষা ঐ স্থানটি তার ব্যক্তিগত অঞ্চল হয়ে রইল।

যে দিনটার কথা হচ্ছে তার বহু আগে থেকেই এই সাধারণ শৌচাগারের জটিল বিষয়গুলো সম্পর্কে ও সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছিল। প্রবেশ-পথে যে বৃদ্ধাটি টয়লেট পেপার বিক্রি করত তার সঙ্গে ওর বন্ধুত্বও গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। আর তাই আলোচ্য, নাতিশীতোষ্ণ সুন্দর দিনটিতে, যেদিন ঝড় বা বৃষ্টি ছিল না, সূর্যের তেজও তেমন প্রখর ছিল না, সে তার ব্যক্তিগত অঞ্চলে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ঝিমোচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল আজকের দিনটাকে নিয়ে ও বেশ সন্তুষ্ট।

সময়টা শৌচাগারের খুব "কর্মব্যস্ত ঘণ্টা" ছিল না। বৃদ্ধাটি এমন ভাবে তার মাড়ি দুটোকে নাড়াচ্ছিল যে দেখে মনে হবার কথা কিছু চিবোচ্ছে বোধহয়। চিবিয়ে চিবিয়ে বৃদ্ধা সোজা কয়েকটা শব্দ ছুঁড়ে দিল দেয়াল-ঘেঁষা স্থানটির অধীশ্বরের উদ্দেশ্যে।

"অ্যাই, লম্বা নাকু! আমার কাজটা একটু দেখবি? একটু বাদেই আমি ফিরে আসছি।"

কি? লম্বা নাকু? সজাগ হয়ে ওঠে ও। তাকেই এ ভাবে সম্বোধন করা হচ্ছে বিশ্বাস করতে না পেরে মাথা তুলে চারিদিকে ভালো করে চোখ বুলোয়। আবার বৃদ্ধাটি বলে ওঠে—

"আমার জায়গায় বসে আমার কাজটা একটু দ্যাখ্ লম্বা নাকু, লক্ষ্মী বাবা। আমি এই এলাম বলে। কিছু যদি না মনে করিস তো…"

বুড়ি তাকেই লম্বা নাকু বলে ডাকছে বুঝতে পেরে ও খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ওর মা বাবা যখন বেঁচে ছিল তখন ওর একটা ভদ্দরলোকের মতো নাম ছিল। নামটা ও নিজেও উচ্চারণ করতে পারত। কিন্তু রাস্তায় নামার পর থেকে ওর আর কোন নির্দিষ্ট নাম রইল না। প্রথম দিকে দোস্তদের কাছে ও নিজের নাম বলতো। কিন্তু ও অবাক হয়ে গেল যখন দেখল তার নামটাকে তারা ভেঙেচুরে একটা হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার করে তুলেছে। এরপর একসময় তার নামটাই সে ভুলে বসল। কিন্তু তবু তার দোস্তরা তাকে কখনো লম্বা নাকু বলে ডাকেনি। অন্যান্য ছেলেদের তুলনায় তার নাকটা সামান্য একটু বড় ছিল ঠিকই কিন্তু এত বড় নয় যে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। কোন ছেলের দেহের কোন খুঁত ধরে তার ডাকনাম দেওয়াটা ছিল তার দোস্ত মহলে একরকম অপমানকর। প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মাথায় দাদ ভরা কোন ছেলেকে অপদস্থ করতে

চাইলে তারা তাকে 'দাদ-মাথা' বলে ডাকতো।

সেইজন্যেই বুড়ির মুখে লম্বা নাকু ডাক শুনে আমাদের নায়ক বেশ অস্বস্তি বোধ করল। তবে খুশী হতে না পারলেও সে খানিকটা যেন আত্মপ্রসাদও লাভ করল। কেননা এই প্রথম বোধহয় কেউ তাকে মানুষ বলে গণ্য করেছে। তার ওপর একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার অর্পণ করে আশ্বস্ত হয়েছে।

"তোমার কাজ দেখতে হবে? ঠিক আছে, তবে বেশী দেরী করো না যেন। আমি খুব ব্যস্ত।" উত্তর দিল ও। একজন ব্যস্ত মানুষের ভান দেখিয়ে শরীরটাকে টান টান করে উঠে দাঁড়াল।

একগাদা টয়লেট পেপার ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বুড়ি বেরিয়ে গেল। খানিকটা দূর এগিয়ে গিয়ে বুড়ি ঘাড় ফিরিয়ে ওকে মনে করিয়ে দিতে বলল, "পঁচিশটা আছে লম্বা নাকু, পঁচিশটা কাগজ।"

চোখ না তুলেই ও জবাব দিল, "গুণে দেখতে হবে।" তারপর সত্যিই সে কাগজগুলো এক এক করে গুনল।

মিনিট দশেক কাজ করার পর বড় একঘেয়ে মনে হল ওর কাজটাকে। অন্য সময় হলে এতক্ষণ ও উদাস চোখে হয়তো কোন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। কিংবা কোনরকম অস্থিরতা প্রকাশ না করেই হয়তো রাস্তার কোন বাঁকে হাঁটু গেড়ে বসে আধঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু এখন এই "দায়িত্বভার" বেশ জাঁকিয়ে বসেছে ওর ওপর।

"বেয়াক্কেলে বুড়ি কোথাকার!" গজগজ করে উঠল ও। "আমাকে এখানে একেবারে হাত পা বেঁধে রেখে গ্যাছে।"

স্বাধীনতা খর্ব হওয়ায় উদ্বিগ্ন নায়ক যখন সরে পড়ার তাল করছে ঠিক তখনই একজন খদ্দের এসে হাজির। লোকটা এগিয়ে এসে ওর দিকে একটা পয়সা ছুঁড়ে দিল।

টয়লেট পেপারটা দিতে গিয়ে একটা নতুন অনুভূতি সম্বন্ধে ও সচেতন হয়ে উঠল। সত্যিই সে তাহলে 'ব্যবসায়' নেমেছে! নিজেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হল। তার কাছ থেকে কাগজ না নিয়ে কেউই ভেতরে ঢুকতে পারবে না আর নিজেদের কারবারটি সারতে পারবে না। সশ্রদ্ধ গাম্ভীর্যে ও কাগজের স্তূপের পাশে তামার পয়সাটিকে রাখল। তারপর সযত্নে কাগজগুলোকে সমান করে গুছিয়ে রাখল।

এবার মনে হচ্ছে শৌচাগারে ভিড় লাগার সময় হয়েছে। আর এই লোকটি সম্ভবত তাদেরই একজন। হরেক রকমের লোক একটানা স্রোতের মতো এসে হাজির হতে লাগল। আর টয়লেট পেপারের বাক্সে চলতে লাগল তাম্রমুদ্রার বর্ষণ।

অল্পক্ষণের মধ্যেই পাঁচ-ছটা তামার পয়সা জড়ো হল। বিক্রেতা মশাইএর তখন হিমসিম খাবার মতো অবস্থা। বাণিজ্য জগতে ও একেবারেই আনকোরা আর তাছাড়া এর আগে একসঙ্গে এতগুলো তামার পয়সার অধিকারীও সে কখনো হয়নি।

ক্ষণিক বিরতির সুযোগ নিয়ে ও পয়সাগুলোকে গোছ করতে লাগল। সদ্য সাজিয়ে রাখা প্রথম তিনটি পয়সার দিকে তাকিয়ে ও চতুর্থটিকে নিয়ে এমনভাবে তার ওজন পরখ করতে লাগল যেন ওটাকে ও নিজের কাছেই রাখতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওটাকে ও গোছের মধ্যেই যোগ করল, তারপর রাখল পঞ্চমটি, এবং তারপর ষষ্ঠটি।

খরিদ্দার আসছে তো আসছেই। তাম্রমুদ্রার সংখ্যা বারোর ঘরে গিয়ে পৌঁছল। এ যেন পয়সার পাহাড়! অতঃপর বিক্রেতার বিশ্রামের অবকাশ মিলল।

বা-রো-টা পয়সা! পয়সাগুলো জমে এক ইঞ্চিরও বেশী লম্বা একটা তামার স্তম্ভ হয়ে উঠেছে। বেড়াল যেমন ইঁদুরকে নিয়ে খেলা করে, আমাদের নায়ক তেমনি পয়সাগুলোকে ভাগ করে দু হাতে তুলে নিয়ে ওজন করে। এক হাতের পয়সাগুলোকে বাক্সে রেখে দিল। অন্য হাতটা, যাতে স্বাভাবিকভাবেই বাকী পয়সাগুলো রয়েছে, সেটা এবার তার ছেঁড়া ধুলধুলে জামার পকেটটার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল। আর তারপরই এক ঝটকায়—বেড়ালটা তার মুখ থেকে ইঁদুরটাকে দিল ফেলে—মানে, হাতের পয়সাগুলোকে ও পয়সার স্তূপে যোগ করল। আবার গড়ে উঠল স্তম্ভটা।

দ্বিতীয়বার স্তম্ভের অর্ধেকটা আবার ও খামচে তুলে নিল। পয়সাগুলো ওজন করার জন্য অপেক্ষা না করেই ওর হাতটা অভ্যস্ত গতিতে সোজা গিয়ে ঢুকল পকেটে। কাগজের বাক্সে রাখা পয়সার দিকে চোখ পড়তেই পকেটের মধ্যে ওর হাতটা থমকে গেল। বুড়ি যদি ঠিক সেই মুহূর্তে এসে হাজির না হত তাহলে হাতের পয়সাগুলোকে ও হয়তো ফিরিয়েই দিত। চমকে গিয়ে বুড়িকে ডাকল ও। আর ঠিক তখনি পয়সা ভর্তি হাতটা আস্তে আস্তে সেঁধিয়ে গেল পকেটের মধ্যে।

তাড়াহুড়ো করে ছুটে আসায় হাঁপাচ্ছিল বুড়ি। ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। প্রায় নিঃশেষিত টয়লেট পেপারের গাদা আর তার ওপর জড়ো করা তাম্রমুদ্রার দিকে তাকাল বুড়ি। "কি? ভালভাবে কাজ করিনি? আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত তোমার!" উঠে দাঁড়াল তারপর চোখ পিট্‌পিটিয়ে চলে যাবার জন্যে ও পা বাড়াল। কয়েক পা এগিয়েই কিন্তু ফের ঘুরে দাঁড়াল। বুড়ি তখন একমনে পয়সা আর কাগজগুলো গুণছিল। ছুটতে

গিয়েও ওর মনে হল তার কোন প্রয়োজন নেই।

"হাওয়ায় কটা কাগজ উড়ে গিয়ে ডোবায় পড়েছে।" দূর থেকে চেঁচিয়ে বলল। "ওগুলোকে তুলে নিয়ে রোদে শুকিয়ে নিলে আবার নতুনের মতো দেখাবে।"

এতক্ষণে বুড়ির বোধগম্য হল পয়সা আর কাগজের মধ্যে একটা ফারাক রয়েছে। অনেক চেষ্টা করে ঠোঁট নাড়ল বুড়ি।

"তুই সৎ নোস, লম্বা নাকু।"

"কি বললে?" বেশ রাগত স্বরেই উত্তর দিল ও। "তোমাকে বললামই তো, হাওয়াতে ওগুলো উড়ে গেছে।" এবার ও আস্তে আস্তে ছুটতে শুরু করল। কিছু দূর গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে হাতটাকে মুঠো করে তুলে ধরল।

"বল তো বুড়ি আমার এই মুঠিতে কি আছে? ঠিক বলতে পারলে স-ব তোমার। হাঃ, হাঃ, হাঃ।" হাসতে হাসতেই রাস্তা ও পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর ওর ছোটার গতি মন্থর হয়ে এল। আঙুলগুলো পকেটের মধ্যে নাগাড়ে তখন পয়সা গুণে চলেছে।

সবসুদ্ধু পাঁচটা। এই প্রথম ও একসঙ্গে পাঁচটা পয়সা পেল। ওর মনে হল, যথেষ্ট পরিমাণ মূলধন হিসেবে এগুলোকে অনেক কাজে লাগানো যাবে। হাঁটার গতি আরো মন্থর করে ও গভীর চিন্তায় তলিয়ে গেল। মুখের তালুতে সুড়সুড়ি দেবার জন্যে ছোটখাট চুইংগাম গোছের কিছু কিনলে হয় না? ক্যাণ্ডির কথাও মনে পড়ল। খেয়ে পেট ভরানোর ব্যাপারে ও ওর দোস্তদেরই মতো। এ সমস্যাটা তো ভিক্ষা অথবা আরো জোরদার কিছু করে মেটানো যেতে পারে। (যেমন হোটেল বয়কে মাঝপথে আক্রমণ করা।) বুদ্ধুরাই কেবল খাবারের জন্যে পয়সা খরচ করে।

ক্যাণ্ডিটা অবশ্যই অন্য ব্যাপার। কারুর কাছ থেকে ক্যাণ্ডি ভিক্ষে চাইলে নাকের ওপর একটা ঘুঁষি এসে পড়াটাই স্বাভাবিক। আর এও নিশ্চিত থাকতে পারো, হোটেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া শেষ ক্ষেপের উচ্ছিষ্ট বাসনের মধ্যে তুমি যাই পাও ক্যাণ্ডি পেতে পার না। আমাদের নায়ক কবে একবার ক্যাণ্ডির একটা টুকরো খেয়েছিল! আর এখন, পকেটে পাঁচ পাঁচটা তামার পয়সা নিয়ে ক্যাণ্ডির চিন্তা আরো বেশী আকর্ষণীয়!

প্রশস্ত ছিমছাম একটা গলির মুখে দেখল একপাল ছেলে একটা দোকানের সামনে জড়ো হয়েছে। ও তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্যাণ্ডির ছিঁটেফোঁটাও নেই এখানে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ধারে ছবিওলা বই পড়তে দেওয়া হচ্ছে। ওখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ফেরত দিয়ে

দিতে হবে। অনেকদিন ধরে আমাদের নায়কের এই বইগুলো দেখার লোভ ছিল। আগে বাচ্চাদের কাঁধের পাশ দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখত। কিন্তু যখনই সে ছবির ব্যাপারটা সবে বুঝতে শুরু করত তখনই পাঠকমশাই পাতাটাকে দিত উলটে। অল্প কয়েকটা বই ও ধারে পড়তে নেবে ঠিক করে ফেলল। নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী ধীরেসুস্থে উপভোগ করবে।

"এক পয়সায় কুড়িটা, তাই না?" অভিজ্ঞের মতো জিজ্ঞেস করল। "এখানে দাঁড়িয়েই শেষ করে ফেরত দিয়ে দেব।"

পুস্তক বিক্রেতা ওর দিকে এক ঝলক তাকিয়েই ঘৃণাভরে বলল, "দূর হ খুদে দাদ-মাথা কোথাকার!"

"কি? কে হে তুমি? যা-তা বলছ যে? আমার কাছে পয়সা আছে, এই দ্যাখ!" মুঠো খুলে পয়সা পাঁচটাকে দেখাল। ঘামে ভিজে চক্‌চক্‌ করছিলো পয়সাগুলো।

পয়সা নিতে হাত বাড়িয়ে দোকানী বললে, "পয়সায় পাঁচটা বই। পাঁচ পয়সা দিলে বাড়তি সুযোগ দেব, তিরিশটা বই দেখতে পাবে।"

"সেটি হচ্ছে না। এক পয়সায় পনেরোটা বই চাই। কি বলতে চাও, পনেরোটাও দেবে না?" এক ঝটকায় পয়সাগুলো পকেটে পুরে ঘাড় উঁচু করে অন্য একটা পড়ুয়া ছেলের বইয়ের দিকে তাকাল।

শেষ পর্যন্ত দশটায় রফা হল। মাত্র দুটি পয়সা দিয়ে কুড়িখানা বই নিল। সব বইগুলোই অসাধারণ অসিবাজ তাওয়িস্ট পুরোহিত এবং সাহসী নারী যোদ্ধাদের সম্বন্ধে।

লেখা পড়তে পারে না তাই ছবি দেখে ও মনোমতো ব্যাখ্যা করতে লাগল। বইগুলোর মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা ছিল কিন্তু ছবিগুলো ভালো নয় এবং নিজে নিরক্ষর বলে কোন্‌টার পর কোন্‌টা আসছে বুঝতে পারছিলো না। যাই হোক সে বেশ ধৈর্য ধরেই বইগুলোর ওপর চোখ বুলতে লাগল।

একটা ছবিতে দেখা গেল, একজন মহিলা ছোট্ট একটি শিশুকে নিয়ে ভীষণদর্শন একসারি আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে লড়ছে। এদের মধ্যে একজন সন্ন্যাসীও রয়েছে। দুদিকে ধার দেওয়া বৃহদাকারের একটি তলোয়ার মহিলা এবং শিশুটির দিকে ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। সাধারণত দুদিকে ধার দেওয়া তলোয়ার জাতীয় অস্ত্রের ওপর ওর একটা তীব্র আকর্ষণ আছে। কিন্তু এখন এটি তার বিতৃষ্ণার অনুভূতি জাগাল।

"ঠিক যেন ঘুমন্ত কুকুরকে পেটানোর মতো—বেজন্মা ছাড়া এ কাজ কেউ করতে পারে! নোংরা কাপুরুষের দল!"

পাতা উলটে দেখল মহিলা এবং শিশুটি বনের দিকে ছুটে পালাচ্ছে আর

ভীষণদর্শন দস্যুরা তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে তাদের পিছু ধাওয়া করছে। অধৈর্য হয়ে তাড়াতাড়ি আরেকটা পাতা ওলটালো। মন্দ না। বনের ধারে যুদ্ধ করতে মহিলাটি দাঁড়িয়ে পড়েছে। এই ছবিতে অন্য একজন সন্ন্যাসী, দেখা যাচ্ছে, ঝকঝকে ছুরি হাতে ছুটে আসছে—লড়াইয়ে যোগ দেবার জন্যেই নিশ্চয়। "কে ওটা ? সাহায্য করতে ছুটে আসছে ?" অস্বোয়াস্তি প্রকাশ করল আমাদের নায়ক। তারপর আর একটা পাতা ওলটালো। যদি সন্ন্যাসীটি সহৃদয় হয় তবে মহিলা এবং শিশুটিকে তার রক্ষা করা উচিত, মনে মনে চিন্তা করল ও। নিজে হলে ও এমনটাই করত। কিন্তু পরের ছবিতেও তো একই লোকেদের দেখা যাচ্ছে। তারা মারামারি থামিয়ে দিয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে প্রত্যেকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছে— সন্ন্যাসীও তাদের মধ্যে আছে।

পড়তে পারলে ও ঠিক বুঝতে পারত ওরা কি বলাবলি করছে আর সন্ন্যাসী কাকে সাহায্য করতে চায়। বোঝাই যাচ্ছে সন্ন্যাসীটি কথা বলছে— তাই ওর মুখের মধ্যে থেকে একটা বেলুনের মতো বেরিয়ে এসেছে আর বেলুনটার মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো অক্ষর।

পরের ছবিতে অক্ষরগুলোকে নিয়ে ও দিশেহারা হয়ে পড়লেও বলাই বাহুল্য কোন অর্থোদ্ধার করতে পারেনি। যুদ্ধ নিশ্চয় থেমে গেছে। এই ছবিতে মহিলাটির মুখ দিয়েও একটা বেলুন বেরিয়ে এসেছে।

পরের ছবিটাতেও মহিলা এবং শিশুটিকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু অন্য সবাই (ভীষণদর্শন মানুষগুলো এবং সন্ন্যাসী দুজন) অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাছাড়া মহিলাটিও আর জঙ্গলে নেই। একটি বাড়ির মধ্যে রয়েছে। হাতের তলোয়ারটাও নেই। একটা বিছানার ধারে মাথা নীচু করে বসে আছে। খুব উদ্বিগ্ন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখাচ্ছে। শিশুটি তার সামনে দাঁড়িয়ে, তার মুখ দিয়েও একটা বেলুন বেরিয়ে এসেছে আর তার মধ্যেও রয়েছে আরো গাদাখানেক যাচ্ছেতাই অক্ষর।

কি যে ঘটছে সে সম্বন্ধে একটা ক্ষীণতম ধারণাও করতে পারল না আমাদের নায়ক। অত্যন্ত বিরক্ত হল শিল্পীর ওপর। "দরকারী ব্যাপারগুলোকে কি ছবি এঁকে বোঝান যেত না ?" বিড়বিড় করতে লাগল ও। "শুধু গাদা গাদা কতগুলো শব্দ ঝেড়ে কাজ সেরেছে।" তার মনে হল মহিলা এবং শিশুটিকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রেখে ওরা ঠিক কাজ করেনি। তবু শেষ পর্যন্ত ওরা যে নিরাপদে বাড়ি পৌছতে পেরেছে তার জন্য ও খুব খুশী। ওর মনে হল—এখানেই বোধহয় ওদের প্রথম যাবার কথা হয়েছিল।

এক কথায়—মহিলা এবং শিশুটির মঙ্গলের জন্য ও খুবই চিন্তিত হয়ে

পড়ল। ওদের পূর্ব-পরিচয় ওর কাছে একেবারে অজানা হলেও ও নিঃসন্দেহ যে ওরা ভালো লোক না হয়ে পারে না। ওদের অন্তিম পরিণতির কথা জানার জন্য উদ্বিগ্ন বোধ করল আমাদের নায়ক। যে বইয়ে শুধু ওদেরই ছবি আছে সেইরকম বইগুলো বেছে নিল। তারপর খুব সতর্কভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবিগুলোকে দেখতে লাগল।

কোথাও কোথাও ওরা শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধরত। কল্পনায় ভর করে ও এই ছবিগুলোকে গল্পের আগের অংশের সঙ্গে মেলাতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই কুড়িটা বই শেষ করে ফেলল।

"এই যে, বইগুলো ফেরত দিচ্ছি, কুড়িটাই! মহিলা আর ছেলেটিকে নিয়ে আর বই আছে কি?" দোকানীকে জিজ্ঞেস করল ও। একটা হাত পেটে চেপে ধরেছে। পেটটা গুড়গুড় করতে শুরু করেছে।

অন্য একটি তরুণ পাঠককে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় দোকানী অন্যমনস্কভাবে মলাটে মেয়ের ছবি আঁকা এক সেট বই তুলে দিল আমাদের নায়কের হাতে।

মলাটের মহিলার পোশাক দেখেই ও বুঝতে পারল আগের মহিলা আর এই মহিলা এক নয়। মেয়েটির কাছে তলোয়ারও নেই, বল্লমও নেই। তবে তাকে দেখে প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলে মনে হচ্ছে। যেভাবে কায়দা করে দাঁড়িয়েছে প্রত্যেকটি ভঙ্গিই বেশ আকর্ষণীয়।

পাতা উলটে নেড়ে-চেড়ে দেখার পর তার বিষয়বস্তু আমাদের নায়ককে বেশ নিরাশ করল। হঠাৎ তার মনে পড়ল বইগুলোর জন্যে ও এখনও কোন পয়সা দেয়নি। "বইগুলো তেমন সুবিধের নয়," নিরাসক্তের মতো কথাগুলো উচ্চারণ করে ও চলে যাবার জন্যে পিছন ফিরল।

"এখনও দাম দেওয়া হয়নি কিন্তু।" বইগুলো গুনতে গুনতে দোকানী বলল, "এর জন্যে আরো পয়সা দিতে হবে।"

"কি! বইগুলোতে শুধু একবার চোখ বুলিয়েছি আর তার জন্যে তুমি পয়সা চাইছ?"

"তুমি তো বলনি, তুমি শুধু বাছতে চাও, বলেছিলে কি? তুমি যদি শুধু বইগুলো কেমন দেখতে চাইতে তাহলে একটা বই-ই দেখতে দিতাম। তুমি পুরো সিরিজটাই দেখেছ। এখন আর ঠকালে চলবে না—দুটি পয়সা ছাড় দেখি।"

"ঠকাচ্ছেটা কে শুনি?" বেশ একটু অস্বস্তিতে পড়ে আমাদের নায়ক। কিন্তু যতই ও চিন্তা করে পয়সা দেবার ইচ্ছেটা তার ততই কমে আসে। "ঠিক আছে, এবারকার মতো লিখে রাখো, কাল দিয়ে দেবো।"

"কোন্ চুলোর বাসিন্দা কে জানে। ওসব ধার-টার হবে না।"

"তুমি চেন না আমায় ? আমি লম্বা নাকু। যাও, জিজ্ঞেস করো গিয়ে ওই বুড়িকে। পেচ্ছাবখানায় যে কাগজ বিক্রী করে। ও-ই বলে দেবে।"

কথাটা শেষ হতে না হতেই আমাদের নায়ক সেখান থেকে হাওয়া হয়ে গেল। এ-ধরনের কাজে ও বেশ পটু।

পয়সা দুটোকে রক্ষা করতে পেরেছে আবার লম্বা নাকু হিসেবেও নিজের পরিচয় দিয়েছে। মনে মনে ভাবল, নামটা তার খারাপ না। তারই বয়সী কোন ছেলে যখন নিজের পৌরুষ নিয়ে গর্ব করে তখন তো সে তার নাকটাকেই দেখায়। (বিদেশী ছেলেরা যেমন বুকে হাত চাপড়ায়— অনুবাদক।) দেহের মধ্যে এটি অন্যতম মূল্যবান অঙ্গ।

৪

আমাদের নায়কের—কিংবা বলা যেতে পারে লম্বা নাকুর (কারণ ওর ইচ্ছে লোকে ওকে ওই নামেই ডাকুক) আরো কতকগুলো পলায়ন অভিযানের অভিজ্ঞতা আছে। একটা ঘটনার কথা বলি। অবশ্য এবারেও আগের মতোই বলতে পারবো না ঠিক কবে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। তবে এটা ঠিক যে এই দিনটি পূর্ববর্তী ঘটনা স্থান লাভ করার এক বছরের মধ্যেই এসেছিল, সেদিন মুহুর্মুহু রোদ বৃষ্টির পালাবদল চলছিল।

তখন মধ্যাহ্নভোজের সময়, রাস্তাঘাট জনাকীর্ণ। আমাদের নায়ক, লম্বা নাকু একটা সুবিধে মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে ধনী লোকদের দিকে নজর রাখছিল তাদের বিশ্বাস অর্জন করবে এই আশায়। তাহলে হয়তো তারা তাদের ঐশ্বর্যের কণা মাত্র তাকে দান করতে পারে। আলতো পায়ে সামনের দিকে লাফ দিয়ে ও এক সুন্দরী দম্পতিকে অনুসরণ করতে লাগল।

"ও দিদি, ও দাদাবাবু, দয়া করে একটা পয়সা দিন।" মিষ্টি গলায় ও তোষামোদ করতে লাগল।

অভিজ্ঞতাই ওকে শিখিয়েছে, এই ধরনের লোকেদের পিছনে লেগে থাকলে শেষ পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়-ই। আগে হোক কি পরে হোক, তরুণীটি বিরক্ত হয়ে বলবে—"বিরক্তিকর—একেবারে নাছোড়বান্দা।" এবং তরুণটি তখন কানকে অব্যাহতি দিতে ও তরুণীর অনুগ্রহ খরিদ করতে একটি পয়সা খরচ করবে।

কিন্তু আজ ও অনেকক্ষণ ধরে পিছু ধাওয়া করেও কোন ফল পায়নি। হাতে হাত ধরে চলেছে দুজনে। নিজেদের কথার মধ্যেই নিমগ্ন।

একটা রাস্তার মোড় ঘুরল ওরা। সেখানে একজন পুলিস দাঁড়িয়ে। লম্বা নাকু খানিকটা থেমে ওদের সামনের দিকে ভালভাবে এগিয়ে যেতে দিল তারপর পুলিসটাকে পেছনে ফেলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। ইতিমধ্যে তরুণ দম্পতিটি বেশ খানিক দূর এগিয়ে গেছে। ওদের ধরতে পারবে কিনা এ বিষয়ে ও নিশ্চিত ছিল না। যাই হোক শেষ পর্যন্ত ও দেখল ওর পিছু ধাওয়া করা ব্যর্থ হবে না কারণ ওরা দুজনে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

লম্বা নাকু ছুটতে শুরু করল। অন্য একজন মহিলা এসে যোগ দিয়েছে দম্পতি যুগলের সঙ্গে। সবাই মিলে কথা বলছে। হঠাৎ দুই মহিলার মধ্যে শুরু হয়ে গেল ঝগড়া আর তারপর মারামারি। তরুণটি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওদের মধ্যস্থতা করছে। লম্বা নাকু কাছে আসার আগেই বেশ কিছু লোক জমা হয়ে গেল দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর চারপাশ ঘিরে। প্রত্যেকেই পরস্পরবিরোধী নানা রকম উপদেশ দিচ্ছে। লোকজনের ধাক্কাধাক্কির মাঝখানে হঠাৎ একজনের একটা পয়সার থলি পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লম্বা নাকুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তার ওপর। বিশ্বাস করে অন্য কারুর ওপর কাজটির ভার ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছে না থাকায় ও বীরদর্পে থলিটিকে উদ্ধার করে সেটিকে বেশ ভালভাবে পকেটস্থ করল। তারপর দর্শকদের পায়ের ফাঁক গলে বেরিয়ে এসে রাস্তার উল্টো দিক দিয়ে হাঁটতে লাগল। খুশীতে তখন শিস দিচ্ছে লম্বা নাকু।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে লম্বা নাকু সব সময়ই খুব সাহসী—যদিও এখনো ও লোকের পকেটে হাত ঢোকানোর মতো অবস্থায় এসে পৌঁছয়নি। এ রকম অবস্থায় ও খুব পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আগে কোন সময় ওকে যদি আমরা ইতস্তত করতে দেখে থাকি—যেমন সাধারণ শৌচাগারের সেই বুড়িটির কাছ থেকে পাঁচ পয়সা নেবার সময়—তাহলে বলতে হবে সেটা কোন শিশুসুলভ দুর্বলতার কারণে ঘটেনি। আসলে সে বিশ্বাসের অমর্যাদা করতে চায় না। বুড়ি তাকে বন্ধু হিসেবে কাজের ভার দিয়েছিল। কাজেই তার পক্ষে বুড়ির পুরো রোজগারটাই আত্মসাৎ করা সম্ভব ছিল না।

৫

গ্রীষ্মের দিনে লম্বা নাকু যত্রতত্র আস্তানা গাড়তো। সে নিজে এবং তার সমগোত্রীয়দের মধ্যে কি যেন একটা রহস্য ছিল। দিনের বেলা আমরা যেখানেই যাই না কেন ধরে নিতে পারি সেখানে তার সাক্ষাৎ মিলবেই। অথচ রাত্রে সে কোথায় নিশি যাপন করে কদাচিৎ জানা যায়।

তবে এটা ঠিকই এই বৃহত্তর শাংহাইতেই ও থাকে। আর তার যে ডানা গজায়নি, কোথাও উড়ে যেতে পারে না—একথা বেশ জোর দিয়েই বলা যেতে পারে।

ও কি তাহলে রাত্তিরে মেঠো ইঁদুরের মতো গর্তের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়? এ বিষয়ে লেখক কোন অনুসন্ধান চালায়নি কাজেই এ প্রশ্নের জবাব দেওয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়। যাই হোক, লেখক অবশ্য এ কথাটা বলার দায়িত্ব বহন করতে পারে যে লম্বা নাকুর অনেকগুলো আস্তানার মধ্যে একটা অন্তত আকাশের গায়ে নয় বা পাতালপুরীতেও নয়।

খুব সম্ভবত পাঠকরা জানেন, বৃহত্তর শাংহাইয়ের উত্তরাংশে, চীনা বস্তি আর বিদেশী কুঠিগুলোর সংযোগস্থলে রয়েছে ইঁট-পাথরের একটা ধ্বংসস্তূপ। যার মধ্যে জায়গায় জায়গায় গজিয়ে উঠেছে কচি ঘাস। ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ স্থানটিকে পবিত্র করার জন্যে যে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছিল অঞ্চলটি আজও তার সাক্ষী বহন করে চলেছে।

গৌরবময় যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে কয়েকটি সুউচ্চ প্রাচীর এমনভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, দেখে মনে হয় তারা ঘোষণা করছে, দুনিয়ার কোন আঘাতই তাদের নোয়াতে পারবে না। এরই একটি প্রাচীরের পাশে রয়েছে একটি ডাস্টবিন। যেটি শাংহাইয়ের এই অঞ্চলের "সমৃদ্ধির" একটি নিদর্শন। ভাঙা ইঁট আর সুরকিতে ঢাকা এই সিমেণ্ট বাঁধানো আঁস্তাকুড়টাকে দূর থেকে দেখে একটা রাবিশের স্তূপ মনে হয়। এই বিশেষ আস্তানাটি হঠাৎই আবিষ্কার করে ফেলেছিল লম্বা নাকু। সেটা কবে ঘটেছিল এবং কেমন করে, বলতে না পারলেও এটা ঠিক, জায়গাটা তার বেশ মনে ধরে এবং কিছুটা পরিশ্রম করে জায়গাটাকে সে শীতকালীন আস্তানা বানায়।

আমাদের এইসব উক্তি কিন্তু ভিত্তিহীন নয়। জানুয়ারির শেষের দিকে একজন চাক্ষুষ করেছিল লম্বা নাকু হামাগুড়ি দিয়ে তার আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসছে, এবং সে আস্তানাটির অবস্থান আকাশের গায়েও নয় বা পাতাল-পুরীতেও নয়।

আকাশে মেঘ থাকলেও দিনটা তেমন ঠাণ্ডা ছিল না। হ্যাঁ, সেদিন কিন্তু সূর্যও ওঠেনি। ভোর থেকে আকাশটা মেঘে ছেয়ে ছিল।

সেদিন ভোরে শাংহাইয়ের কিছু কিছু অঞ্চলে, সম্মানিত ভদ্রলোকেরা নিশ্চয় তাঁদের মুনিসুলভ ধ্যান ভঙ্গ করে উঠে দাঁড়িয়ে যথারীতি তিন মিনিট নীরবতা পালন করে তবে তাঁদের সরকারী অফিস বা ব্যবসা কেন্দ্রের দিকে পা বাড়ান···আর সেইদিনই সকালে শাংহাইয়ের একটি অন্যতম প্রধান

সড়কে বন্যার বিপুল স্রোতের মতো বিভিন্ন ধরনের মানুষ কাতারে কাতারে এগিয়ে যাচ্ছিল। তাদের পৃথিবী কাঁপানো চিৎকার বজ্রপাতের মতো চার বছর আগেকার কামান বাহিনীর গোলাবর্ষণের জবাব দিচ্ছিল।

আমাদের বন্ধু লম্বা নাকু তখন সকালের জলখাবার যোগাড় করতে সবে আস্তানার বাইরে পা রেখেছে। পদযাত্রীদের দেখে ও ভাবল এরা বোধহয় কোন শবযাত্রার অংশ। চুলোয় যাক উ. সে., ও গজগজ করে উঠল। পেশাদার শোকযাত্রী হয়ে ভাড়া খাটার এমন সুযোগের কথা ব্যাটা ঘুণাক্ষরেও আমায় জানায়নি! রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ক্ষুদে উ. সে.-কে ধরতে পারে কিনা। নিশ্চয় ওর হাতে কাগজের ফুলের মালা কিংবা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অন্য কোন জিনিসপত্র থাকবে।

মিছিলে যারা চলেছে তাদের কারুরই পোশাক কিন্তু শবানুগমনকারীর মতো নয়। তাদের মধ্যে কেউ চীনা পোশাক পরেছে, কেউ পরেছে বিলিতী পোশাক, কেউ বা ছাত্র, কেউ শ্রমিক, কেউ শিক্ষানবিশ...আর তাদের বেশীর ভাগের হাতে আছে একটা করে ছোট পতাকা।

সীমাহীন মানুষের স্রোত বয়ে চলেছে না বলে বরং বলা ভাল, মানুষের সারির দৈর্ঘ্য ক্রমশ বেড়েই চলেছে। কারণ মিছিলে যোগ দেবার জন্যে আশপাশ থেকে পথ চলতি মানুষ এসে যোগ দিচ্ছে। শয়ে শয়ে, হাজার হাজার মানুষ আসছে। নারী পুরুষ বৃদ্ধ, শিশুরাও বাদ নেই।

মিছিলের পাশে পাশে যারা পায়ে হেঁটে অথবা সাইকেলে চড়ে চলেছে তারা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের হাতে হ্যাণ্ডবিল গুঁজে দিচ্ছে। দু-একটা কথাও বলছে তাদের সঙ্গে। হঠাৎ মিছিলটা ভয়ংকর একটা গর্জন করে উঠল, "মুক্ত করো চীনকে!"

শত সহস্র কণ্ঠ থেকে উঠল শত সহস্র ধ্বনির ঐকতান গর্জন।

লম্বা নাকু এই প্রতিবাদের অর্থ ধরতে না পারলেও এটা বুঝল যে এই মিছিল কোন শবানুগমনকারীদের মিছিল নয়।

একটু হতাশ হয়েও উৎসাহিত না হয়ে পারে না লম্বা নাকু। একজন ওর হাতে একটা কাগজ গুঁজে দিয়ে বলল, "আমাদের সঙ্গে এসো ভাই, যোগ দাও এই দেশাত্মবোধক পদযাত্রায়।"

তাকে কি করতে বলা হচ্ছে, লম্বা নাকু কিছুতেই বুঝতে পারে না। শোক প্রকাশের জন্য কোন মালাও নেই যা তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। যেখানেই কোন জমায়েৎ এবং উত্তেজক কোন ব্যাপারট্যাপার ঘটে সেখানে আমাদের লম্বা নাকু অত্যন্ত বেপরোয়া। কাজেই সেও তাদের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল।

বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে করতে মিছিল এগিয়ে চলল। লম্বা নাকুর ঠিক সামনে চলেছে দুজন যুবক এবং একটি মেয়ে। ওরা যে কি নিয়ে কথা বলছে ও তার কিছুই বুঝছে না। বিশেষ করে তাদের কথাবার্তার মধ্যে বিদেশী শব্দগুলো গণ্ডগোল বাধাচ্ছে। লম্বা নাকু বিদেশী ভাষাকে ভীষণ ভাবেই ঘৃণা করে, কারণ বিদেশীরা প্রায়ই ওকে মারধোর করে। আর যে সব চীনালোক বিদেশী ভাষায় কথা বলে তাদের কাছ থেকেও ও হামেশাই পিটুনি খেয়েছে। তফাতের মধ্যে চীনাদের মারটা আরো জোর। মনে হল মিছিলের অগ্রভাগটা একটা বাধার সম্মুখীন হয়েছে। সামনের দিক থেকে চিৎকার শোনা যেতে সবাই থমকে দাঁড়াল। লম্বা নাকুর চারপাশ ঘিরে প্রতিবাদের প্রতিধ্বনি ফেটে পড়তে লাগল।

"এগিয়ে চল···ধ্বংস কর ওই অত্যাচারীদের।" পেছন থেকে বেগে ছুটে এল প্রতিবাদধ্বনি।

মেঘমুক্ত দিনের সহসা বজ্র নির্ঘোষের মতো অগ্রগামী বাহিনী দারুণ রোষে গর্জে উঠল।

"বিশ্বাসঘাতকেরা নিপাত যাক।"

"১৯৩২ সালের আটাশে জানুয়ারির জাগরণ দীর্ঘজীবী হোক!"

"নিপাত যাক···"

সামনের দিকে হঠাৎ নিশ্চয় কিছু ঘটায় প্রতিবাদ ধ্বনি মাঝপথেই স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু পেছনের সারি পুরোদমে এবং দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে চিৎকার করে উঠল ঃ

"জাপানী সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!"

প্রতিবাদ ধ্বনির সঙ্গে লম্বা নাকুও গলা মেলাল। হঠাৎ ওর নজর পড়ল ওর পাশের ছাত্রটির ওপর। ওভারকোটের বোতামটা যে খুলে গেছে খেয়ালই নেই। ভেতরের পকেট থেকে পয়সার ছোট ব্যাগের হাতলটা উঁকি মারছে। নব অর্জিত দক্ষতায় উৎসাহিত লম্বা নাকু, পরিষ্কার দেখতে পায় ব্যাগের হাতলটা ওকে হাতছানি দিচ্ছে। "শয়তানের বাচ্ছা, নিপাত যাও··· !" বলতে বলতে ও ছাত্রটির কাছ ঘেঁষে ঘন হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু ঠিক সুযোগের মুহূর্তটিতে চারপাশের পুলিস বাহিনী বন্য পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল মিছিলের ওপর। বিক্ষোভকারীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল পতাকাগুলো। গর্জে উঠল ঃ

"তোমরা কেউ শ্লোগান দিতে পারবে না। শ্লোগান দেওয়া নিষিদ্ধ।"

ভয় পেয়ে লম্বা নাকু মাথা নীচু করে একজোড়া লম্বা পা গলে গুঁড়ি মেরে পালাতে লাগল। চোখের সামনে দেখল ছাত্রটিকে এবং একটি মেয়েকে ধরে

পুলিস ঠ্যাঙাচ্ছে। ওরা ওদের পতাকা ফেলে দিতে অস্বীকার করছে।

মেয়েটি এবং ছাত্রটিকে সাহায্য করতে অনেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাইকেল আরোহীরা ঘণ্টা বাজিয়ে দ্রুতগতিতে তাদের দিকে ছুটে এল। মিছিলের সামনের অংশ ছুটে এল তাদের উদ্ধার করতে। মিছিলের মধ্যবর্তী অংশে রণক্ষেত্রের তোলপাড়।

"বদলা নাও..." সমস্বরে চিৎকার করে উঠল সবাই। লম্বা নাকুও যোগ দিল ওদের সঙ্গে। বুঝতে ওর কোন অসুবিধে নেই। ওখানে দাঁড়িয়েই ও মনে মনে একটা সমীকরণ কষে নিল। নিজেও সে সব সময় পুলিসের পিটুনি খায় আর এখন মেয়েটি এবং ছাত্রটি পুলিসের মার খাচ্ছে। ও নিজেও একজন সৎ মানুষ কাজেই ওরাও ভালো না হয়ে পারে না। তাছাড়া ভালো লোকদের উচিতই হল একে অন্যকে সাহায্য করা!

একজনের হাত থেকে তার পতাকাটা খসে পড়ল। লম্বা নাকু সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে তুলে নিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে নাড়তে লাগল।

শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ থামল। মিছিল আবার চলল এগিয়ে। মারামারির সময় ছাত্রটির এবং মেয়েটির একটি পতাকা খোয়া গেছে। এখন ওরা লম্বা নাকুর পাশে পাশে এগিয়ে চলেছে। ও ওর পতাকাটা ছাত্রটির দিকে এগিয়ে দিল, "চিন্তা করো না! আমি একটা পতাকা পেয়েছি, এই নাও, ধরো এটাকে!"

ছাত্রটি সস্নেহে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল তারপর অন্য একটি ছাত্রকে কি যেন বলল। ব্যাপারটা কিছুই বোধগম্য হল না লম্বা নাকুর। খানিকটা বিরক্ত হয়েই লম্বা নাকু বলল, "আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"মিয়াওহং-এ।"

"কেন? আর এই পতাকাগুলোই বা কিসের জন্যে?"

"ছোট্ট বন্ধু, কয়েক বছর আগের কথা কি তোমার মনে আছে?" মেয়েটি বাধা দিয়ে বলে উঠল, "শাংহাই শহর সেদিন বিধ্বস্ত হয়েছিল বোমায় বোমায়। প্লেন থেকে বোমা ফেলা হয়েছিল। জাপানী প্লেন। অনেক বাড়ি ঘর বোমার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল।"

"মনে আছে...," বলল লম্বা নাকু।

"খুব ভালো কথা, তোমার তো মনে আছে—তুমি প্রতিশোধ নিতে চাও না?"

লম্বা নাকু এ ধরনের কথার বেশ মানে বোঝে। মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়ে ও জানিয়ে দেয় ওদের সঙ্গে ও একমত।

"চীন স্বাধীন হবেই—" আর এক ঝঞ্ঝাময় প্রচণ্ড গর্জনে আকাশ-বাতাস

কেঁপে ওঠে। কথাগুলো যথাযথ বলতে না পারলেও লম্বা নাক্‌ও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি করল, "জাপানী সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!"

"১৯৩২ সালের আটাশে জানুয়ারীর জাগরণ জিন্দাবাদ!"

চারদিক জুড়ে ভয়ঙ্কর ঢেউয়েরই মতো প্রতিবাদ ধ্বনি ফুঁসছে।

লম্বা নাক্‌ একটু একটু বুঝতে পারে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এদের এই রোষের কারণ কি। আগ্রহের আতিশয্যে সেও জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে শুরু করল। ওভারকোটের বোতাম খোলা ছাত্রটি তার হাত নেড়ে ওকে স্বাগত জানাল তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাবার জন্যে। শুধু লম্বা নাক্‌ই দেখল ওর পকেট থেকে ব্যাগটা মাটিতে পড়ে গেছে। নীচু হয়ে ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে লম্বা নাক্‌ হাতে করে সেটার ওজন পরখ করল। তারপর বলল, "বিশ্বাসঘাতকরা নিপাত যাক!"

"চলো মিয়াওহং!"

অভ্যস্ত আঙুলের দক্ষ প্যাঁচে লম্বা নাক্‌ ব্যাগটিকে তার মালিকের পকেটে চালান করে দিল। হঠাৎ ওর সমস্ত মন বিদ্রোহ করে উঠল। হাত দুটো তুলে প্রতিবাদে ফেটে পড়ল ও, "শয়তানের বাচ্চা নিপাত যাক। চলো মিয়াওহং।"

ও জানে না মিয়াওহং কোথায় আর কি ধরনের জায়গা সেটা, তবু ওর কিন্তু এই মেয়েটি এবং ছাত্রটির ওপর বিশ্বাস আছে। ওর মনে হল ওদের সঙ্গে ওর যাওয়া উচিত। এবং যাওয়ার ফল ভালোই হবে।

"চীন স্বাধীন হবেই!"

বিক্ষোভকারীরা সেই রাবিশ-ভরা মাঠটা পেরিয়ে গেল। এখানেই লম্বা নাক্‌র আস্তানা।

ধ্বংসস্তূপটা চোখে পড়া মাত্র তাদের দেহে বিদ্যুৎ খেলে গেল। সমবেত কণ্ঠে তারা চিৎকার করে উঠল—

"চীন স্বাধীন হবেই!"

অনুবাদ / রমা ভট্টাচার্য

সংশয় ।। কুয়ো মোচো

"আমি জানি সাংহাইয়ে থাকার সময় তোমার কাছে আমি একটা বোঝার মতো ছিলাম। এখন আমি সরে এসেছি ঠিকই, কিন্তু তাতে তোমাকে আরোই অসুবিধেয় ফেলেছি। আমরা যখন চলে আসি আবহাওয়াটা বেশ ভালোই ছিল। কিন্তু বিকেলের দিকে সমুদ্র একেবারে খেপে উঠেছিল। দারুণ অস্বস্তিতে পড়েছিলাম আমরা। তিনটে বাচ্চাই অসুস্থ, আর সব থেকে কাহিল অবস্থা খুদে শান্তিটার। পরের দিন ও অবশ্য গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। নাগাদাকি এসে দেখি বরফ ঝরছে। তারপর পড়ন্ত বিকেলে য়ুনানে পৌঁছলাম যখন তখনো ঝড়ো ভাব কাটেনি। রাতটা শি চুয়ানের বাড়িতে কাটিয়ে ভোর হতেই উহু'র দিকে রওনা দিলাম।

"উহু-তে আমরা মাত্র দু'দিন ছিলাম। জায়গাটা খুব নিরাপদ বলে মনে হয়নি। একে ঠাণ্ডা, তার ওপর বাড়ির কাঠগুলোও মজবুত নয়। বাচ্চাগুলো ছুটোছুটি করে ক্রমাগত বাইরে-ভেতর করছিল। ওদের ওপর নজর রাখার দরকার ছিল। ওপরতলায় থাকাটা মোটেই সুবিধের নয় বুঝে এখন আমি একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছি। মাসে কুড়ি ডলার ভাড়া। বাড়িটা বেশ আকর্ষণীয়, সঙ্গে কমলালেবুর ছোট্ট একটা বাগানও আছে। ছেলেমেয়েরা ওখানে খেলাধুলো করে।

"তোমার হয়তো মনে আছে, আগে আমরা যেখানে থাকতাম সেখান থেকে কত গাছ দেখা যেত? মনে পড়ছে? প্রথমে ভেবেছিলাম একটা চিঠি লিখে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে তারপর বাড়িটা নেব। কারণ ভাড়াটা একটু বেশী। কিন্তু শেষকালে বাচ্চাদের জন্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা নিজেকেই নিতে হল। ভেবেছিলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা চলে যাব আর এখনকার মতো খরচটা আমি চালিয়ে নিতে পারব।

"সাংহাইয়ে তুমি কেমন আছ? আমি তো এখনও নিঃসঙ্গতা অনুভব করি। নিঃসঙ্গতার শোক আমার মনে সর্বক্ষণ পাক খাচ্ছে। বাইরে এখনও প্রবল বরফ পড়ছে, আর আমি বিষণ্ণ মেজাজে বসে আছি—মাত্র পনের দিন হল আলাদা, তবু যেন আমার মনে হচ্ছে এক বছর পার হয়ে গেছে।

"পরশুদিন কিছুক্ষণের জন্যে আকাশ একটু পরিষ্কার ছিল, আমি বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে বাজার করতে গিয়েছিলাম। সিনেমা হলের পাশ দিয়ে যাবার সময় ওরা আবদার জুড়ল সিনেমায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে। সারাক্ষণ বসে থাকার কাজ। ফেরার পথে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে খেয়ে নিলাম। সোনি ফু এতো খেয়েছে যে কোলে ওঠবার বায়না ধরল। প্রায় অর্ধেক রাস্তা তাকে পিঠে করে নিয়ে গেলাম। দিন দিন যা ভারি হচ্ছে না! রাতে পিঠের যন্ত্রণায় আর ঘুমতে পারিনি।

"তোমাকে এত কথা জানাতে চাই, আর এই এখন দেখো, শুরু করে কিছুই লিখতে পারছি না। যত সব ছাইপাঁশ লিখছি। কিছুতেই পারি না, বিষণ্ণ লাগে। এখন আর আমি সেই যুবতী নেই। আগে যেসব জিনিসকে খুব মূল্য দিতাম সেগুলোর বেশীর ভাগই চলে গেছে, আর যে দুর্লভ জিনিসগুলো আমি আমার মুঠোর মধ্যে ধরে রেখেছিলাম কিভাবে যেন আঙুলের ফাঁক দিয়ে সব গলে গেছে। ভবিষ্যৎকে আমার কেমন যেন ভয়ঙ্কর অনিশ্চিত মনে হয়। জীবন কতো সংক্ষিপ্ত! তিরিশ বছরের পরে কোন নারীর জন্যে কিছু কী আর থাকে? তোমার কী মত? কী মত তোমার, আমার সন্তানের পিতা?

"কিন্তু আমার মস্তিষ্কে একাকীত্ব আর ক্লান্তির সংশয়!...পরে তোমাকে লিখব।"

শ্রীমতী আই মাও জাপানে প্রায় তিন সপ্তাহ ছিলেন, এবং তাঁর আর কোন সংবাদই পাওয়া যায়নি। তাঁর স্বামী তাঁর খবর জানার জন্য চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু কোন জবাব না পাওয়ায় খুবই বিরক্ত হন। তারপর উদ্বিগ্ন হতে থাকেন। এই তার সর্বশেষ চিঠি। চিঠির প্রতিটি অক্ষর তিনি সযত্নে পড়েছেন। তাঁর চোখ আগ্রহে চিঠিটাকে যেন দহন করেছে, নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে উঠেছে, আর দ্রুততর হয়েছে শ্বাসপ্রশ্বাস।

পেনসিলে লেখা, বোঝা বেশ শক্ত। হাতের লেখায় ব্যক্ত স্নায়বিক দুর্বলতা থেকে তিনি বুঝতে পারেন যে বাচ্চাদের নিয়ে নিশ্চয় খুব ঝঞ্ঝাটে পড়েছে। ছোটাছুটি করতে হচ্ছে, ঘুম পাড়িয়ে নিতে হচ্ছে। শেষের দিকটা এতো হিজিবিজি যে তিনি সিদ্ধান্ত করেন নিশ্চয়ই ও বিনিদ্র রাতে এই চিঠিখানা লিখেছে। আর যখন বাচ্চাদের কথা খেয়াল থাকে না, তখনও নিশ্চয় ও তাঁর সান্নিধ্য পেতে চায়।

কিন্তু কী আর করা যায়! তাঁকে যদি জীবিকার বন্দোবস্ত করতে হয় তবে ওদের পক্ষে একসঙ্গে বসবাস করা সম্ভব নয়। তিনি আবার শ্রীমতীর চিঠিটা পড়েন। শেষের দিকের কয়েকটি শব্দে মিশে আছে চোখের জল। চিঠিটা লেখার সময় ও কাঁদছিল।

"হ্যাঁ, সত্যিই মানুষ মরণশীল, আর তাদের জীবনও সংক্ষিপ্ত! এই নির্যাতনের মধ্যেই আমরা বাঁচি তবু সামান্য কয়েকটা বছরও আমরা আনন্দ করতে পারি না। আমরা গরু ঘোড়ার থেকেও অনেক বেশী করুণার পাত্র। এমনকি একটা কুকুরেরও স্বাধীনতা আছে যেখানে খুশি যাওয়ার, শান্তিতে ঘুমোনোর, কিন্তু আমরা তাতেও বঞ্চিত। অবদমিত ক্ষেদে আমরা কষ্ট পাই, আর সমুদ্রপ্রমাণ সংকটের বিরুদ্ধে মিছেই লড়াই করে যাই।

"আমরা বাঁচি কেন? আমরা আদৌ কেন মাথা খাটাই? গোটা প্রক্রিয়াটাই কি চালিত হয় না অর্থগৃধ্নুদের জন্যে? আমাদের পরবর্তী বংশধরদের ওপর একই ভূমিকা চাপানোর জন্যেই কি আমরা এটা করি না? ঠিক যেমনটা আজকের দুনিয়ায় আমরা করে যাচ্ছি? আমরা সত্যি একেবারে অসহ্য জীব! আমরা নিরামিষ, আমরা জলবৎ, আমরা আরো হীন! শিল্প? সাহিত্য? সম্মান ও যশ? শেষ অবধি ব্যবসা? এগুলো সবই কি স্বর্ণখচিত শব্দের ফাঁদ নয়, প্রবঞ্চনা?

"শিল্পী হওয়ার উদ্দেশ্যে আমি চরিত্র বিসর্জন দিতে রাজি নই। আমি নিজের ভেতর থেকেই একজন মানুষকে সৃষ্টি করতে চাই! শেষে আমি ভিখিরিও হতে পারি, বিদেশ-বিভুঁয়ে মারা যেতে পারি, কিন্তু অন্ততপক্ষে আমি আমার স্ত্রীর প্রিয় আত্মা হতে চাই, আমি আমার সন্তানের প্রিয় পিতা হতে চাই, যত যন্ত্রণাই আমাকে বহন করতে হোক না কেন। আমি তোমার, আজ, কাল, চিরকালের জন্যে, আমি তো তোমারই আমার সোনা বৌ! তোমাকে যে কিভাবে পেতে চাই! আমাদের বাঁচাটা কি অসম্ভব প্রমাণিত হবে, আমরা অন্তত আমাদের বাচ্চাদের ধ্বংস করে ফেলতে পারি আর পোতোয়* ঝাঁপ দিয়ে সব শেষ করে ফেলতে পারি।

"আর দুঃখ থাকবে না! আমি ফিরব, আমি নিশ্চয় ফিরব!

"মাত্র এক বছরের চুক্তিতে আমাদের পত্রিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, ত্রিশ চল্লিশ দিনের মধ্যে এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হবে। প্রকাশনার দায়িত্ব আমার। এই তিরিশ চল্লিশটা দিন পেরিয়ে গেলে আমি ফিরবই! আমাদের কপালে বাঁচা কিম্বা মরা যাই থাক এর মধ্যে আমি সেটা ঠিক করে

* জাপানের একটি নদী, যেখানে প্রেমিক প্রেমিকারা আত্মহত্যা করত

ফেলব। তুমি যেখানেই যাও আমি তোমাকে অনুসরণ করে যাবো! আগুন, জল বা আত্মহত্যার ভেতর দিয়ে! যেখানেই তুমি তোমার আবাস গড়বে, সেখানেই আমারও গৃহ!"

এভাবে সে নিজেকে বোঝাতে থাকে কিছুক্ষণ। তিক্ত ক্রন্দনে ভেঙে পড়ে। তারপর তার বোধাবোধ ক্রমে শৃঙ্খলার নির্দেশ মেনে নেয়। নিজের ছোট্ট ঘরটার মধ্যে পায়চারি করে বেড়ায়। এখনও বিকেল হয়নি, বড়জোর দুটো বাজে, পাশের একটা জানলা থেকে নিম্নমুখী সূর্যালোক প্রবেশ করছে। উষ্ণ রশ্মি কখনো উৎসাহিত করে, কখনো সংশয়াকুল করে আবার কখনো মোহভঙ্গ। বইয়ের শেলফটা ছাড়া দেয়ালগুলো নগ্ন, একপাশে গ্যায়েটের প্রতিকৃতি, আর তারই লাগোয়া দেয়ালে বেঠোফেনের ছবি।

"তোমার অনুভূতিগুলো কী জাগ্রত! অভ্যাস মাফিক তোমার অভিযোগের অন্ত নেই! তোমার দৈনন্দিন জীবন কি প্রবল! নিজের প্রতি নিজেরই করুণা! আর তোমার ভাবনারাজি কি পরিমাণ স্বার্থপর আর সংকীর্ণ। তোমার আগেকার ধারণাগুলো সহজেই প্রমাণ করে তোমার নিজের মধ্যে বসবাসকারী শিল্পীর প্রতি ঘৃণা! সর্বোপরি তুমি হলে এক দুরাত্মা শিল্পী!"

এইভাবে নিজেকে ভর্ৎসনা করতে করতে সে উপলব্ধি করে যে তার আত্মা দুটি দেওয়ালের মধ্যে নিষ্পিষ্ট, আর এই দুটি দেয়ালের নীচে চাপা পড়ে যেন ফেটে পড়ার হুমকি দিচ্ছে। নিজের মধ্যে এই দ্বন্দ্বকে অগ্রাহ্য করে এবার নিজের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করে, চিন্তিত ভাবে ঘরের মধ্যে সামনে পিছনে পায়চারি করতে থাকে।

"আমার বেঠোফেন! আমার গ্যায়েটে! অমন একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে থেক না! তোমাদের সঙ্গে আমি আর কোন আত্মীয়তা দাবি করি না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে আর কখনো 'আমার কুকুরের মাংস বিক্রির জন্যে তোমাদের ভেড়ার মাথা ধারণ' করব না—না, আর কখনো নয়। আমি তোমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাবো, চিরতরে বিদায়।" নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে সামনের ছবি দুটির দিকে সে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন সত্যিই তাদের চিরতরে বিদায় জানাচ্ছে।

আই মাও গভীর কষ্ট পেয়েছে। চিঠি পড়া শেষ করে স্থির করল স্ত্রীকে সে তার দুঃখের প্রকৃতি ও পরিমাণ জানাবে। সবে কাগজপত্তর নিয়ে বসেছে, হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

"এটা কি আই মাওয়ের বাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

"শ্রীযুক্ত আই মাও কি আছেন ?"

"আমিই আই মাও।"

"আহ্‌!"

দু'জন অতিথি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঝ্‌ংকে অভিবাদন করে, তবু মনে হয় তাঁরা যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। অতিথিরা এবার নিজেদের নামধাম বলেন। আই মাও অনেকটা অনিচ্ছাকৃত ভাবেই তাঁদের ঘরের ভেতরে আসার আমন্ত্রণ জানায় কারণ আই মাও ইতিমধ্যেই তাঁদের কথাবার্তার আঞ্চলিকতা ও চেহারার বৈশিষ্ট্য দেখে তাঁদের চিনে ফেলেছে। এঁরা আসছেন শেচুয়ানের দূরবর্তী পশ্চিম জেলার গ··· শহর থেকে।

দু সপ্তাহ আগে আই মাও একটা টেলিগ্রাম পেয়েছিল গ···শহরের রেডক্রশ সোসাইটির, তাকে ফিরে এসে ডাক্তারের পুরনো পদটি গ্রহণের জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছিল। তারটিতে বলা হয়েছিল রেডক্রশ তার প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে তাকে টাকা পৌঁছে দেওয়ার জন্যে। সে যাতে এই আমন্ত্রণ রক্ষা করে তার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। তারপর কিছুদিন আগে এই দীর্ঘ দ্রুতগামী চিঠিটি গ···শহরে তার বড়দার কাছ থেকে এসেছে—

আমি তোমাকে অনেকবার লিখেছি, কিন্তু জবাবে এ পর্যন্ত কোন চিঠিই পাইনি। আমার আশ্চর্য লাগছে, এর কি বিশেষ কারণ থাকতে পারে, আর যদি কিছু থেকেও থাকে আমি চাই তুমি আমাকে খুলে বল, ব্যাপারটা কী।

আমার কাছে গ···শহরের রেডক্রশ থেকে একটা চিঠি এসেছে। ওদের টেলিগ্রামের একটা কপির সঙ্গে এটাও পাঠালাম। তুমি আমাকে জানাবে এসব কী হচ্ছে। আমি তোমাকে বলতে চাই, আজকালকার দিনে একটা চাকরি পাওয়া বেজায় শক্ত। বিশেষত ভালো স্থায়ী চাকরি পাওয়া। এখানকার রেডক্রশ অন্যান্য জায়গার থেকে বিশাল মাত্রায় সংগঠিত, কোনো অফিস-কাছারির কাজের থেকে এ অনেক নির্ভরযোগ্য। আমি আশা করব এই সুযোগ তুমি প্রত্যাখ্যান করবে না।

তুমি জানো, তোমার বাবা মা বুড়ো হচ্ছেন। তাঁরা তোমার কাছ থেকে অনেক কিছুই প্রত্যাশা করেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই খুশী হব যদি তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসো। তোমার প্রতি আমার সস্নেহ শ্রদ্ধা, আর শিয়াও ফু (শ্রীমতী আই মাও) এবং বাচ্চাদের জন্যে রইল আমার সাদর সম্ভাষণ,

একান্তভাবে তোমার

ক

চিঠির সঙ্গে প্রেরিত আমন্ত্রণ পত্রটি এরকম ঃ
প্রিয় ভাই ক,

আমরা আপনার ভাই আই মাওকে এখানে নিযুক্ত করার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। যে বেতন এর জন্যে প্রদত্ত হবে তা সাধারণভাবে মাসিক চারশ ডলার, কিন্তু আমাদের বর্তমান অর্থসঙ্কটের জন্যে এর শতকরা ২০ ভাগ ছাড় যাবে, অর্থাৎ প্রতি মাসে তিনি মাইনে পাবেন তিনশ কুড়ি ডলার। আমাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটলেই আমরা তাঁকে নিয়মমত মাইনে দেব।

আশা করব আপনি তাঁকে এ-বিষয়ে লিখবেন। আশঙ্কা হচ্ছে এই চিঠি তাঁর কাছে পৌঁছনোর আগে আই মাও সাংহাইতে কোনো চাকরি না নিয়ে নেন, সেজন্যে আমরা ইতিমধ্যে তাঁকে টেলিগ্রাম করে আমাদের প্রস্তাব জানিয়েছি। আমাদের প্রতিনিধি তাঁর কাছে পাঠাতে পারলে আর তাঁর আসার খরচ দিতে পারলে আমি খুশি হব।

তাঁকে পাঠানো টেলিগ্রামের নকল এই চিঠির সঙ্গে দিলাম।

বিনীত

চ

ইতিমধ্যে অনেকদিন হয়ে গেছে, আই মাওয়ের বড়দা গ···শহরে ব্যবসা করছেন। দু'বছর আগে আই মাওয়ের জন্যেও একটা ভালো কাজ জুটিয়েছিলেন, আর সে জাপান থেকে ফেরার পরে রেডক্রশ সোসাইটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাকে যাতায়াতের খরচ জোগাবে। ঔপনিবেশিক মাতৃভূমি থেকে পাঠানো সেই অর্থ জলে গেছে। যাই হোক, সে সাংহাইতেই থেকে গেছে। তার ভাই তার ঠিকানা জেনে এক বছরেরও বেশী তাকে নাগাড়ে চিঠি দিয়েছে। আই মাও কোনো জবাব দেয়নি। তার ভাই এবং বাবা মা তাকে গভীরভাবে ভালোবাসেন এবং তাঁরা চাইছিলেন সে যেন যত দ্রুত সম্ভব ফিরে আসে। কেন তার ফিরে আসার কোনো ইচ্ছে নেই এটা তাঁরা বুঝতে পারেননি।

এগারো বছর আগে বাড়িতে থাকতে তার বিয়ে হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করার তাগিদ অনুভব করে, কিন্তু তখন সে অসহায়। সে তার বৃদ্ধ বাবা-মাকে কষ্ট দিতে চায়নি তাই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানোরও সাহস হয়নি। তাছাড়া তার স্ত্রী প্রাচীন ভাবধারার মানুষ। সে তাহলে নিশ্চয় আত্মহত্যা করত, আর তার বাবা-মা লজ্জা আর ক্রোধেই মারা যেতেন। ফলে সে শেষ পর্যন্ত বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। বছর কয়েক আগে যখন তার

ছোট বোনের বাগদান হয় তখন সে আপত্তি জানিয়ে কয়েকটা চিঠি লেখে। বোনের মত না নিয়ে তার বিয়ে দেওয়া, তাকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়ার মানে হল, 'যদি সে একটা মোরগকে বিয়ে করে তাহলে তাকে মোরগের সঙ্গেই থাকতে হবে, আর কুকুরকে যদি বিয়ে করে তো থাকতে হবে কুকুরের সঙ্গেই, কারণ সে যাকেই বিয়ে করুক না কেন তাকে তার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে হবে'। তার এইসব শ্লেষাত্মক চিঠিগুলোকে তার বাবা-মা বেয়াদবী বলেই মনে করেন, আর তার অযৌক্তিকতা দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তাছাড়া তার এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যে তার স্ত্রীও কয়েকবার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল।

এরপর সে শিয়াও ফু-র সঙ্গে বাস করতে শুরু করলে কিছুদিনের জন্যে বাবা-মা তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে দেন। পরে অবশ্য তাঁরা কিছুটা নমনীয় হন কারণ শত হলেও সে তাঁদের ছেলে। তবু তাঁরা চিঠি লেখার সময় তার জাপানী স্ত্রীকে 'রক্ষিতা' বলে উল্লেখ করতেন এবং সন্তানদের বলতেন 'রক্ষিতার সন্তান'। এতে সে খুবই আহত হয়েছিল। প্রায়ই তার বাড়ি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে হত বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানোর জন্যে, নিজের মুক্তি অর্জনের জন্যে, কিন্তু যখনই কিছু করার কথা আন্তরিকভাবে ভেবেছে তখনই. বাবা-মাকে আহত করার চিন্তা তাকে নিরস্ত করেছে, আর তার গেঁয়ো বৌটার জন্যে করুণাও তাকে বিচলিত করেছে।

পরিবারে যে-ব্যক্তি প্রথম তাকে মার্জনা করেন তিনি বড়দা। আসলে বড়দা কিন্তু কখনোই বোঝেননি কি মানসিক অত্যাচারের ভেতর দিয়ে সে দিন কাটিয়েছে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভাইকে বোঝানো যাতে সে গ···শহরে ফিরে আসে, তার নিজের শহর থেকে যা খুব একটা দূরে নয়। কিন্তু যাবে কি করে? প্রায়ই বৃদ্ধ পিতার কথা মনে পড়ে। দীর্ঘকাল বাবাকে দেখেনি। তার দেশের শহরের কথাও একান্তভাবে মনে পড়ে, ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতিজ টানের তীব্রতায় সে পরিচিত মানুষজন, যৌবনের দৃশ্যাবলী দেখতে চায়। তবু তার পক্ষে ফিরে যাওয়া অসম্ভব, অসম্ভব!

'আমার বাবা, আমার মা! মনে হয় এই শতাব্দীতে তোমরা আর আমার দেখা পাবে না। আমার ব্যবহারে যে-কষ্ট তোমরা পেয়েছ তাতে আমার কান্না পায়, কিন্তু তোমাদের আশ্বস্ত করার মতো আমি কিছুই করতে পারি না। তোমাদের যে অনুতাপ দিয়েছি তা তোমাদের জীবনভোর বহন করে যেতে হবে! আমার ভাই বোন! তোমাদের দয়ায় আমি কৃতজ্ঞ কিন্তু আমাদের মধ্যে আর দেখা হওয়া সম্ভব নয়। আমার পিতামাতার সঙ্গে যে মহিলা বসবাস করে আশ্চর্যজনকভাবে সে আমারই স্ত্রী! অতীতের নির্বোধ

প্রথার শিকার হয়েছি আমরা। তোমার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আশা করি তোমারও আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই! আমি তোমার অবস্থাটা বুঝি, আমার বাবা-মার বাড়িতে বাদবাকী সারা জীবনটার জন্যে তোমার কেবলমাত্র অতিথি হিসেবে এই ভূমিকাটাই অর্থহীন, তবু তোমার শিকল থেকে তোমাকে মুক্ত করার ব্যাপারে আমি অক্ষম…'

বাড়ির কথা ভাবলেই সে না কেঁদে থাকতে পারে না। তবু তার দুঃখের কথা সে নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না।

"আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমাদের সভাপতির অনুরোধে। এই যে চিঠিটা, আর এই চিঠিটা আপনার দাদার কাছ থেকে। আপনার জন্যে আমার কাছে একটা ব্যাঙ্কড্রাফটও রয়েছে। একেবারে আমার জামার ভেতরে রেখেছি। চারপাশে যা পকেটমার!"

সাক্ষাৎপ্রার্থীদের একজন তার হাতে চিঠিগুলো তুলে দিয়ে কোটটা ঢিলে করে ভেতর থেকে সহস্র রৌপ্যমুদ্রার একটি ব্যাঙ্কড্রাফট বের করল। চিঠিটাতে তেমন কোনো নতুন খবর নেই, সাক্ষাৎপ্রার্থীদের পরিচয় জানিয়ে মামুলি দু'একটা কথা জুড়ে দিয়েছে। চিঠি পড়া শেষ করে আই মাও ঘোষণা করল যে সে রাজী নয়। সে তার প্রত্যাখ্যান করার কারণও জানাল। ব্যাঙ্ক-ড্রাফটটাও তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। ওরা যেন এটা সেচুয়ানেই ফেরত নিয়ে যায়।

"কিন্তু রেডক্রশ আমাদের আদেশ দিয়েছে ড্রাফটটা আপনাকে দিয়ে যেতে। আপনি এটি গ্রহণ করলে আমাদের কর্তব্য সমাধা হয় আর আপনি যদি এটি গ্রহণ না করেন তাহলে সভাপতি আমাদের সমালোচনা করবেন। আপনি যাবেন বলে তিনি প্রত্যাশা করছেন।"

"আপনাদের হাসপাতালে দু'জন জার্মান ডাক্তার আছে না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, দু'জন আছেন, কিন্তু তিরিশজনের বেশি চীনা ডাক্তারও আছে।"

"ওহ্, তাহলে তো যথেষ্টই কাজের লোক রয়েছে। যাওয়াটাই অপ্রয়োজনীয়।"

"বরং উল্টোটা, আমাদের কাজের লোকের ঘাটতি রয়েছে। দ্বিতীয় সৈন্যবাহিনী এক মারাত্মক পরাজয়ে লাঞ্ছিত, হাজার হাজার আহত লোক, তাদের সকলের দায়িত্ব আমাদের। আর ঠিক এই সময়ে প্রথম সৈন্যবাহিনীরও হাজার হাজার আহত রয়েছেন—আর সাকুল্যে আমাদের কাজের মানুষের সংখ্যা খুবই অপর্যাপ্ত।"

"অবস্থাটা যদি এরকমই হয় তাহলে আমার যাওয়া না-যাওয়ায় তেমন কিছু এসে যায় না। আজকাল তো কেবলই যুদ্ধ চলছে, আমাদের পক্ষে সমস্ত

আহত লোকের সেবা যত্ন করা সম্ভব নয়, এমনকি সেচুয়ানের সমস্ত মানুষকে ডাক্তার বানালেও নয়।"

"হাঃ হাঃ—"

অতিথিরা কিন্তু ব্যাঙ্কড্রাফটটি ফেরত নিতে চাইলেন না। অবশেষে আই মাওকে ড্রাফটটি গ্রহণ করতে হল। সে এটার জন্যে একটা রশিদ দেবার পর অতিথিরা তৎক্ষণাৎ বিদায় নিল।

ছোট্ট ঘরটায় বিভিন্ন দিকে সূর্যকিরণ ফোয়ারার মতো ছড়িয়ে পড়ে বায়ুবাহিত ধূলিকণায় চাকচিক্য অর্পণ করেছে।

আই মাওয়ের তার স্ত্রীকে চিঠি লেখার কাজে বাধা পড়ে। এখন সে চিন্তা করছে সহস্র মুদ্রার ড্রাফটটিকে নিয়ে। একবারে এত টাকা সে কখনো পায়নি, টাকাটা যথেষ্ট প্রলোভনের কারণ হয়ে উঠেছে। ভাবে ড্রাফটটা ভাঙিয়ে নেবে, আর সঙ্গে সঙ্গে জাপানে গিয়ে তার স্ত্রী এবং সন্তানদের তার কাছে নিয়ে আসবে। তখন তাদের নিয়ে গ…শহরে যেতে পারবে। একসঙ্গে বেঁচে থাকার প্রয়োজনগুলোর ব্যাপারেও আর উদ্বিগ্ন হতে হবে না। মাসে তিনশ' কুড়ি ডলার মাইনে। উড়নচণ্ডীর মতো একশ' কুড়ি ডলার খরচ করে ফেললেও অনেক টাকা জমানো যাবে। তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যেই বেশ সুখশান্তিতে বসবাস করতে পারবে। মাঝে মাঝে মাইনে বাড়ানোর জন্যে চেষ্টা-চরিত্তির করারও সুযোগ পাবে, তাছাড়া অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে তো থাকবেই। যদি সে গ…শহরে যায়ও—তার দেশের শহরে যাবে না। আত্মীয়েরা চেষ্টা করবে ঠিকই তাকে নিয়ে যেতে, কিন্তু গেলে তার বিয়ের বিষয়ই নিয়ে একটা তুলকালাম কাণ্ড লেগে যাবে। তার বাবা মা কখনোই সব মিটিয়ে নিতে চাইবে না…যাই হোক, তার পক্ষে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। পুরাতন ক্ষতের এই বাঁধন খুলে ফেলা, আর নতুন এক মরীয়া অবস্থা সৃষ্টি করার কারণ শুধু এইটাই যে সে তার কপাল ফেরাতে চাইছে।

"হায়! বাবা মা, তোমাদের ছেলেকে তোমরা ক্ষমা করো! তোমাদের সঙ্গে দেখা না করাটা আমার পক্ষে যেমন সন্তানোচিত নয়, তেমনি তোমাদের সঙ্গে দেখা করাটা আমার পক্ষে আরো অ-সন্তানোচিত। যদি তোমাদের এই কুপুত্র ফিরে যায় তাহলে তা কেবল অন্যের জীবনহানির কারণ হবে, বোধহয় তোমাদের জীবনও বিপন্ন হবে। তাহলে তোমরা আর কেন আমার ফিরে যাওয়ার প্রত্যাশা কর? এ-জীবনে আর কখনো তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না!"

অনুতাপের সঙ্গে সে ভাবতে থাকে বড়দা যখন জাপানে ছিলেন তখন

প্রায়ই মাকে কাঁদতে দেখেছে। তিনি বারবার বলেছিলেন, আই মাওকে তিনি কখনো বিদেশ যেতে দেবেন না। এক ছেলে এতদিন বিদেশে থাকায় বুকটা তাঁর খান খান হয়ে গেছে। আই মাও বিয়ে করার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রাদেশিক রাজধানী যাবে বলে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বিদায়ের আগে মা তার সঙ্গে জাহাজঘাট অবধি এসেছিলেন। "আমাকে না জানিয়ে বিদেশ যাবে না প্রতিজ্ঞা করো, বাবা! শুনছো?" জাহাজ প্রায় ছাড়ার মুখে মা বলেছিলেন।

বিচ্ছেদের মুহূর্তে এই কটি শব্দে সে গভীর অনুতাপ বোধ করেছিল, কারণ শেষ অবধি সে মায়ের অনুমতি প্রার্থনা না-করেই জাপানে যায়। কি বিশাল দীর্ঘায়ত শোক তাকে পোয়াতে হয়েছে, আর অজস্র ধারায় মা-র চোখে জল বয়েছে অনুপস্থিতির এই দীর্ঘ সময়ব্যাপী। তীব্র দহনে তাঁকে কত স্মৃতিই না বহন করতে হয়েছে! এখন মনে হচ্ছে মা আর কখনোই তাকে দেখতে পাবেন না, তার আগেই তাঁর মৃত্যু হবে। সে তার প্রিয় সঙ্গিনীকে বলেছে যে, সে হামেশাই একবার মাত্র ফিরে যেতে চায়, মার সঙ্গে দেখা করে আশীর্বাদ লাভ করতে। অথচ সে উপলব্ধি করছে যে সেই যাত্রার কোন সম্ভাবনা নেই। হায়, সম্বন্ধ করে বিয়ে করার অভিশপ্ত ফল! কত পিতা মাতা যে তাঁদের সন্তানের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন, কতজন যে এই এক বিধির অধীনে কষ্ট পেয়েছে, কি অমোঘ আর নিরুপায় এই স্নেহচ্যুতি!

"ওরে অর্থ, তুই আমাকে ধ্বংস করতে পারবি না, কিন্তু আমি তোকে ধ্বংস করবো!"

ব্যাঙ্কড্রাফট আর চিঠিটা মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে, ঘৃণাভরে পায়ে করে পিষতে শুরু করে, আর এই শারীরিক ক্রিয়ার ভেতর দিয়েই যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তিলাভ করে—গ···শহরে ফেরার প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করবে। তক্ষুনি দুটো চিঠি লিখতে বসে যায়। একটা পাঠাবে তার দাদাকে, আর অন্যটা যাবে ব্যাঙ্কড্রাফটের সঙ্গে সেচুয়ানের রেডক্রশ সোসাইটির সভাপতির কাছে।

চিঠি লেখা শেষ করে শিয়াও ফু'র চিঠিটা তুলে নেয়। বারবার পড়ে। তারপর লিখতে শুরু করে—

"সোনামণি, তোমার চিঠি পেয়েছি। এ-চিঠি পাওয়ার আগে আমি দারুণ বিষণ্ণ ছিলাম, আর চিঠিটা পড়ার পর থেকে আবার বিষণ্ণ হয়েছি, আরো বিষণ্ণ। তুমি জানো, তোমার দুরবস্থার কথা আমি সবই জানি। শুধু তুচ্ছ কয়েকটা কথা দিয়ে তোমাকে আমি আশ্বস্ত করতে পারি না। ঠিক এই মুহূর্তে তোমাকে এইটুকু বলতে পারি যে আগামী তিন-চার সপ্তাহের মধ্যেই আমি তোমার কাছে ফিরে যাব। হয়ত বা তাতে তুমি কিঞ্চিৎ

উৎসাহ পাবে।

"অযৌক্তিক উচ্চাশার জন্য আমি অনুতপ্ত। এতদিনে বুঝতে পেরেছি আমার সাহিত্যচর্চা করার মতো কোনো প্রতিভা নেই। এখন এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র দ্বিধা অনুভব করছি না। এখানে কয়েকটা সপ্তাহ থাকবো কেবলমাত্র আমাদের পত্রিকাটির জন্যে। তুমি জানো এর মধ্যে সারা বছরের জন্যে পত্রিকার প্রস্তুতি হয়ে যাবে। সে যাই হোক, বন্ধুদের কাছে আমাকে কথা রাখতেই হবে...

"বেশ কয়েক বছর আগে আমি উশিতে গিয়েছিলাম। আর তুমি তো জানোই আমাদের এক বন্ধু ওখানকার একটা সুন্দর বাড়ির কথা বলেছিলেন। বাড়িটা এবার দেখলাম, আর অনুতাপও হল, কেন যে আমরা তখন ওখানে উঠে যাইনি! তাহলে তো আর তোমার জাপানে ফিরে যাওয়ার দরকার হতো না! যাকগে, এস এখন এসব কথা ভুলে যাই, ও আর এমন কি!

"এখানে বর্তমান জীবনধারণের অবস্থায় আমি একটুও উদ্বিগ্ন নই। সব কিছু সমাধানের জন্য শেষ পর্যন্ত আমার একটা পন্থা আছে, কিন্তু জাপানে না-যাওয়া পর্যন্ত তা বলছি না। এর মধ্যে খুব মজা পেলাম একটা ব্যাপারে। এইমাত্র এক হাজার ডলারের একটা ব্যাঙ্কড্রাফট পায়ে করে মাড়িয়েছি—একেবারে ওটার ওপর পা ফেলে। অর্থ! ও নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাচ্ছি না। জাপানে ফিরে গেলে নিশ্চয় কোন শারীরতত্ত্ব বিষয়ের শ্রেণীতে সহায়কের একটা কাজ জুটে যাবে—কিম্বা খবরের কাগজ ফেরি করা বা দুধ বেচা, যাহোক একটা কিছু করে চালিয়ে নেওয়া যাবে। আর শেষ সম্বল হিসাবে যে একটি মাত্র পথ আছে, সে বিষয়ে আমি তোমাকে জাপানে গিয়েই বলব। আমার হয়ে বাচ্চাদের চুমু খেও।"

আই মাও চিঠিটা যখন শেষ করল তখন ভোর চারটে। একটা বিরাট বোঝা থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। সারা দেহ মন জুড়ে একটা শান্তি ছড়িয়ে পড়ে। বেসিনে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে মুখ ভিজিয়ে নেয়, তারপর চিঠিগুলো পকেটে পুরে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

অনুবাদ / রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

হিতৈষিণী ॥ লাও শ

মিসেস ওয়াঙ মোটেই পছন্দ করেন না লোকে তাকে মিসেস্ ওয়াঙ বলে ডাকুক। চিরকালই উনি নিজেকে মিস্ মু-ফেঙ চেন বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর ইচ্ছে লোকে তাঁকে এই নামেই ডাকুক। তাঁর স্বামী অগাধ সম্পত্তির মালিক। কাজেই স্ত্রী হিসাবে দু' হাতে তা খরচ করার সুবিধেও তাঁর আছে। কোন কাজে কর্মে টাকা ভেট দেওয়ার পর লোকে যখন তাঁকে মিস মু বলে ডাকে, তখন তিনি নিজেকে একজন স্বাধীন জেনানা মনে করেন। জীবনধারণের জন্য তিনি যে স্বামীর ওপর আদৌ নির্ভরশীল নন, একথা তখন তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন।

বলাই বাহুল্য, মিসেস মু সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন। উনি কিঞ্চিৎ স্থূলকায়া, কাজেই এই ঘটনাটিকে কর্মব্যস্ততার সঙ্গে যুক্ত করে উনি নিজেকে প্রায় ছুটিয়ে নাজেহাল করে ছাড়েন। যেমন গাড়িতে ওঠা-নামার ব্যাপারটাই ধরুন না কেন। মিস্ মু, হ্যাঁ, মিস্ মু-কেই প্রতি দিন কতবার যে কাজটি করতে হয় তার কি কোন ইয়ত্তা আছে! এমন একটি অনুষ্ঠান কি আজও হয়েছে যেখানে মিস্ মু গিয়ে হাজির হননি! অমন দুটো চর্বিস্ফীত পদযুগলকে যদি অন্য কাউকে কয়েকবার নাড়াচাড়া করতে হত, তাহলে আর দেখতে হত না, মৃতের মতো অচিরেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ত। মিস্ মু কিন্তু অকুতোভয়—নিজের জীবন তিনি উৎসর্গ করে দিয়েছেন জনসমাজ-কল্যাণে। নির্দ্বিধায় বলা যায়, ওনার পদযুগল যদি বর্তমান আকারের দ্বিগুণও হত তবু উনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন যাতে এই বস্তুদ্বয়কে গাড়ির মধ্যে টেনে তোলা সম্ভব হয়। নিজের প্রতি ওনার যত্নআত্তি আঁতুড় ঘরের শিশুকে হার মানালেও অন্যদের কিন্তু উনি নিজের চেয়ে বেশীই ভালবাসেন। বিশ্বত্রাণের জন্যই তাঁর এই জীবনধারণ।

মিস্ মু তখনো বিছানা ছেড়ে ওঠেননি। মিস মু-র পরিচারিকা মুক্তি ঘরে এসে ঢুকল। মুক্তি এবং আর যেসব কাজের লোক আছে সবাইকেই

পই পই করে বলা আছে সাত সকালে কেউ যেন এসে বিরক্ত না করে। কিন্তু যতই হোক ঝি তো! তা সে যতই তাকে মুক্তি বলে ডাকো না! মুক্তি জন্মেইছে ভাল-মন্দর বিচার করার অক্ষমতা সঙ্গে নিয়ে। মিস্ মুর প্রচণ্ড ইচ্ছে হয় খাটের ধারের আলোকদানিটা তুলে মুক্তির দিকে ছুঁড়ে মারতে কিন্তু মুক্তির চেয়ে আলোকদানিটা অনেক বেশী মূল্যবান!

"কতবার না তোকে বলেছি যে—" মিস্ মু ঘড়ির দিকে তাকান। প্রায় ন'টা বাজছে দেখে একটু শান্ত হন। তাঁর এই খুশী হবার একমাত্র কারণ, ন'টা অবধি একটানা ঘুমোতে পেরেছেন এই তথ্যটি সম্বন্ধে অবহিতি। এর ফলে স্বাস্থ্য অটুট থাকে। সমাজের চাহিদা মেটাতেই নিজের যত্ন-আত্তি করতে হয়। আর সেই কারণেই লম্বা একটা ঘুম মিস্ মুর বিশেষ প্রয়োজন।

"কিন্তু আপনিই তো মা—অ্যা, মিস্—", মুক্তি সামলে নেবার চেষ্টা করল।

"বল্ না, হলটা কি? এরকম তোতলাবি না বলছি!"

"মিস্টার ফাঙ আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চান।"

"মিস্টার ফাঙটা আবার কে? কত তো ফাঙ রয়েছে। কি করে কথা বলতে হয় শিখিস্‌নি?"

"মিস্টার ফাঙ—যিনি পড়াতে আসেন।"

"এখন আবার তার কি দরকার?"

"বললেন, ওনার স্ত্রী নাকি মারা গেছেন।" ফাঙের জন্য মুক্তি খুব দুঃখিত মনে হল।

"বুঝেছি, টাকা চাইতে এসেছে!" বালিশের তলা থেকে একটা ছোট্ট মানিব্যাগ টেনে বার করলেন মিস্ মু। "নে, কুড়িটা ইয়েন, এই নিয়ে চলে যেতে বলিস। প্রাতঃভোজনের আগে আমি যে কারো সঙ্গে দেখা করি না সে কথা ভাল করে জানিয়ে দিবি।"

মুক্তি টাকাটা নিয়ে চলেই যাচ্ছিল। কর্ত্রীর ডাকে ফিরে আসে।

"বিশ্বপ্রিয়াকে চানের জল ঠিক করতে বলে দে। ফিরে এসে ঘরের জানলাগুলো খুলে দিবি। খুঁটিনাটি সবকিছু বলে দিতে হবে—মাথায় এত চাপ পড়ে না! বড়দাদাবাবু কোথায়?"

"স্কুলে গেছেন।"

"আমাকে চুমু অবধি না খেয়ে চলে গেল! চমৎকার!" প্রবল রাগে বেশ কয়েক বার মাথা নাড়লেন মিস্ মু। তাঁর চর্বিওলা গাল দুটো কেঁপে উঠল।

"বড়দাদাবাবু বলে গেছেন দুপুর বেলা স্কুল থেকে যখন খেতে বাড়ি ফিরবেন তখন আপনাকে চুমু খাবেন।"

"খুব হয়েছে—এখন যা! এত মানসিক দুশ্চিন্তা, পারা যায় না আর!"

ঘর ছেড়ে আসতে আসতে বেরিয়ে গেল মুক্তি। মিস্ মু মনে মনে ভাবেন, বৌ-এর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজে মিস্টার ফাঙ এখন ব্যস্ত থাকবেন, তাহলে মেজ পুত্রকে নিয়ে তো সমস্যা দেখা দিল! অকারণে লোকের এমন বেয়াক্কেলের মতো মরা আর তার জন্যে অন্যদের কয়েকদিনের পড়া নষ্ট করার কোন মানে হয়? পুত্রকন্যার শিক্ষার ব্যাপারে মিস্ মু অত্যন্ত যত্নবান।

বিশ্বপ্রিয়া দরজায় টোকা দিল। "চানের জল তৈরী মিস্।"

পাজামা পরেই মিস্ মু কলঘরে ছুটলেন। ঝকঝকে সাদা বাথটাব ভর্তি তাজা জল। পরিমাণে নির্ভুল এবং উষ্ণতার নির্ধারিত মাত্রার সঙ্গে বিলকুল এক। সাদা টালি বসানো ঘরটা বাষ্প আর আতর ইত্যাদির গন্ধে ভরপুর। দেয়ালে প্রমাণ আকারের একটা আয়না ঝুলছে, কতকগুলো সাদা ধবধবে তোয়ালে গুছিয়ে রাখা আছে আর সাবানদানি ও জলের সঙ্গে মেশাবার নুন ভর্তি বয়েমগুলো এত পরিষ্কার যে আলো ঠিকরোচ্ছে। মিস্ মুর মন খারাপ ভাবটা আস্তে আস্তে কেটে যায়। জলের মধ্যে মোটা মোটা ফর্সা পা দুটোকে ডুবিয়ে কিছুক্ষণের জন্য চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন। শরীরে জলের স্পর্শ লেগে যে মৃদু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে এত সুখদায়ক সব অনুভূতির ভেতর মনের মধ্যে কেমন একটু যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। বহুকাল আগেকার নানা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। বাথটাবে বসেই নিজের বৃহদাকার শ্বেত পদযুগলের দিকে চেয়ে রয়েছেন। জলের মধ্যে পা দুটোকে যেন আরো বেশী মোটা দেখাচ্ছে। বুকের মধ্যে রিক্ত ভাবটা আরো বেড়ে ওঠে। কোষে করে খানিকটা জল নিয়ে আলতো ভাবে গলা ঘষতে ঘষতে পুরোনো দিনের কথা ভাবেন মিস্ মু, যৌবনের কথা। বিশ বছর আগে কেমন ছিপছিপে আর সুগঠিত চেহারা ছিল! এখন আর নিজেকে প্রায় চিনতেই পারা যায় না। স্বামী এবং ছেলেমেয়েদের কথা ভাবেন, সবই কেমন মনের মধ্যে ঝাপসা ঠেকে। এখন যেন ওদের অপরিচিত মানুষ বলে মনে হয়। খুব জোরে গা রগড়াতে শুরু করেন মিস্ মু, দেখেন চামড়াটা লাল হয়ে উঠেছে। এখন অনেক ভালো লাগছে। সেই ফাঁকা ফাঁকা ভাবটাও কেটে যাচ্ছে। উনি যে শুধুমাত্র একজন বিশেষ ব্যক্তির স্ত্রী আর গুটি কয়েক কাচ্চাবাচ্চার মা, মোটেই তা নয়। উনি পরিচিত মহিলা মহলের প্রত্যেকেরই মা, পরামর্শ-দাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রী। বিদেশে পঠন-পাঠনটাও সেরেছেন, তাই আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধেও তিনি ওয়াকিবহাল। বিশ্বত্রাণের কর্তব্য জন্মসূত্রেই তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়েছে।

তা বলে কাজটা কিন্তু খুব সহজ নয়। মনে পড়ে দু বছর আগে উনি ঘরে

ঘরে বাথটাব চালু করার কথা বলেছিলেন। "যে বাড়িতে বাথটাব নেই সেটা আদৌ একটা বাড়িই নয়!" কিন্তু ফলটা কি হল? মানুষ জাতটাই নির্বোধ! বলে বলে জিভ খসিয়ে ফেললেও কেউ বোঝে না। মোটা পা দুটো চাপড়াতে চাপড়াতে মিস্ মুর ইচ্ছে করল সব আশা জলাঞ্জলি দিতে। যাক না, যাক—গোটা জাতটাই শুয়োরের খোঁয়াড়ে পরিণত হোক। বাথটাব না থাকলে, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান না মানলে এ তো অবধারিত। নাঃ—নিজেকে নিরাশ হতে দেওয়া চলে না। স্বার্থত্যাগ যদি করতেই হয় তো জীবনের শেষ পর্যন্ত তাই করে যাবেন। মিস্ মু মুক্তিকে ডাক লাগালেন—

"জানলাগুলো পাঁচ মিনিটের বেশী খোলা থাকে না যেন।"

"বন্ধ তো করেই দিয়েছি, অনেক আগে।" মুক্তি উত্তর দিল।

শোবার ঘরে এসে ঢুকলেন মিস্ মু। তাজা বাতাসে ঘরটা ভরে গেছে ইতিমধ্যেই। প্রতিদিন সকালে উনি প্রাণায়াম করেন। বাড়ির উঠোনের বাতাসটা বড্ড ঠাণ্ডা থাকে। পাঁচ মিনিট জানলা খোলা রাখলে যে হাওয়াটুকু ভেতরে প্রবেশ করে প্রাণায়াম করার পক্ষে তাই যথেষ্ট। প্রথমে উনি সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়ান। দেখে বেশ সন্তুষ্ট হন যে এখনো হাত দিয়ে পায়ের আঙুল ছুঁতে পারছেন। হাঁটু ভাঙতে হয়েছে ঠিকই—কিন্তু যে করেই হোক না কেন হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে পায়ের আঙুলটা ঠিকই ছুঁয়েছেন! এমনি ভাবে তিনবার সামনের দিকে ঝোঁকার পর খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন মিস্ মু। পাঁচ বার কি ছ' বার ফুসফুস ভরে শ্বাস নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলেন শরীরের মধ্যে রক্তের রঙই পাল্টে গেছে—গাঢ় উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত, উদয়কালীন সূর্যের মতোই চোখ ধাঁধানো, আর উষ্ণ।

"মুক্তি, সকালের জলখাবার দাও।"

বেশীর ভাগ লোকই অত্যন্ত বেশী খায়। ব্যাপারটা মিস্ মুর কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর। সকালে যা খান তা অত্যন্ত সাদামাঠা—বড় প্লেটের এক প্লেট হ্যাম আর ডিম, দু পিস মাখন মাখানো রুটি, স্ট্রবেরী জ্যাম আর এক কাপ কফি মেশানো দুধ। খাওয়াদাওয়া হওয়া উচিত অত্যন্ত সাদাসিধে। কক্ষনো পাঁচ-ছ'টা রুটি বা চার-পাঁচ বাটি নুডল খাবে না। বেশী করে দুধ আর মাখন খাও। কিন্তু কেউ কি কান দেয়! ভালো কথায় কখনো কারো মন ওঠে না, তাই তিনি নিজেই এখন এই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী চলছেন। মিস্ মু প্রধান পাচক হিসাবে যাকে নিয়োগ করেছেন সে বিদেশী রান্নায় পারদর্শী।

হ্যাম আর ডিম খেতে খেতে মিস্টার ফাঙের কথা মনে পড়ল। ওনার দ্বিতীয় পুত্রের গৃহশিক্ষক মিস্টার ফাঙ। মাসে বিশটি করে ইউয়ান

দক্ষিণা পান। গরীব লোকে গাদা গাদা উপার্জন করুক এটা তিনি মোটেও পছন্দ করেন না। ওনার নিজের হাতে অর্থ থাকলে সেটা শুধু অর্থ হয়েই থাকে, কিন্তু গরীবদের হাতে অর্থ পড়লেই সেটা 'ঝঞ্ঝাট' হয়ে উঠবে। ইচ্ছে করলেই উনি মিস্টার ফাঙের মাইনে বাড়াতে পারেন, কিন্তু বাড়ান না। একদিকে ঠকে যাবার ভয় আর অন্যদিকে আরো বড় ভয়, হাতে বেশী পয়সা পেলে মিস্টার ফাঙ তখন ঝঞ্ঝাট বাঁধানোর সুযোগ পেয়ে যাবেন। এত কাণ্ডের পরও কিনা, হায় হায়, ক' মাস পড়াতে না পড়াতে বৌটা টেঁসে গেল! যাই হোক স্বীকার না করে আর উপায় কি যে মিস্টার ফাঙের পক্ষে ব্যাপারটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। যে করেই হোক ভদ্রলোককে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করতে হবে!

"মুক্তি, রান্নাঘরে খবর পাঠাও, মিস্টার ফাঙের ওখানে দশটা ডিম দিয়ে আসার জন্য। আর বলে দিও যেন বেশী সেদ্ধ না করেন, অল্প-সেদ্ধ অবস্থাতেই খাওয়া উচিত।"

সশব্দে কফিতে চুমুক দিয়ে মিস্ মু ভাবলেন অল্প-সেদ্ধ ডিম খাবার পর মিস্টার ফাঙ শরীরে কেমন বল পাবেন। বৌ হারাবার দুঃখও সামলে নিতে পারবেন। পরক্ষণেই মনে হল ঃ মিস্টার ফাঙের বৌ তো মরল, এখন তো তাহলে ওকে রেঁধে দেওয়ার কেউ রইল না। দিনে দুবার করে এ বাড়িতেই যাতে খেতে পায়, সে ব্যবস্থাটাই তাহলে করতে হবে। অন্য লোকের ব্যাপারে মিস্ মু সর্বদাই ভারী চিন্তিত। কি করবেন, এটাই তাঁর স্বভাব। অবশ্য দিনে দু'বার করে খাওয়াবার ব্যবস্থা করলে, মাইনেটা কিছু কমানোই উচিত। মাইনে পাবে কম কিন্তু খাবে তো ভালো। ওনার এই উদ্বেগপূর্ণ আর সহানুভূতিশীল ব্যবহারের জন্য মিস্টার ফাঙের কৃতজ্ঞতাবোধ করা উচিত। অন্যের জন্য উনি তো সব সময়ই উদ্বিগ্ন, সহানুভূতিশীল। কিন্তু তাঁর জন্যে ভাবেটা কে? কোন্ লোকটা ওঁকে সহানুভূতি জানায়? এই মুহূর্তে জীবনটাকে মনে হচ্ছে একটা অসার পদার্থ। কারুর যে প্রেমে পড়বেন সে দিনও আর নেই—বিগত যৌবন আর ফিরে আসবে না। করার মধ্যে আছে শুধু অন্যের সেবা। কিন্তু তার জন্য কোন্ লোকটা কৃতজ্ঞ? মিস্ মু আর এইসব ভয়াবহ কথা চিন্তা করতে সাহস পান না, বেশী ভাবলে ঠিক মাথা খারাপ হয়ে যাবে। পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন মিস্ মু, আজকের কর্মসূচীর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার। কাজ, একমাত্র কাজই তাঁর এই রিক্ত বোধটাকে দূর করে, ক্লান্তিতে ভরিয়ে দেয়, প্রগাঢ় নিদ্রার ব্যবস্থা করে তাঁকে খুশী রাখে এবং এই ভাবেই নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধে তিনি একটা আভাস পান।

মিস্ ফেঙ তাঁর সেক্রেটারী—এক ঘণ্টার বেশী হবে পড়ার ঘরে অপেক্ষা করছে। মিস্ ফেঙ-এর বয়েস মাত্র তেইশ। দেখতেও মন্দ নয়। মাসে বারো ইউয়ান করে পায়। মিস্ মু ওকে "সেক্রেটারী" বলে খেতাব দিয়েছেন। সত্যিই তো, শুধু এই খেতাব দেওয়ার জোরেই মিস্ ফেঙকে তিনি এক কানাকড়িও মাইনে না দিতে পারতেন। মিস্ মুর সামাজিক পরিমণ্ডলটা কত প্রশস্ত! তাঁর সেক্রেটারী হওয়া মানেই তো বড়লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ! মিস্ ফেঙ-এর সঙ্গে যদি একজন বড়লোকের বিয়ে হয়, জীবনে যদি খাওয়া পরা নিয়ে মাথা না ঘামাতে হয়, সেটা কি কম কথা? না হয় নাই পেল মাসে মাসে পঞ্চাশ ষাট ইউয়ান! অন্যের কথা চিন্তা করার সময় মিস্ মু সর্বদাই বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। এ ব্যাপারে উনি অতি দূরদর্শিনী।

মিস্ ফেঙকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন মিস্ মু।

"আহ্! কি কি কাজ রয়েছে আজ বল তো? কুইক্—!" একটা বিশাল চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিলেন মিস্ মু।

সাক্ষাৎকারের তালিকা মিস্ ফেঙ তৈরী করেই রেখেছিল। "মিস্ মু, সকাল দশটা কুড়িতে অন্ধ ও বধিরদের স্কুলে একটা প্রদর্শনী আরম্ভ হবে। এগারোটা দশে মহিলা সমিতির বৈঠকে আপনি সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করবেন। বারোটার সময় চাঙ পরিবারের বিবাহ অনুষ্ঠান। বিকেলে—"

"দাঁড়াও দাঁড়াও—" মিস্ মু শ্বাস নেন আবার। "চাঙেদের বাড়িতে প্রীতি উপহার পাঠিয়েছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দু সাজি তাজা ফুল, ২৮ ইউয়ান, বেশ মনোহারী।"

"হুঁ, ২৮ ইউয়ান উপহার—একটু যেন কম হয়ে গেল না?"

"আগের বছর মিঃ ওয়াঙের জন্মদিনের উৎসবে চাঙ পরিবার একটা কাঠিতে পাকানো 'দীর্ঘায়ু কামনার বাণী' পাঠিয়েছিল মাত্র। তার দাম তো—এখন অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। মিঃ চাঙ আরো বড় পোস্ট পেয়েছেন। যাক গে—অন্য কোন সময়ে ঘাটতিটুকু পুরিয়ে দেওয়া যাবে। ও হ্যাঁ, বিকেলে কি আছে বল তো?"

"পাঁচটা মিটিঙ।"

"হুঁ। এখন আর বলার দরকার নেই, সব কথা মনে রাখতে পারবো না। চাঙদের ওখান থেকে ফিরে আসার পরই শুনবখন।" একটা সিগারেট ধরালেন মিস্ মু।

এখনো খুঁত খুঁত করছে মনটা। চাঙ পরিবারের জন্য পাঠানো বিয়ের উপহারটা একটু যেন কমই হয়ে গেছে। "মিস্ ফেঙ, লিখে রাখো—সামনের

শুক্রবার কি শনিবার নব চাঙ দম্পতির আমাদের এখানে ডিনারের নিমন্ত্রণ রইল। বুধবার দিন আমাকে আবার মনে করিয়ে দেবে।"

মিস্ ফেঙ চটপট কথাগুলো লিখে নিল।

"চাঙ পরিবার কি রকম খাওয়ালে আজকে, সে কথা আমার কাছ থেকে জেনে নিতে ভুলো না। মনে থাকবে তো ঠিক ?"

"হ্যাঁ মিস্ মু, মনে থাকবে।"

মিস্ মুর খুব একটা ইচ্ছে নেই অন্ধ ও মূকদের স্কুলে যাবার। কিন্তু ভয় হয়, উদ্বোধন অনুষ্ঠানের হয়তো ফটো উঠবে আর উনি যদি তখন উপস্থিত না থাকেন ব্যাপারটা ভাল দেখাবে না। মিস্ মু মনস্থির করলেন একটু দেরি করে, ঠিক ছবি তোলার সময় গিয়ে হাজির হবেন। মনস্থির করতে পেরে মিস্ ফেঙের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলতে ইচ্ছে যায়। অবশ্যই এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা কখনই ঠিক হবে না যে মিস্ ফেঙের চরিত্রে বেশ একটা আকর্ষণীয় দিক আছে। আসলে এর পেছনে আছে মিস্ মুর মনের সেই অবসাদগ্রস্ত ভাব যা একমাত্র গালগপ্পের মধ্যে দিয়েই কেটে যেতে পারে। মিস্টার ফাঙের কথা মনে পড়ে গেল। "শুনেছো ? মিস্টার ফাঙের স্ত্রী মারা গেছেন, কুড়িটা ইউয়ান আর দশটা ডিম পাঠিয়ে দিয়েছি।" বেচারা মিস্টার ফাঙ !" সত্যিই মিস্ মুর চোখ জলে ভরে উঠেছে।

মিস্টার ফাঙ যে মিস্ মুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন আর মিস্ মু যে দেখা না করেই কুড়িটা ইউয়ান হাতে ধরিয়ে তাকে বিদায় দিয়েছেন, একথা মিস্ ফেঙ আগেই জানতে পেরেছিল। কর্ত্রীকে ও ভালভাবেই চেনে তাই বলল, "হ্যাঁ, মিস্টার ফাঙ-এর জন্য দুঃখ হয়। তবে ভদ্রলোকের খুব সৌভাগ্য বলতে হবে, আপনার মতো একজনের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছিল। আর কে আছে এমন এক কথায় টাকা দেয় বলুন ?"

মিস্ মুর মুখে সামান্য একটু হাসির আভাস দেখা গেল। "লোকের সঙ্গে সর্বদাই আমি এমন ব্যবহার করি। হলে কি হয়, কৃতজ্ঞতাবোধ আছে কারো ! জগৎটাই পাষাণ।"

"আপনার বদান্যতা আর দরদভরা ব্যবহারের কথা সবাই জানে মিস্ মু।"

"তাই নাকি ! তা হবে।" মিস্ মুর হাসিটা আরো ছড়িয়ে পড়ল।

"মেজদাদার ক'দিন পড়ার ক্ষতি হবে।" মিস্ ফেঙ এ ব্যাপারে যেন বেশ উদ্বিগ্ন মনে হল।

"ঠিক কথা,—এক মিনিট শান্তিতে থাকার উপায় নেই !"

"দু'-চার দিনের জন্যে হলে আমি চালিয়ে নিতে পারি। অবশ্য এ ব্যাপারে খুব একটা পারদর্শী যে, তা নই।"

"বেশ তো! সত্যি, এ কথাটা আগেই ভাবা উচিত ছিল। তুমি ওকে পড়াও। বিনা পারিশ্রমিকে তা বলে কাজ করতে দেব না!"

"তার কোন প্রয়োজন নেই। কদিন বই তো নয়। মিস্টার ফাঙ ঝামেলা-গুলো চুকিয়ে উঠলেই আবার পড়াবার কাজ শুরু করতে পারবেন।"

মিস্ মু একটু সময় নিলেন। "ফেঙ, একটা কাজ করা যাক। পড়াবার দায়িত্বটা না হয় তুমিই নাও। মাসে মাসে পঁচিশ ইউয়ান করে পাবে। সব দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে এটাই সবচেয়ে ভালো নয় কি?"

"কথাটা ঠিক—তবে কিনা মিস্টার ফাঙের প্রতি একটু অবিচারই করা হবে।"

"আরে ওসব ঠিক হয়ে যাবে। তাছাড়া স্ত্রী মারা যাবার পর সংসারে খাবার লোকও তো একজন কমে গেছে। সুবিধে মত ওকে মাসে আট কি দশ ইউয়ান মাইনের আরেকটা কাজ জুটিয়ে দেবো। কোন ঝামেলা নেই। যাক, এবার আমায় রওনা হতে হচ্ছে। ওহ্—দিনের পর দিন এই চলেছে! এত ক্লান্ত লাগে কি বলবো!"

অনুবাদ / সিদ্ধার্থ ঘোষ

শেষ ট্রেন ॥ লাও শ

ট্রেনটা ছেড়েছে মেলাই আগে। লাইনের পাতে, চাকার ঘর্ষণে, শোকার্ত শব্দ এখন। যাত্রীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সময়ের হিসেব কষে যাচ্ছেঃ সাতটা বাজে, আটটা, নটা, দশটা—ঠিক দশটায় ট্রেন পৌঁছবে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে তাদের সেই মাঝরাত। অবশ্য খুব একটা দেরি নাও হতে পারে, বড়জোর ততক্ষণে বাচ্চাকাচ্চাগুলোকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। নববর্ষের দিন বলে সবাই চাইছে তড়িঘড়ি বাড়ি ফিরতে। কৌটোগুলোর দিকে তাকায় তারা, ওপরের তাকে গাদা করে রাখা হয়েছে ফলমূল আর খেলনা। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে বাচ্চাদের চেঁচামেচি, 'বাবা, বাবা!' এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে চিন্তায় তলিয়ে যায় তারা। তবে অন্যরা ভালোভাবেই জানে ভোর হওয়ার আগে কিছুতেই বাড়ি যাওয়া সম্ভব নয়। এইসব লোকজন সহযাত্রীদের মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে থাকে। তারপর বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করে যে গোটা কামরায় এমন একটাও মানুষ নেই যার সঙ্গে ক্ষীণতম পরিচিতি আছে বলে দাবি করা যায়। তারা বাড়ি পৌঁছবার আগেই নববর্ষ শুরু হয়ে যাবে। অনেকে গাল দিতে থাকে ট্রেনটা সর্পিল গতিতে যাচ্ছে বলে। যদিও শারীরিক ভাবে তারা ট্রেনের কামরার ভেতরই রয়েছে, সিগারেট টানছে, চায়ে চুমুক দিচ্ছে, হাই তুলছে, জানলার কাঁচে নাক চেপে রয়েছে, আর বাইরে অতল নরকের অন্ধকার দেখছে, বস্তুতঃ তারা আদৌ সেই কামরার মধ্যে নেই। ট্রেনটা স্টেশন ছাড়ার পর তারা শত বার ফিরে গেছে বাড়িতে। আর এখন তাদের মাথা ঝুঁকে এসেছে, চোখের জল গোপন করতে হাই তুলছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় খুব বেশী যাত্রী নেই। স্থূলকায় শ্রীযুক্ত চ্যাঙ আর ক্ষীণকায় শ্রীযুক্ত চিয়াও একই কামরায় পরস্পরের বিপরীত দিকে বসে আছেন। কম্বলগুলো তাঁরা এমনভাবে ছড়িয়ে রেখেছেন যার মানে বাইরের লোকজনের কোনো ঠাঁই হবে না। ট্রেন ছাড়ার পর তাঁরা অবাক হয়ে দেখলেন কামরায় নামমাত্র যাত্রী আছে। এতে কেন যেন তাঁরা আগের থেকেও বেশী শোকার্ত হয়ে পড়লেন, এমনকি মনে হল নববর্ষের দিনেও ট্রেনে চড়া থেকে রেহাই নেই। এই দু'জন যাত্রীর মধ্যে অন্য অনেক মিলও আছে। তাঁদের দু'জনের কাছেই পাস রয়েছে, এবং দু'জনের কেউই গতকালের

আগে পাস পাননি। তাঁরা ভেবেছিলেন কোন ব্যক্তি যখন স্বেচ্ছায় পাস দিতে পারে তখন তার অধিকারও থাকে বিধিসম্মত যাত্রীকে শেষ মুহূর্ত অবধি ঠেকিয়ে রাখার। তাঁরা দু'জনেই এই ব্যবহারে রুষ্ট। কারণ আগেকার দিনে সুসময়ে বন্ধুরা ছিল অনেক দৃঢ়তর উপাদানে নির্মিত। দু'জনেই মাথা নাড়েন এবং সমস্ত অনুযোগ তথাকথিত বন্ধুদের ওপরে চাপান যাঁরা নববর্ষের আগে তাঁদের সময়মতো বাড়ি পৌঁছানোটা আটকে দিল।

বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত চ্যাঙ তাঁর শেয়ালের লোমের কোটটা খুলে ফেললেন, আর শরীরের নীচে পা মুড়ে বসে আবিষ্কার করলেন যে জায়গাটা এতই সংকীর্ণ যে আরাম করে এই ভঙ্গিতে বসা যাবে না। ইতিমধ্যে কামরায় গরমি বেড়ে গেছে। ঘামের ফোঁটা ঝরতে শুরু করেছে। ভুরু জোড়া এখুনি প্যাচপ্যাচ করবে। "এই ছোকরা, তোয়ালে দিয়ে যা!" তিনি চিৎকার করলেন। তারপর শ্রীযুক্ত চিয়াওকে বললেন, "আজকাল যে এত গরম পড়ছে কেন ভেবে পাই না," তিনি হাঁপাতে থাকেন। "এরোপ্লেনে গেলে এত গরম লাগত না।"

বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত চিয়াও অনেক আগেই তাঁর কোট খুলে ফেলে এখন সাদা ভেড়ার লোমের ডোরা-কাটা ঢিলে পোশাক আর তার ওপর একটা কালো সাটিনের হাতকাটা জ্যাকেট পরে রয়েছেন। বিন্দুমাত্র ক্লান্তির লক্ষণ নেই তাঁর মধ্যে। তিনি বললেন, "এরোপ্লেনে তো আর কেউ পাস পাবে না। যদি না কষ্ট..." ম্লান হাসির সঙ্গে তিনি জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন।

"এরোপ্লেনে যাওয়ার ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো," বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত চ্যাঙ বললেন। পা দুটো আড়াআড়ি ভাবে শরীরের নীচে রাখতে গিয়ে তিনি হিমসিম খাচ্ছেন। বেজায় কষ্টে কাজটা হাসিল হল শেষ পর্যন্ত। "ওরে ছোকরা, তোয়ালেটা!" 'ছোকরা'র বয়েস চল্লিশের ওপর এবং তার ঘাড়টা কাঠির মতো সরু, এত সরু, যে-কেউ কল্পনা করতে পারে তার মাথাটা ছিঁড়ে নেওয়া এবং আবার তা লাগিয়ে দেওয়া খুবই সোজা। যাতায়াতের রাস্তা ধরে ধোঁয়া-ওঠা তোয়ালের গাদা নিয়ে তাকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে একবার সামনে যেতে আর একবার পেছনে আসতে দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে সত্যিই সে প্রত্যেকের সেবা করতে ইচ্ছুক কিন্তু এমন একটা পবিত্র দিনে কর্তৃপক্ষ যেভাবে ওদের খাটায় সত্যিই তা অসহনীয়। কামরায় এসে সামনেই সে ক্ষুদে সুইকে দেখতে পায়। আহত অভিমান তার ওপরই উদগীরণ করে, "একটা কথা শোন্! সাতাশ-আঠাশ তারিখে আমি ডিউটিতে ছিলাম, আর হিসাব করেছিলাম আজকের দিনটা ছুটি পাবো। শেষ মুহূর্তে লিউবাবু আমার কাছে এসে বললেন কিনা, 'বুঝলি, নববর্ষের দিন তোকে

কাজ করতে হবে'—এ-কথা অক্লেশে বলে দিলেন। এ লাইনে ষাটজন লোক কাজ করছে—আর ওদের কিনা আমাকেই নিতে হল। আমি থোড়াই কেয়ার করি। নববর্ষের দিনও তো সেই একই উকুনের বাসা!" এই বলে সে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে স্থূলকায় শ্রীযুক্ত চ্যাঙের দিকে মাথা নুইয়ে প্যাঁচানো তোয়ালের জোড়া খুলে ক্ষুদে সুইয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, "একটা তুলে নে।" তার অনুযোগের আর শেষ নেই। "আমিও লিউবাবুকে বলে দিয়েছি, নববর্ষের দিন বলে হাতি ঘোড়া কিছু নয় কিন্তু তার বোঝা উচিত যে সেদিন সন্ধ্যেয় আমার ছুটি পাওয়ার পালা। আমি বললাম, সারা বছর কাজ করছি একদিন তো ছুটি পাওয়া উচিত।" কণ্ঠনালীর নীচে সে কিছু একটা চালান করে দেয় আর তার আদমের আপেলটি ভেসে ওঠে, বোতল ওল্টালে জলে যেমন বুদবুদ ভাসে। তার গলা এমন ধরে আসে যে কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারে না। "ওহ্—একেবারে দম বেরিয়ে যাচ্ছে আমার। সব ব্যাপারই আজকাল উলটোপালটা।"

ক্ষুদে সুইয়ের ম্লান হলুদ মুখ থেকে হাসির মতো কিছু একটা বেরিয়ে আসে। সে চাইছিল তার মাথাটা একটু নুইয়ে সমবেদনা প্রদর্শন করতে, কিন্তু কোনো না কোনো কারণে দেখা গেল তার সে-ক্ষমতা নেই। ব্যক্তিগত অসুবিধে আছে। রেলের প্রত্যেকেই তাকে জানে—এমনকি স্টেশন মাস্টার এবং মেকানিকও। তারা সবাই তার বন্ধু। তার ম্লান হলুদ মুখটি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটের সমতুল্য ঃ পরিবহন মন্ত্রকও এটার বৈধতা নিয়ে আপত্তি করতে সাহস করত না। আর সবাই জানে যে সে সর্বদা একশ দু'শ আউন্স আফিম তার মালপত্তরের সঙ্গে নিয়ে ঘোরে। সকলেই মেনে নিয়েছে, হ্যাঁ, এটুকু সে করতেই পারে। সুই এ ব্যাপারে সতর্ক ছিল, কাউকে সে জানতে দিত না, আর খাতির যত্ন করার ব্যাপারেও সে একচোখো নয়। লোকের মধ্যে ঈর্ষা জাগানোর ভয়ে, লোকজনের দুঃখ সে যথার্থ বুঝতে পারত। তার সহানুভূতি জানাতে সে সবসময় এক পায়ে খাড়া। সে কাউকেই চটায় না, সে কারো ভয়ে ভীত নয়। আর এই পুরো ব্যাপারটা, জীবনের এই চূড়ান্ত জ্ঞান, সব পড়ে ফেলা যেত তার টিকিট দেখে কিংবা মুখ দেখে।

'আমরা সবাই এত ব্যস্ত,' সে অনুযোগ করল। অনুযোগ করার কারণ তার ধারণা তার অসুবিধেটাও 'পরিচারক-ছোকরা'র উপকারে আসবে। একটানা বলেই চলে, সম্পূর্ণ ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাকে কিভাবে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে, যদিও বাড়িতে আরামে বসে থাকাটাকে সে পছন্দ করে। অবশ্য ঠিক তার পরের দিনই সে রক্তচোষা একটি মেয়ের সঙ্গে মোলাকাত করবে যে তার

টাকাকড়ি সব দুয়ে নেবে। কালচে দাঁত বের করে ও এবার হাসল। খানিকটা ধোঁয়া উদিগরণ করে মেঝেতে পিক কেটে থুথু ফেলল।

একটু আগে যে-কথা বলেছে সেগুলোই আবার 'ছোকরা'কে সে বলতে শুরু করে দিল। ছোকরা সমর্থন ও প্রশংসার ঢঙে মাথা নাড়ছে দেখে মনে হল সে তার নিজের দুঃখ ভুলে যাচ্ছে। তারপর হাতের তোয়ালে ঠাণ্ডা হয়ে এলে কেবিনে ফিরে এল ওগুলো জলে ভিজিয়ে গরম করতে। তারপর ও ফের যখন উদয় হয়, ক্ষুদে সুইকে পাশ কাটিয়ে তার দিকে না তাকিয়ে, একটাও কথা না বলে, তার চোখ দুটো উদাস ভাবে বন্ধ করে চলে আসে। যেন দেখাতে চায় ক্ষুদে সুইয়ের সমবেদনা সত্ত্বেও সে নিজের লোকসানটা ভুলতে পারছে না। ট্রেনের ঝাঁকুনির সুযোগ নিয়ে তার শরীরটা দুলিয়ে দেয় ক উ নামে একজন মহাশয়কে লক্ষ্য করে। "তোয়ালে চাই মশাই?"

বছরের এই সময়টায় এ লাইনে বেড়ানো যে কি হুজ্জোত! কোনো নতুন শ্রোতার দিকে সে তার অনুভূতির অর্গল মুক্ত করে দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু যেহেতু সে শ্রীযুক্ত ক উ'কে ভালো ভাবে চেনে না ফলে কথাটা তাকে বলে যেতে হয় যদ্দুর সম্ভব বৃত্তাকার ভঙ্গিমায়। শ্রীযুক্ত ক উ'র পোশাকের বেশ ঘটা আছে। পরনে কালো সার্জের ওভারকোট, কলারটা খরগোশের লোমনির্মিত, সঙ্গে আনকোরা কালো সাটিন, অদ্ভুত ধাঁচের টুপি। সে তার কোট কিংবা টুপি খোলেনি। একেবারে কাঠ হয়ে বসেছিল, যেন মঞ্চের ওপর চেয়ারম্যান। মুহূর্তের জন্যে পবিত্র গাম্ভীর্যে অপেক্ষমান, এখুনি এক ব্যাপক শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। পুরো হাতটা মেলে দিয়ে সে তোয়ালেটা নেয়। কনুইটা যাতে ভাঁজ করতে না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক। তোয়ালেটা দিয়ে একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে চলে যতক্ষণ না তোয়ালেটা তার মুখ অবধি পৌঁছয়। তারপর তিতিবিরক্ত ভাবে ভড়ং দেখিয়ে মুখটা ঘষতে থাকে। তোয়ালের ধোঁয়াটে মেঘের পাক থেকে বেরিয়ে এসে তার মুখটা চকচক করে। তার শরীরে ঔজ্জ্বল্য ও মর্যাদা প্রত্যর্পণ করেছে।

নববর্ষের দিনে কেন ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে সে সম্পর্কে কিছু না বলে সে এবার পরিচারক 'ছোকরা'র দিকে মাথা কাত করে।

"পরিচারকের কাজ করা—একেবারে যাচ্ছেতাই।" 'ছোকরা' বলল। শ্রীযুক্ত ক উ'কে অত সহজে ছেড়ে না দেওয়ার গোঁ ধরেছে। সে জানত যে ক্ষুদে সুইকে যা বলেছে এখানে সেটার পুনরুক্তি করা উচিত হবে না। স্পষ্টাস্পষ্টি বলার ব্যাপারেও একটা সীমা রাখা দরকার। এখানে এখন বেশ শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে একটু মাখামাখিও দেখানো প্রয়োজন। "নববর্ষের দিনে লোকের ছুটি-ছাটা থাকা দরকার," সে বলে চলে। "কিন্তু আমাদের বেলায় সে সবের বালাই

নেই। আমরা কিচ্ছুটি করতে পারি না।" ব্যবহৃত তোয়ালেটা ফেরত নিয়ে সে আরো যোগ করেঃ "আর লাগবে বাবু?"

শ্রীযুক্ত ক উ মাথা নাড়লেন। 'ছোকরা'র দুর্ভাগ্যে তিনি যে একটু কাতর তা এখন বেশ স্পষ্ট, কিন্তু কোনো কথাবার্তার ভেতর না যাওয়াটাই তাঁর পক্ষে ভাল। লাইনের সব্বাই জানে যে তিনি এক ম্যানেজারের বন্ধু, এবং ম্যানেজারের বন্ধু হবার সুবিধে এই যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় তিনি যখন খুশি বিনে পয়সায় ঘুরতে পারেন। শুধু পরিচয় পত্রটি দেখালেই হল। পরিচারকের সঙ্গে কোনো ফালতু কথা না বলেই তিনি এ-কাজটা করতে পারেন।

ইতিমধ্যে পরিচারকটি ঘাবড়ে গেছে। সে বুঝেছে শ্রীযুক্ত ক উ কেন মাথা নাড়ছেন; কিন্তু তার আর কিই বা করার আছে। কারণ সে বেশ ভালভাবেই জানে, লোকটা ম্যানেজারের বন্ধু। কামরাটা বেশ ঝাঁকুনি খেতে লাগল। কামরার দুলুনিতে সে মাঝখানের পথটায় ছিটকে পড়ে গেল। নিজেকে সোজা রেখে, একটা তোয়ালের ভাঁজ খুলে আলগা ভাবে তার দুটো কোনা ধরে শ্রীযুক্ত চ্যাঙকে দিতে গেল। "আপনার কি একটা লাগবে বাবু?" লোকটা তার মোটা তালু দিয়ে মাঝখানে ধরে তোয়ালেটা নিতে চেষ্টা করে। ঐ দিকটাই সবচেয়ে গরম। তোয়ালেটা মুখে চেপে ধরে, এমন জোরসে ঘষতে থাকে যেন আয়না সাফ করছে! তারপর সে আরেক-খানা শ্রীযুক্ত চিয়াওকে দেয়। লোকটা কোন উৎসাহই দেখায় না। কিন্তু তোয়ালেটা নেয় আর সেটা দিয়ে নাকের ফুটো, হাতের নোখ মোলায়েম ভাবে সাফ করতে লেগে যায়। পরিচারকের হাতে তোয়ালেটা যখন ফেরত এল সেটা একেবারে তেলচিটে আর কালো হয়ে গেছে। "ইন্সপেক্টার এই এলেন বলে," সে শুরু করে। তার বিশ্বাস এই যে নিজের অসুবিধের কথা আউড়ে যে আলাপের সূচনা করা হয় তার থেকে বাজে আর কিছু নেই। সে একপাশ থেকে আক্রমণ করবে ঠিক করে ফেলে। "ও'রা চলে গেলে আপনাদের বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করবে। মশাই, আপনাদের কারো যদি গদির দরকার হয় তো আমাকে জানান।" একটু পরে সে ফের বলতে থাকে, "গাড়িতে তেমন একটা যাত্রী নেই। আপনারা সবাই এক চটকা ঘুমিয়ে নিতে পারবেন। খুব দুঃখের কথা যে মশাইদের আজকের মতো একটা দিনেও ট্রেনে চাপতে হচ্ছে, কিন্তু আমাদের, পরিচারকদের কথা ধরলে—" দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে। সে যে একটু বেশী বকে ফেলছে তা বুঝতে পারে। তার আবিষ্কার করা উচিত ছিল বাতাস কোন্ দিকে বইছে। শ্রীযুক্ত চ্যাঙের হাতে আরেকখানা তোয়ালে তুলে দিল। শ্রীযুক্ত চ্যাঙ দেখলেন যে চুলের যত্ন নিতে তাঁর মেলাই সময় লাগছে।

কিন্তু মনে পড়ে গেল যে চুল মোছা হয়নি। এই সবে চুল কেটেছেন। যদিও মাথার খুলি ঘষাটা বেশ কঠিন কাজ। তথাপি এই অগ্নি-পরীক্ষার ভেতর দিয়ে যেতে তিনি কৃতসংকল্প। কাজ শেষ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। যাই হোক শ্রীযুক্ত চিয়াও দ্বিতীয় বারের তোয়ালেটা ফিরিয়ে দিলেন, আর সদ্য পরিষ্কার করা নোখ দিয়ে নরম ভাবে দাঁত খোঁচাতে লাগলেন।

"গরম করার যন্ত্রটা কি গোল্লায় গেছে?" শ্রীযুক্ত চ্যাঙ তোয়ালেটা ফেরত দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি বলি কি জানলাটা খুলবেন না।" পরিচারকটি জবাব দিল। "আপনাদের ভেতর না না করেও ন'-দশজনের ঠাণ্ডা লেগে যাবে। রেল কোম্পানী যেমন নিষ্কর্মা কর্মকর্তাদের হাতে রয়েছে! সারা বছর তেনারা খাটাবেন, এমনকি বচ্ছরকার পয়লা দিনেও ছুটি নিতে দেবেন না। যাকগে, বকবক করে আর কি হবে।" এই ভাবেই একসময় রাস্তার ধারের এক ছোট্ট স্টেশনে ট্রেনটা এসে পৌঁছল।

তৃতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে থলে আর ঝুড়ি সমেত কয়েকজন যাত্রী নেমে গেল, হুড়োহুড়ি করে তারা গেটের দিকে এগোচ্ছে। কয়েকজন দাঁড়িয়ে পড়ে ইতস্তত করছে, যেন ট্রেনে কিছু ফেলে গেল কিনা ভাবছে। ট্রেনে যারা থেকে গেল, জানলার কাচে নাক চেপে ধরে বাইরে তাকিয়ে ছিল। তাদের মুখে ঈর্ষা আর উদ্বেগের প্রকাশ। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে কেউ নামেনি। তবু আধ-ডজন ফৌজী লোক কামরায় ঢুকে পড়ল। মেঝেতে তাদের বজ্র নিনাদ, আলোয় তাদের বেল্ট ঝলসে ওঠে, আর তাদের মালপত্তর বলতে পার্টিকলে রঙা কাগজে মোড়া চার বাক্স আতসবাজি।

বাক্সগুলো এমন বেখাপ্পা লম্বা যে ওগুলো নিয়ে কি করবে ঠিক করতেই ওদের মেলাই সময় লেগে গেল। ইতিমধ্যে বুটের খট খট শব্দ, লোকগুলোর চারধারে দৌড়ঝাঁপ আর ওদের গলা চড়তে লাগল, এবং আতসবাজির গাদা-গুলো কোথায় রাখা যায় এই প্রশ্নটা অনেকক্ষণ অমীমাংসিতই থেকে গেল। অবশেষে, ফৌজের কমাণ্ডারের মতো দেখতে একটা লোক বলল যে ওগুলো মেঝেতে থাকাই ঠিক। পলটনের কমাণ্ডার আদেশটার পুনরুক্তি করল। তারপর সবাই দ্বিগুণ ঝুঁকে আদেশটা কার্যকরী করতে লেগে গেল। কিছুক্ষণ পরে তারা কাঠ হয়ে উঠে দাঁড়ালো জুতোর গোড়ালিতে শব্দ করে। ফৌজী কমাণ্ডার অভিবাদন ফিরিয়ে দিয়ে ওদের আরাম করতে বলল। বুট জুতোগুলোয় বজ্র নিনাদ উঠল। ধূসর টুপি, ধূসর উর্দি আর ধূসর পাজামার এক মেঘ। এক মুহূর্ত পরে কেউ বলল: 'জলদি'। আর অমনি

তারা উধাও হয়ে গেল একান্ত বাধ্যের মতো। ট্রেন থেকে হুইসেল বেজে উঠল, না বলে বরং বলা ভাল ঘণ্টা বেজে উঠল, আর তারই ধ্বনি আর আলো অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ভেসে চলল, চাকার ঘর্ঘর শব্দ উঠল আর ট্রেনটা স্টেশনের বাইরে গড়াতে শুরু করল।

পরিচারকটি কামরার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে চলেছে। স্টেশন ছাড়ার পরই ট্রেনের বেগ বাড়তে থাকে। বাতাস আর্তনাদ করে আর আগুন লাফিয়ে ওঠে। ঝলমলে আতস সূক্ষ্ম কণাময় আগুন সমেত নিক্ষিপ্ত। কালো রাতের মধ্যে ট্রেনটা যেন লণ্ঠনের শিকলি, ঢেলে দিচ্ছে লেলিহান আগুন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাটার শুধু দগ্ধ কাঠামোটাই ছিল। আগুনের শিখা আর কোন খাদ্য না পেয়ে সামনে পেছনে ছুটতে ছুটতে শেষকালে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ঢুকে পড়ে। আগুনে পোড়া মাংস এবং নানান জিনিসপত্তরের সামান্য মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে তীব্র কূট গন্ধ পাঠিয়ে ধোঁয়া ঢোকে প্রথমে। আগুন অনুসরণ করে। 'আগুন! আগুন! আগুন!' ভয়ার্ত আর্তনাদে সবাই চিৎকার করতে থাকে। মাথার ঠিক নেই কারো। জানলা ভেঙে ফেলে বাইরে ঝাঁপ দেওয়ার জন্যে, আর তারপর ইতস্তত করে। কেউ কেউ ছুটতে শুরু করে তারপর একজন আরেক জনের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে আর মাটিতে পড়ে যায়। কেউ কেউ আবার নীচেই বসে রয়েছে যেন সিটে ক্রুশবিদ্ধ, এমনকি চিৎকার করার ক্ষমতাও নেই। উথাল-পাথাল! আতঙ্ক! সব চেষ্টা বৃথা প্রমাণিত হল। ও আর্তনাদ করে উঠল দু' হাত ভাঁজ করে মাথাটা আঁকড়ে, কাপড়-চোপড় দিয়ে আঘাত করতে লাগল আগুনের শিখায়। ও ছুটছিল প্রথমটা তারপর গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে পড়ল...

আগুন আবিষ্কার করেছিল এক নতুন উপনিবেশ, উন্নত সম্পদে পূর্ণ এক বিরাট জনসমষ্টি। আনন্দে পাগল হয়ে গেল সে। এক জিভে সে চেটে নেয়, আরেক জিভ দিয়ে শিকার ধরে, তৃতীয়টি দিয়ে ধোঁয়ায় লুকিয়ে ফেলে আর হঠাৎ জানলা দিয়ে ছুটে আসে চতুর্থটি। পঞ্চমটি আবার কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়াই ইতস্তত ছুটছিল। আর সকলের সঙ্গে মিশে ছিল সেই ষষ্ঠ জিভ। শত শত শিখা ভয়ঙ্কর উদ্ভট মুদ্রায় নৃত্য শুরু করে গোলাকার বলের মতো নিজেদের গুটিয়ে নেয়, জ্বলন্ত তারকার মতো নিক্ষেপ করে, আগুনের লাল আর সবুজ দাহ জড়ো হয়। ঝলসে ওঠে, আছড়ে পড়ে, ধোঁয়ার রেখা ধরে বুকে হাঁটতে থাকে, আর তারপর মেলায়। আর তারপর তারা ধোঁয়ার ভেতর থেকে ফেটে পড়ে বন্যার মতো। মানুষের মাংস, মানুষের চুল পোড়ানোর সময় কচ্ কচ্ শব্দে কি এক দুর্বোধ্য ভাষা

আওড়ায়। মানুষের দঙ্গল আর্তনাদ করে, বাতাস গর্জায়, আগুন লাফায়। পুরো গাড়িটায় আগুন লেগে যায়। ধোঁয়া ভারী হয়ে ওঠে। চমৎকার একটা চিতা জ্বলে।

ট্রেনটা পরের স্টেশনে এল। ওখানে থামার কথা তাই থামল। সিগন্যাল জ্যাম, টিকিট কালেক্টর, গার্ড, স্টেশন মাস্টার, কেরানীর দল এবং মজুররা সকলে বিস্ময়ে জ্বলন্ত গাড়িটাকে দেখতে লাগল। কেউই কিছু করতে পারল না, কারণ কোন আগুন নেভানো কল আর যন্ত্রপাতি ছিল না। সামনে পেছনে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা এবং তৎসংলগ্ন দুটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা নীরব, নিথর। ক্লান্ত বিরামে সেখান থেকে নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলীর পালক খসে পড়ছে।

পরে রিপোর্ট পাঠানো হল যে ট্রেনে বাহান্নটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে, আর লাইনের ধারের রাস্তায় আরো এগারো জনের লাশ পাওয়া গেছে যারা জানলা গলে লাফ দিয়ে নিজেদের শেষ করেছে।

লণ্ঠন উৎসবের পরে—অর্থাৎ নববর্ষের পনেরো দিন পরে একজন ইন্সপেক্টার এলেন। প্রথম তিনদিন অভ্যর্থনায় ব্যস্ত থাকায় তদন্তের জন্যে একটুও সময় দিতে পারেননি। পরের তিনদিন ব্যক্তিগত ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতে হল, ওগুলো আর ঝুলিয়ে রাখা যাচ্ছিল না বলে। আর তারপর তদন্ত শুরু হল।

গার্ডটি কিছুই জানতো না। প্রথম ইন্সপেক্টর কিছুই জানতো না। দ্বিতীয় ইন্সপেক্টর কিছুই জানত না। তিয়েনশিন দানব, শানলুং দানব বা পরিচারক কেউ জানত না আগুন লাগার কারণ। বিক্রীত টিকিটের সংখ্যার সঙ্গে নিখোঁজ তেষট্টিটি টিকিটের হিসাব সমেত সংগৃহীত টিকিটের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন স্টেশনের রিপোর্টে মিল পাওয়া গেল। এই সংখ্যাটাই হল ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ। যারা নিশ্চিত পুড়ে মারা গেছে তাদের সংখ্যা। কোন স্টেশন থেকেই দ্বিতীয় শ্রেণীর বিক্রীত টিকিটের রিপোর্ট পাওয়া যায়-নি; তার মানে দ্বিতীয় শ্রেণী নিশ্চয় ফাঁকা ছিল, অতএব দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে আগুন লাগতেই পারে না।

অবশেষে পরিচারককে ফের জিজ্ঞাসা করা হল। সে জানাল আগুনের ব্যাপারে সে কিছুই জানতো না। এটা নিশ্চয় শুরু হয়েছে যখন সে ডাইনিং কারে ছিল। ট্রাইবুনাল সিদ্ধান্ত নিল যে কর্মরত অবস্থায় নিজের জায়গা ছেড়ে যাওয়ায় সে মারাত্মক ভুল করেছে এবং তার শাস্তি পাওয়া উচিত। যথাকালে যথারীতি তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হল।

ইন্সপেক্টার অতঃপর তাঁর রিপোর্ট জমা দিলেন প্রশংসনীয় আঙ্গিকে রচিত এই মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণ সমেত।

"আমার ভারী বয়ে গেছে," পরিচারকটি তার বৌকে বলল। "বচ্ছরকার পয়লা দিনে ডিউটিতে লাগিয়ে দেবে তারপর সব গোল্লায় গেলে ব্যাটারা ভাবে আমাদের রেল কোম্পানী থেকে ছাড়িয়ে দিলে আমরা শুকিয়ে মরবো।"

"বোকামি আর কাকে বলে!" তার বৌ জবাব দেয়। "আমার বয়ে গেছে ওসব নিয়ে ভাবতে। আমি বলে ভেবে মরছি, কপি পাতাগুলো যে পুড়ে গেল তার কি হবে?"

অনুবাদ / রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্দরে নাবিক ॥ শেন ৎসুঙ-ওয়েন

চেঙ চাওয়ের সমুদ্রের জলে নোঙরটা ক্রমশ তলিয়ে গেল। জাহাজটা এখন দিন কতক জিরোবে বলে জেটির গায়ে এসে ভিড়েছে।

পনেরো ফুটের মতো লম্বা একটা কাঠের পাটাতন নামানো হল জেটির পাথুরে সিঁড়িটার ওপর। যাত্রীরা সারি বেঁধে নামতে শুরু করেছে। পিঠের ওপর মালপত্র চড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে হেলেদুলে টাল সামলাতে সামলাতে তারা পিছু পিছু নেমে আসছে। শেষ পর্যন্ত সবাই নিশ্চিন্তে তীরে এসে নামল।

আরো অনেক জাহাজ নদীর তীরে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সংখ্যায় তারা এত বেশী যে তাদের মাস্তুলের মৃদুমন্দ দোলানি দেখে মনে হচ্ছে সারি সারি গাছ হাওয়ায় মাথা নাড়ছে। মাস্তুলের গায়ে জড়ানো দড়িদড়ার গোছা আর পালগুলো যেন বিচিত্র ডালপাতার হিজিবিজি জটলা। জাহাজে নীল উর্দি পরা নাবিকদের কেউ কেউ কাজে ব্যস্ত আর বাকীরা মুখে পাইপ গুঁজে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আকাশের পশ্চাৎপটে তাদের বিশাল লোমশ হাত-পাগুলো যেন শিশুদের কল্পনা-রাজ্যের দৈত্যের মতো আকাশের গা থেকে ঝুলছে। দেখে ছেলেবেলার সেই দুরন্ত বীর 'উড়ন্ত লোমশ পা'-এর কথা মনে পড়ে যায়। বিশেষ করে কেউ যখন দড়ির জোট খুলতে সাঁ সাঁ করে ঢ্যাঙা মাস্তুল বেয়ে ওপরে ওঠে। এই ধরনের বিপজ্জনক কাজে ওরা আনন্দ পায়। দড়িতে যত শক্ত গেরো পড়ে ততই ভাল।

মসৃণ তেলতেলে মাস্তুলগুলো বেয়ে ওদের এই অনায়াস আরোহণ দেখে অবাক হয়ে ভাবতেই হয়, ওদের হাত-পাগুলোয় কোন আংটা লাগানো আছে কিনা। উঠছে কি করে? ওই উঁচুতে, যেখানে উঠলে বনবন্ করে মাথা ঘোরার কথা, সেখানে বসে এমন নিশ্চিন্তে গান গাইছে কি করে, আর ঠাট্টা তামাশাই বা করছে কি করে? শুধু তো পা দুটো দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে পাল আটকাবার মাস্তুলটা, হাত দুটো তো দড়িদড়ার কাজ নিয়েই ব্যস্ত!

প্রতিবেশী জাহাজগুলোর মাস্তুলের ওপর থেকে অন্য নাবিকরা আবার গানের উত্তরে গান গেয়ে উঠছে এবং কখনো আবার তা সমবেত কণ্ঠে। এর ফলে ওরা যেন আরো ভয়ডর ত্যাগ করে জাহাজের পাটাতন ছেড়ে মাঝ

আকাশে তাদের দক্ষতা জাহির করতে শুরু করে দিয়েছে। নীচে দাঁড়িয়ে অন্য নাবিকরা ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওপরের ওদের মতো ওরাও অমনি সাবলীল আর দর্শনীয় খেলা দেখাবার জন্য অস্থির। তাই ওপরে ওঠার ওপর ক্যাপ্টেনের নিষেধাজ্ঞাটি ওদের খুবই অসন্তুষ্ট করে। ওরা সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে দেখে প্রতিদ্বন্দ্বী জাহাজের মাস্তুলের সঙ্গে জেটির বাহুর ওপর থেকে খেলুড়েরা ঠাট্টা তামাশা করছে। শেষ পর্যন্ত ওরা চটে গিয়ে চেঁচাতে শুরু করে।

"একবার পড়ো তো দেখি বাছা, একেবারে চুরচুর হয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করো!"

"ওহে ও ক্ষুদে নাতি, আছাড় খেয়ে মাথার খুলিটা ফাটিয়ে তারপর একবার তোমার বুলবুলি-কণ্ঠের গান শুনিও কিন্তু!"

"বেজন্মা কোথাকার!"

তবু কোন লাভ হয় না। শুধু ওপরে নাবিকটির সঙ্গীতস্পৃহা আরো যেন বেড়ে যায়।

"ওরে বালখিল্যের দল," নীচের দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে ওঠে, "ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তার উল্টো। আমি, আমিই সেই ব্যক্তি যে তোর মায়ের পাশে গিয়ে শুয়েছিল আর তারপর তোর বাপ হয়ে গেছে।"

যতক্ষণ না কাজ সাঙ্গ হচ্ছে নাগাড়ে গালিগালাজের আদান প্রদান চলতে থাকে। প্রত্যেকেই চুটিয়ে উপভোগ করে…

আজকের মতো ঝড় বৃষ্টির রাতে জাহাজগুলোর ওপর বিশালাকার হলদে অয়েল ক্লথের সামিয়ানা টাঙানো হয়। নাবিকরা এখন সেই সামিয়ানার নীচে জড়সড় হয়ে বসে আছে। কেউ কেউ তাস খেলছে, কেউ সরবে বকবক করছে, আবার কেউ শান্ত হয়ে বসে বৃষ্টি ঝরার টাপ-টুপ আর 'সোনালী বালির নদীর' বুক বয়ে ঝড়ো হাওয়ার গান শুনছে। জাহাজগুলোকে গায়ে গায়ে ভিড়িয়ে নোঙর করা হয়েছে। টান্ টান্ করে একটা চেন দিয়ে সব একসঙ্গে বাঁধা। মাঝে মধ্যে একটা করে ঢেউ উথলে উঠছে আর জাহাজগুলোয় ঠোকাঠুকি লাগছে। সেদিকে অবশ্য নাবিকদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, এ নিয়ে তারা একটা গুঞ্জনও তুলছেনা। বিবর্ণ চাঁদ, পোড়া আকাশ কি প্রভাতী শিশিরের ওড়না মানুষের মনকে গীতিময়তার উচ্ছ্বাসে সিক্ত করে কিন্তু নাবিকদের তার কিছুই স্পর্শ করে না। তবে কয়েকটা ব্যাপারে ওরা অত্যন্ত আগ্রহী এবং এ সম্বন্ধে তাদের কতকগুলো দৃঢ় মতামতও আছে। যেমন প্রথমেই বলতে হয় নৈশ আহারে মাংস খেতে পাবে, না বাঁধাকপির

টক এবং দ্বিতীয়তঃ, নোঙরটা মাঝদরিয়ায় ফেলা হবে, না তীর ঘেঁষে—এগুলো ওদের গভীর চিন্তার বিষয়। বাঁধাকপির টকের চেয়ে মাংস অনেক বেশী কাম্য আর নদীর পার থেকে দূরে জাহাজ বাঁধাটা তারা আদৌ পছন্দ করে না।

এমনি এক নাবিকের কথাই বলছি। বর্ষণ ধূসর রাতে কাঠের পাটাতন ধরে সে জেটিতে এসে নামল। পথের কাদার ওপর নজর রেখে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল। দুরদুর করছে বুকটা। নাম তার পাই জু। জাহাজের মাস্তুলে চড়ার ব্যাপারে তার আগ্রহে কখনো ভাঁটা পড়তে দেখা যায় না। দিন ভোর মুখে তার গান লেগে থাকে আর সূর্যাস্তের সময়েও দেহে এতটুকু শ্রান্তির লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এমনি মানুষ পাই জু। এই মাস্তুলে ওঠা নামা করে সে যা পয়সা কামিয়েছে তাই এখন কোমর বন্ধনীতে ভরে এলোমেলো পায়ে এগিয়ে চলেছে। বর্ষার ধারা তেরছা ভাবে এসে পড়ছে তার মাথার ওপর আর তারপর নগ্ন পা আর পায়ের পাতা বেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে।

পাই জু শেষ পর্যন্ত বাড়ির দোর গোড়ায় এসে পৌঁছল। দুনিয়ার নাবিক কুলের রীতিমাফিক সে দরজায় ধাক্কা মারল আর তারপর সশব্দে শীষ দিয়ে উঠল। দরজা খুলতেই একটা কাদা মাখা পা ঢুকিয়ে দিল ঘরের চৌহদ্দীর মধ্যে। আরেকটি পা ঘরের মধ্যে তখনো ঢোকায়নি, এক জোড়া শীর্ণ দীঘল বাহুর বেষ্টনীতে তার শরীরটা বাঁধা পড়ল। রোদে জলে পোড়া সদ্য দাড়ি-কামানো মুখখানার ওপর এক মহিলার প্রশস্ত উষ্ণ ওষ্ঠ সোহাগ স্পর্শ টানতে লাগল। মেয়েটির সুগন্ধী চর্চিত দেহের ঘ্রাণ, আলিঙ্গনের ভঙ্গি আর পাউডার-মাখা কোমলতা—এ সবই তার পরিচিত। মুখটা একটু সরিয়ে সে মেয়েটির সিক্ত জিভের সংস্পর্শে আসে। ঠোঁটে ঠোঁট যুক্ত করে তারা দীর্ঘক্ষণ ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। শেষপর্যন্ত পাই জু মেয়েটিকে বন্ধন মুক্ত করে দেয়।

'ওরে পাজী!' হাঁফাতে হাঁফাতে মেয়েটি বলে। 'আমি তো ভয় পাচ্ছিলাম যে নদীর ওদিকের 'চাঙতে'র মেয়েগুলো বোধহয় তোমাকে খেয়েই ফেলেছে।'

'আবার তোমার লম্বা জিভটা নাড়ছো তো! দেখবে, পুরো জিভটাই দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে বার করে নেব!'

'আমি ছিঁড়ে নেবো তোমার…'

পাই জু হাসতে হাসতে মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করে তুলে ঘরের মাঝখানে এসে লণ্ঠনের আলোর তলায় নামিয়ে দেয়। লম্বায় মেয়েটির থেকে এক মাথা উঁচু পাই জু। মুখ নীচু করে সে মেয়েটিকে দেখতে থাকে।

'মাইরি বলছি, দাঁড় টেনে টেনে আমি একেবারে ক্লান্ত।'

'......?'

'হ্যাঁ, আমি চাকাওলা গাড়ি ঠেলতে চাই।' মুচকি হেসে বলল পাই জু।

'অসভ্য জন্তু কোথাকার!' মেয়েটি বলল।

তারপর মুহূর্তের মধ্যে পাই জু-র পকেট হাতড়াতে শুরু করে দিল। একটা করে জিনিস টেনে বার করে, বিছানার ওপর ছুঁড়ে দেয় আর বারবার একই কথা উচ্চারণ করে, 'ফরেন্ জিনিস।'

'স্নোহোয়াইট ক্রীম—সৌখীন কাগজ—নতুন রুমাল—একটা টিন দেখছি—কি আছে এটাতে?'

'ভেবে বলতো দেখি।'

'আমি অত ভাবতে টাবতে পারিনা। তুমি আমায় পাউডার দেবে বলেছিল, সেইটা কি?'

'কি নাম লেখা রয়েছে দ্যাখো, তারপর টিনটা খুললে নিজের চোখে দেখতে পাবে।'

লণ্ঠনের আরো কাছে গিয়ে মেয়েটি টিনটা খুলে গন্ধ শুঁকল। তারপর চোখে মুখে অপ্রসন্ন হবার মতো একটা কপট ভাব ফুটিয়ে তুলতেই পাই জু'র আনন্দের আর সীমা থাকে না। বিনা বাক্য ব্যয়ে টিনটিকে কেড়ে নিয়ে মেয়েটির কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে বিছানার ওপর তুলে আনল। ঘরের মধ্যে ওদের অস্তিত্ব এখন দৃষ্টির অগোচর। শুধু লাল লণ্ঠনের তলায় আবছা আলোর বৃত্তের মধ্যে পাই জু'র কাদা পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে।

বাইরে এখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে কিন্তু ওদের হাসির লহরায় চাপা পড়ে যাচ্ছে ঝড়ের গর্জন। ঘরের দেওয়ালগুলো এতই পাতলা যে পাশের ঘরে বসে একজন যে আফিমের পাইপ টানছে, সে শব্দটা পর্যন্ত পরিষ্কার কানে আসছে। অবশ্য পাই জু আর মেয়েটি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অসচেতন।

'সত্যি—তোমার দারুণ ক্ষমতা! একেবারে ষাঁড়ের মতো।'

'বিশ্বাস করো, আমি কিন্তু এতদিন অন্য কোন মেয়ের কাছে যাইনি।'

'একবারও নয়? দিব্যি গেলে বলতো দেখি, ওই স্বর্গের মন্দিরের নৈবেদ্যর মতোই পবিত্র তুমি?'

'সত্যি বলছি। শপথ করে বলছি।'

'কে বিশ্বাস করবে—'

পাই জু কিন্তু সত্যিই নিজের মধ্যে সহসা এমন প্রচণ্ড শক্তি আর সামর্থ্য অনুভব করল যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ঘনঘন তার আবিল নিশ্বাস পড়তে লাগল। মাংসপেশীগুলো উঠলো ফুলে। তারপর শেষ কালে সে

ঠাণ্ডা হল, শিথিল হয়ে এল দেহ, দলা পাকানো ভেজা পাটের মতো বিছানায় নিস্পন্দ পড়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি ধূমপানের সরঞ্জাম এনে বিছানার ওপর রাখল। দু'জনের মধ্যে একটা যেন মহাপ্রাচীর গড়ে উঠল। তারই দু'পাশে দু'জনে শুয়ে নীরবে ধূমপান করতে লাগল। তারপর মেয়েটি দু'-এক কলি করে অপেরার বিভিন্ন গান ভাঁজতে শুরু করল। পাই জু ধূমপান করে চলেছে আর মাঝে-মধ্যে আয়েস ভরে চায়ে চুমুক লাগাচ্ছে। নিজেকে তার সম্রাটের মতো লাগছে।

'কিন্তু একটা কথা শুনে রাখো, নদীর উজানে ও দেশের মেয়েরা কিন্তু সত্যিই বেশ রূপসী।'

'তাহলে আর আমার কাছে এলে কেন ?'

'আসলে আমি হয়তো ওদের ভালবাসি. কিন্তু ওরা আমায় ভালবাসে না।'

'তাহলে সেইজন্যেই এখানে আস বলো ?'

'তুই একটা ডাইনী ! আমি থাকি না যখন কত পুরুষ আসে, অ্যাঁ ?'

'এ অভিযোগ তোরই সাজে !'

মেয়েটি মুখখানা গোমড়া করে পাই জু'কে আরেকটা পাইপ এগিয়ে দিল।

কয়েক মিনিট নীরবে ধূমপান করল পাই জু।

'গতকালের কথাই বল্ না—কেউ আসেনি এখানে ?'

'কেন তুমি এমন কষ্ট দিচ্ছ বল তো ? কতদিন ধরে আমি তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছি। এক এক করে দিন গুনে গেছি। আমি ঠিকই হিসেব করেছিলাম। জানতাম আমার ঘাটের মড়াটা আজই আসবে।'

'হুম ! আচ্ছা ধর্, আমি যদি 'নীল তরঙ্গের ঘূর্ণিতে' ডুবে মরি, তুই খুশী হবি তো ?'

'নিশ্চয়, সে আর বলতে।' মেয়েটি ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

ওকে ক্ষেপিয়ে পাই জু মজা পায়। এক বিচিত্র সুখের অনুভূতি আর ক্ষমতার আস্বাদ পায়। সহসা ধূমপানের সরঞ্জাম ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে। জড়িয়ে ধরে। সুডৌল স্ফীত স্তন আর সুগঠিত উরু নিয়ে সোহাগ করে। দংশন করে মেয়েটিকে। হাসি মুখে ওর দিকে তাকিয়ে শুয়ে রয়েছে মেয়েটি। পাই জু'র পিঠের দিক থেকে তাকালে দেখা যাবে লাল রেশমে মোড়া ছোট্ট একজোড়া পা শুধু ওকে বেষ্টন করে রয়েছে...

মন্থর পায়ে পাই জু ফিরে চলেছে নদীর দিকে। বৃষ্টির তেরছা ধারা ভেদ করে। হাতে তার মোটা একটা দড়ি। এই জ্বলন্ত দড়িটাই তার পথ নির্দেশের বাতি। বেশ তোড়ে বৃষ্টি পড়ছে, পথময় কাদাগোলা জলের ছোট ছোট ডোবা তবু পাই জু অস্বস্তি বোধ করে না। পাই জু ভাবছে মেয়েটির কথা। মেয়েটি তাকে অনেক আনন্দ আর খুশি দিয়েছে। সব কিছু ভুলিয়ে তার মনটাকে সে কানায় কানায় ভরিয়ে দিয়েছে। পাই জু তার দেহের কোমল স্ফীতি, তার উষ্ণতা আর তার অঙ্গের গড়নের অবিশ্বাস্য ঔদ্ধত্যের কথা ভাবছে। হাজার মাইলের ব্যবধানে থাকলেও সে তার প্রতিটি অঙ্গের প্রতিটি ভাঁজের সম্পূর্ণ নির্ভুল বর্ণনা দিতে পারবে।

মেয়েটি ওকে যা দিয়েছে তা ওর গত এক মাস ধরে নদীর বুকে হাড়ভাঙা খাটুনির কথা ভুলিযে দিয়েছে। ভুলিয়ে দিয়েছে জ্বলন্ত সূর্যের তাপে, ঝড় আর বৃষ্টির মুখে পিঠ বেঁকানো শ্রমের কথা। এমন কি তাসের জুয়োর তার দুর্ভাগ্যকেও বোধহয় পুষিয়ে দিয়েছে। তার সমস্ত প্রচেষ্টাকে মেয়েটি যে শুধু অর্থবহ করে তুলেছে তাই নয়, আগামী এক মাসের জন্যে সে তাকে শক্তি জুগিয়েছে খাটবার, মাস্তুলে চড়বার আর গান গাইবার। তারপর পাই জু আবার ফিরে আসবে, আবার ওর পাশে এসে শোবে।

পাই জু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাহাজটার রঙ করা পেটটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। মুহূর্তের জন্য যেন মনে হয়, ফিরে এসে ভালই করেছে। ইতিমধ্যেই নতুন যাত্রী আর লটবহর আসতে শুরু করেছে। জাহাজের খোলের আশ্রয়ে তারা সাময়িক আস্তানা গাড়তে চলেছে। অধিকাংশ নাবিকের মতো পাই জু-ও প্রবৃত্তিগত ভাবে অপরিচিতদের আগমনে অসন্তুষ্ট। এরা একেবারে নিয়ম মাফিক কিছুদিন অন্তর অনুপ্রবেশ করে ওদের এই কাঠের আস্তানায়, যা নাবিকদের কাছে এক অতি জীবন্ত প্রাণী বিশেষ।

কেন বলতে পারবে না, হঠাৎ পাই জুর মনে পড়ে গেল মেয়েটির কথা। এই গাঢ় রঙের পতাকাওলা বিশাল জাহাজটির মতো সেও নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে, প্রতীক্ষা করছে। অস্পষ্ট ভাবে পাই জু অনুভব করে দুনিয়াটার কোথায় কি একটা যেন গণ্ডগোল হয়ে রয়েছে। এই প্রথম সে খেয়াল করে যে তার হাত-পাগুলো আর চলছে না, এত ক্লান্ত সে। জাহাজে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে পাই জু তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

অনুবাদ / সিদ্ধার্থ ঘোষ

ইস্কুল বিদায় /লাও সিয়াঙ

গ্রামের ছেলেরা আট বা ন' বছরে পা দেবার পর তাদের যে কাজ করতে হয় তা একজন প্রাপ্তবয়স্কের সমান না হোক, নিদেন পক্ষে তার অর্ধেক তো বটেই। সে বসন্তে চারা রোয়, গ্রীষ্মে কাটা ফসলের আঁটি বাঁধে, বাড়ি তৈরির সময় হাতে হাতে ইঁট চালান দিতে শেখে আর জলসেচ প্রণালীর সঙ্গে খালগুলোর মুখ জুড়তে বা তাতে বাঁধ দিতেও ওস্তাদ। কাজেই এমন একটা ছেলেকে কে আর ইস্কুলে পাঠাতে চায়! ওদিকে সম্প্রতি শহরে আবার একটা সরকারী আদেশ জারী হয়েছে। এই আদেশ অনুযায়ী ছ' বছরের বড় কোন ছেলে যদি ইস্কুলে না যায় তাহলে তার পরিবারের যে কোন একজন প্রাপ্ত-বয়স্ককে জেলে পোরা হবে।

হ্যাঁ, এমনি এক গেঁয়ো ছেলেকে নিয়েই আমাদের এই গল্প, আর এই হল তার ইস্কুল গমনের ইতিবৃত্ত।

ছেলেটি প্রথম দিন ইস্কুলের পর দুটি বই হাতে বাড়ি ফিরতেই ঠাকুর্দা ঠাকুমা বাবা মা সবাই তাকে ঘিরে ধরল। বইয়ের ছবি দেখে তো তারা একেবারে তাজ্জব। ঠাকুর্দা বলল, 'গ্রন্থ চতুষ্টয় বা পঞ্চ-পুরাণে কখনো এমন ছবি দেখিনি।'

'ছবির লোকগুলো কিন্তু চীনা নয়!' বাবার হঠাৎ ভাবোচ্ছ্বাস ঘটল। 'ভাল করে দেখ, তাহলেই বুঝতে পারবে যে ওদের কারুর বেশবাসই আমাদের মতো নয়। এই দেখ, এগুলো চামড়ার জুতো, এগুলো বিদেশী বেশবাস, আর এটা হল যাকে বলে ডগ্ স্টিক। এদের দেখে আমার শহরের চৌরাস্তায় যে বুড়ো পাদ্রীটা ধর্মপ্রচার করে, তার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।'

'চরকার সামনে এই যে বুড়িটা বসে রয়েছে এটাও বিদেশী।' ঠাকুমা বলল।

'আমরা ডান হাতে চরকা ঘোরাই, এ ঘোরাচ্ছে বাঁ হাতে।'

'তাই যদি হয়, তাহলে এই গাড়োয়ানটাও চীনা নয়। এই দেখ, কোনদিন কোন চীনা গাড়োয়ানকে দেখেছ গাড়ির এই পাশে দাঁড়াতে?' ঠাকুর্দা অভিমত দিল।

'মাস্টারমশাই বলেছেন বইয়ের দাম এক ডলার কুড়ি সেণ্ট।' বই নিয়ে

সবার উৎসাহ দেখে ছেলেটি সাহস করে হঠাৎ বলে ফেলল। তার এই বিবৃতি শুনে সবাই একেবারে বজ্রাহত।

ঠাকুমার মুখেই প্রথম কথা ফোটে, 'সত্যি, বলিহারি ওদের সাহস! বলি বাছাকে তুলে দিলাম তোদের হাতে, তারপর আবার আমাদের কাছ থেকে বইয়ের দাম আদায় করবি! সবে একটা দিন ইস্কুলে গেছে আর তার জন্যে আমাদের এক ডলারেরও বেশী খরচা হয়ে গেল। ইস্কুলের এই রাজকীয় খরচ যোগানের সাধ্যি ক'জনের আছে শুনি? ঘরে ছ মাসও যদি একটিও আলো জ্বালা না হয় তবু এই খরচা উঠবে না। এর জন্যে নিদেনপক্ষে আট ধামা ভুট্টার দানা বেচতে হবে।'

'আমার তো মনে হয় একটা বই-ই শুরু করার পক্ষে যথেষ্ট। একটা শেষ করার পর তারপর আরেকটা নিতে পারে।' ঠাকুর্দা বলল।

'তাছাড়া বইগুলোর দামই বা এত হবে কেন? পাতায় তো মাত্র তিন-চারটে করে শব্দ রয়েছে।' ঠাকুমা বলে চলে, 'পাঁজিতে তো ছোট বড় দু'ধরনের শব্দই থাকে, তাছাড়া তাদের ছাপাটাও একেবারে ঠাসা, তবু মাত্র পাঁচ তামার চাকতি দাম তার। এগুলোর দাম এক ডলারের বেশী হয় কি করে?'

ক' মিনিট আগেও বইগুলো ছিল তাদের কাছে বিস্ময়। কিন্তু এখন সেগুলো তাদের হতাশার কারণ। সারা পরিবার সান্ধ্য ভোজনের সময় এবং তার পরে সারা সন্ধ্যে এই নিয়ে আলোচনা করে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এই প্রথম বার বলে এবারের মতো তারা উৎপাত সহ্য করে নেবে এবং পুরো দাম মিটিয়ে দেবে। সম্প্রতি মা কানের দুল দুটো বেচে যা পেয়েছে এই খরচ মেটাতে গিয়ে তাতে এবার হাত পড়বে। অতঃপর পুত্রের উদ্দেশ্যে পিতা একটি ভাবগম্ভীর বক্তৃতা ঝাড়ল, 'এখন তোর ন'বছর বয়স, আর সেই ছোটটি নেই। খাটাখাটুনি থেকে রেহাই দিয়ে তোকে আমরা ইস্কুলে পাঠাচ্ছি, যদিও আমাদের যা অবস্থা তাতে সেটা সাধ্যের অতীত। এখন তুই যদি অত্যন্ত মন দিয়ে পড়াশোনা না করিস, কিছু না শিখিস, তাহলে সেটা একেবারেই অকৃতজ্ঞের কাজ হবে।'

পিতার এই উপদেশ তার একেবারে হৃদয়ে গ্রথিত হয়ে গেল এবং পরদিন ভোর হতেই ছেলেটি ইস্কুলের পথে পা বাড়াল। ইস্কুলে পৌঁছনো মাত্রই দারোয়ান কিন্তু তাকে মৃদু কণ্ঠে জানাল, 'ন'টার আগে ক্লাস শুরু হয় না। এখন তো সবে সাড়ে পাঁচটা। অনেক আগে এসে পড়েছ। মাস্টারমশাই এখনো ঘুম থেকে ওঠেননি। ক্লাস-ঘরের দরজাও খোলা হয়নি। তুমি বরং বাড়ি ফিরে যাও।' ছেলেটি আশপাশে চোখ বুলিয়ে দেখল, সে ছাড়া এ-চত্বরে আর দ্বিতীয় কোন ছাত্র নেই। মাস্টারমশাইয়ের জানলার তলায় দাঁড়িয়ে

সে নাক ডাকার শব্দ শুনল, তারপর সারা ইস্কুল বাড়ি ঘুরেও একটাও ক্লাস ঘরের দরজা খোলা পেল না। কাজেই বাড়ির দিকে দৌড় লাগানো ছাড়া তার আর কোন গতি রইল না। ঠাকুর্দা তখন উঠোন ঝাঁড় দিচ্ছিল। হঠাৎ নাতির ওপর চোখ পড়তেই ঠাকুর্দা ঝাঁটাটা ছুঁড়ে ফেলে বলে উঠল, 'ভগবান যাকে মূর্খ করে রাখতে চান সে ছেলেকে আর দিগ্‌গজ তৈরি করার চেষ্টা ক'রে কোন লাভ আছে কি? ওই দেখ। দু'দিন না যেতেই, ইস্কুল পালানো শুরু করে দিয়েছে!' ছেলেটি সবে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই চটাস শব্দে মায়ের বিরাশি সিক্কার দুটো চড় এসে পড়ল আর প্রাতরাশের ব্যবস্থা করতে উনুন ধরানোর কাজটাও জুটে গেল। বলাই বাহুল্য, অত দাম দিয়ে বই কিনতে বাধ্য হওয়ার সঙ্গে মাথা গরম হওয়ার বেশ খানিকটা সম্পর্ক রয়েছে।

প্রাতরাশ সাঙ্গ করে ছেলেটি যখন আবার ইস্কুলে এল মাস্টারমশাই তত-ক্ষণ মঞ্চে চড়ে দেরীতে ইস্কুলে আসা নিয়ে বক্তৃতা শুরু করে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যটা সুচারু রূপে পেশ করতে গিয়ে তিনি ছোট্ট একটি পরীর গল্প শোনালেন।

রাস্তার ধারে এক থলি সোনার মোহর নিয়ে এক পরী বসে থাকত। যে সবচেয়ে আগে আসত তাকেই সে সব দিয়ে দিত পুরস্কার হিসেবে। 'পরী' 'সোনা'—এইসব শব্দ আর গল্পটা শুনে ছেলেটি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। তবে 'সবচেয়ে আগে' বলতে ঠিক কি বোঝায় সেটা ও ধরতে পারেনি।

বিকেলে সাড়ে তিনটের সময় আমাদের তরুণ নায়ক বাড়ি ফিরে এল। বাবা সেই সবে দুপুরে একটু গড়িয়ে নিয়ে আবার কাজে বেরোচ্ছে। সৌভাগ্য-বশত বাবার চোখে পড়ল অন্য ছেলেরাও ইস্কুল থেকে ফিরছে আর মাস্টার-মশাই কুকুর-খেদানো ছড়ি হাতে বায়ু সেবনে বেরিয়েছেন। অগত্যা ছেলে যে ইস্কুল পালায়নি সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হলেন। কিন্তু এইসব বিদেশী ইস্কুলের বিচিত্র রীতিনীতির কথা তাঁর মগজের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল।

ইস্কুলে প্রথম ছটা দিন কেটে গেল বইয়ের প্রথম পাঠ নিয়ে—'এই আমার মা'। ছেলেটি পরিশ্রমী নয় একথা বলা যাবে না। প্রত্যেক দিন ইস্কুলের পর সে তার পড়া ঝালিয়েছে, সন্ধ্যে অবধি নাগাড়ে বার বার রিডিঙ পড়েছে—'এই আমার মা'। বইটাকে খুলে সে বাঁ হাতে ধরে আর ডান হাতটা শব্দ-গুলোকে অনুসরণ করে। তার ভাব দেখে মনে হয়, সে যেন ভয় পাচ্ছে যে এদিকে পুরোপুরি নজর না রাখলে শব্দগুলো যে কোন সময় উড়ে পালাতে পারে।

কিন্তু যতবারই ও রিডিঙ পড়ে, 'এই আমার মা', ওর মায়ের বুকটা ছ্যাঁত করে ওঠে। ইস্কুলে যাবার পর ষষ্ঠ দিন মা আর সহ্য করতে পারে না। ছেলের হাত থেকে বইটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে বলল, 'দেখি, কে তোর মা!' মা সত্যিই বোধহয় শিখতে আগ্রহী ভেবে ছেলেটি আঙুল দিয়ে সংলগ্ন ছবিটি দেখিয়ে বলে, 'এইটাই মা—এই যে চামড়ার জুতো পায়ে, বব্ ছাঁট চুল, আর লম্বা পোশাক!' ছবির দিকে এক পলক তাকিয়েই মা ডুকরে কেঁদে ওঠে। কি জানি কোন অমঙ্গল বুঝি ভর করল ভেবে ঠাকুর্দা ঠাকুমা বাবা সবাই ঘাবড়ে যায়। সবাই জিজ্ঞেস করতে থাকে কিন্তু মা প্রথমে কিছুই বলতে চায় না। অনেক করে বলার পর মা বলে, 'আমার ছেলে এমন রক্তচোষা বাদুড়ের মতো মা পেল কোত্থেকে?'

মায়ের মনস্তাপের কারণ জানতে পেরে বাবা বলল, 'ওকে বলতে হবে, ও যেন মাস্টারকে জিজ্ঞেস করে ছবিটা কার মার। হয়তো এটা মাস্টারেরই মা।' পরের দিন ভোর না হতেই মা তাকে ঠেলে তুলে ইস্কুলে পাঠিয়ে দিল যাতে মাস্টারমশাইকে প্রশ্ন করে সমস্যাটার একটা সুরাহা করতে পারে। ভাবনায় ভাবনায় মায়ের সারাটা রাত ছটফট করে কেটেছে। ইস্কুলে পৌঁছে ছেলেটি দেখল সেদিন রবিবার বলে ইস্কুল বন্ধ। তাছাড়া, গতরাত্রে মাস্টারমশাই তাঁর ধাতে যা সয় তার চেয়ে বেশী পরিমাণে মদ্য পান করায় তখনো গভীর নিদ্রামগ্ন। ছেলেটি মাকে এসে পরিস্থিতির কথা বলতেই মা রবিবারের এই প্রথার বিরুদ্ধে শাপশাপান্ত জুড়ে দিল।

রবিবারের সাধারণ জমায়েতে মাস্টারমশাই কোমল কণ্ঠে ছাত্রদের বোঝাতে লাগলেন, 'কেউ যদি কিছু শিখতে চায় তাহলে কোন প্রশ্ন করতে তার ভয় পাওয়া উচিত নয়। কারুর কোন প্রশ্ন থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ইস্কুলে হলে মাস্টারমশাইকে আর নয়তো বাড়িতে থাকলে বাবা-মাকে তা জানানো উচিত।' এই না শুনেই আমাদের নায়ক উঠে দাঁড়িয়ে শুধোল, 'বইয়ে বলছে—এই আমার মা—এ ছবিটা কার মার?' মাস্টারমশাই আরো কোমল কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'যে এই বইটা পড়ছে, এই ছবিটা তারই মার। এবার বুঝতে পেরেছ তো?'

'না।' ছেলেটি বলল।

মাস্টারমশাই এবার একটু অস্বস্তিতে পড়লেও অসহিষ্ণু না হয়েই বললেন, 'বুঝতে পারছ না কেন?'

'টেকোও তো এই বইটা পড়ছে। ওর মাকে মোটেই এই মেয়েটার মতো দেখতে নয়।' ছেলেটি বলল।

'টেকোর মা-র একটা হাত নুলো, একটা চোখ কানা।' সিয়াও লিন

জানাল।

'আর তোর তো কোন মা-ই নেই। অনেক দিন আগেই মরে গেছে।' টেকো আত্মরক্ষার চেষ্টা করে।

'নিজেদের মধ্যে কথা কইবে না!' ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর লাঠি ঠুকতে ঠুকতে মাস্টারমশাই ধমক লাগান। 'আজ আমরা দ্বিতীয় পাঠ শুরু করব—এই আমার বাবা। সবাই এদিকে দ্যাখো। এই যে মানুষটা দেখছ, চশমা চোখে, মাথার মাঝখানে সিঁথিকাটা—ইনিই হচ্ছেন বাবা।'

ইস্কুল ছুটির সময় থেকেই মা উদ্বিগ্ন হয়ে বসেছিল ছবির মেয়েটা কার মা জানবার জন্যে। কিন্তু মা শুনল তাঁর ছেলে সুর কেটে পড়ছে—'এই আমার বাবা।' মার আর ভয়ে প্রশ্ন করার সাহস রইল না পাছে স্বামী জানতে চায় যে কবে আবার তাদের পুত্রের জন্যে সে নতুন বাবা যোগাড় করল! মা আরো. তাজ্জব হয়ে ভাবতে লাগল, এ কেমন ধারা বই, যাদের বাবা-মা রয়েছে তাদেরও আবার জোর করে নতুন বাবা-মা এনে দিচ্ছে কেন!

কয়েক দিন পরে ছাত্রটি দুটো নতুন বাক্য শিখল ঃ 'ষাঁড়টা আগুন জ্বালাচ্ছে, ঘোড়াটা নুডুল্ খাচ্ছে'। হাজারবার পাঠগুলো পড়েছে কিন্তু তবু কেন যেন তার মনে হয় এই কথাগুলোর মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার রয়েছে। ওদের বাড়ি ষাঁড় আর ঘোড়া আছে, ও নিজে তাদের পাহাড়ে নিয়ে গেছে চরাবার জন্য, কিন্তু ঘোড়াকে কখনো সে নুডুল্ খেতে দেখেনি। তাছাড়া ষাঁড় যে আগুন জ্বালতে পারে না এ বিষয়ে সে নিশ্চিত। কিন্তু বইয়ে কি ভুল লিখতে পারে? এইসব প্রশ্নের কোন উত্তর না পেয়ে মাস্টার-মশাইয়ের গত সপ্তাহের নির্দেশ অনুযায়ী সে বাবাকে প্রশ্ন করতে বাবা বলল, 'আমি একবার শহরে একটা বিদেশী সার্কাসে গেছলাম। সেখানে দেখেছিলাম একটা ঘোড়া ঘণ্টা বাজাচ্ছে, বন্দুক ছুঁড়ছে। এই বইয়ে হয়তো ওই ধরনের ষাঁড় আর ঘোড়াদের কথাই বলেছে।'

ঠাকুমা অবশ্য বাবার বিশ্লেষণের সঙ্গে একমত হল না। ঠাকুমা বলল, 'এই ষাঁড় নিশ্চয় সেই ষাঁড়-মাথা শয়তান রাজা আর ঘোড়াটাও নিশ্চয় কোন দানব। দেখছ না, এরা মানুষের পোশাক পরে রয়েছে! এখনো এরা নিজেদের মাথা বদলে মানুষের মাথা ধরেনি, তার জন্যে আরো পাঁচশো বছর লাগবে।' বৃদ্ধা এরপরে গল্প ফাঁদল এমন সব শয়তানদের নিয়ে যাদের ডাক শুনে ঝড় ওঠে, বৃষ্টি নামে। গল্প শোনার ফল ফলল রাত্রিবেলা। ছেলেটি স্বপ্ন দেখল এক ডানাওলা নেকড়ে-দানব তাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে সে ঘুম ভেঙে উঠে বসল।

পরের দিন ছেলেটি মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করল, 'এই যে ষাঁড়টা

আগুন জ্বালাচ্ছে এটা কি বিদেশী ষাঁড় ?'

মাস্টারমশাই হাসতে হাসতে বললেন, 'তুমি একেবারে আক্ষরিক ভাবে চিন্তা করছ ! এগুলো কাল্পনিক ব্যাপার। ষাঁড়রা কখনো আগুন জ্বালাতে পারে না।'

এতদিন বই পড়ে অনেক বিষয়েই তার ভীষণ ধাঁধা লাগত. এবার তার অনেকগুলো পরিষ্কার হয়ে গেল মাস্টারমশাইয়ের এই এক ব্যাখ্যায়। বইয়ের মধ্যে সে পাউরুটি, দুধ, পার্ক, বল ইত্যাদি এমন অনেক জিনিসের নাম পড়েছে যা কোনদিন চোখেই দেখেনি। সেই জন্য দারুণ আশ্চর্য লাগত তার। এবার ও ধরতে পেরেছে এগুলো সবই বানানো ব্যাপার।

একদিন ছেলেটি আর তার ইস্কুলের বন্ধুরা ঠিক করল একটা চায়ের আসর বসাবে। বইয়ে ওরা এমনি আসরের কথা পড়েছে। সবাই কুড়ি সেন্ট করে চাঁদা দেবে ঠিক করল যাতে শহর থেকে কমলালেবু, আপেল বা চকোলেট জাতীয় খাবারদাবার আনানো যায়। আমাদের ছেলেটি অবশ্য হাড়ে হাড়ে জানতো যে মিষ্টি কেনার জন্য হাত পাতা মানেই প্রহারের ব্যবস্থা করা। ইস্কুলের লেখবার জন্য একটা কাগজ কিনতে হলেও ঠাকুমা গজগজ করেন যে, হতচ্ছাড়া ইস্কুল তাদের একেবারে পথে বসিয়ে ছাড়বে। ছেলেটি কিন্তু কিছুতেই বইয়ের পাতায় দেখা সেই নিদারুণ চায়ের আসরের ছবিটা ভুলতে পারে না। শেষ পর্যন্ত স্থির করে যে বাঁধাকপির চারা কিনতে হবে বলে মা তার আরো কিছু গয়নাগাঁটি বেচে যে ডলার ক'টা জমিয়ে রেখেছে তার ওপরেই সে দৃষ্টিদান করবে।

এদিকে ঠাকুর্দা অনেক দিন ধরে কাশির জন্য কষ্ট পাচ্ছিল। কার মুখে যেন কমলালেবুর খোসা খেলে কাশির উপশম হয় শুনে বুড়ো এখন বারবার জানতে চাইছে কমলালেবুর খোসা কি রকম দেখতে, কোথায় পাওয়া যায়। ঠাকুর্দার কৃপালাভ করার এই একটা মওকা সমঝে ছেলেটি বলল, 'আমরা কিছু কমলালেবু যোগাড় করছি।'

'তোরা কমলালেবু যোগাড় করছিস ?' ঠাকুর্দা প্রশ্ন করলেন। 'তা কমলালেবু যোগাড় করে হবেটা কি ?'

'আমরা একটা চায়ের আসর বসাতে চাই।' ছেলেটি বলল।

'চায়ের আসর মানে ?'

'চায়ের আসর মানে এক জায়গায় সবাই জড়ো হয়ে খাবারদাবার খাওয়া,

চা খাওয়া।' ছেলেটি বলল। 'বইয়েতেই রয়েছে।'

'এ কেমন ধারা বই! এই দেখছি জন্তুদের দিয়ে কথা বলাচ্ছে আবার এখন দেখছি লোককে শুধু খানাপিনা আর খেলাধুলো করতে শেখাচ্ছে! এবার আর বুঝতে বাকী নেই। এইজন্যাই ছেলেগুলো ইস্কুলে ভর্তি হবার পর থেকে অত কুঁড়ে হয়েছে আর খাবার দাবারের ব্যাপারে অত খুঁতখুঁতে!' ঠাকুমা বলল।

'আর সবই খালি বিদেশী খাবার। ভুট্টার ঝোল বা পেঁয়াজ দেওয়া বীনের দইয়ের কোন নাম গন্ধই নেই।' ঠাকুর্দা বলল।

'ঠাকুর্দার কাশির কথা মনে রাখিস, কমলালেবুর খোসা আনতে ভুলিসনি যেন।' মা বলল।

'কমলালেবুর দাম যোগাড় করলি কি করে?' বাবা এবার প্রশ্ন করল।

'মাষ্টারমশাই—' সবে গল্পটা শুরু করেছিল কিন্তু শেষ করার আর সুযোগ পেল না। তার আগেই টেকোর গলা পাওয়া গেল। টেকোরা ওদের বাড়ির পুব দিকে ঠিক পাশের বাড়িটাতেই থাকে। হঠাৎ কাঁদতে শুরু করেছে টেকো। পরক্ষণেই শোনা গেল তার বাবার চিৎকার, 'আমাদের বলে নুন কেনার মুরোদ নেই আর তুই চাইছিস ক্যাণ্ডি কিনতে?'

এরই যেন খেই ধরে সিয়াও লিনের কাকার গলা পাওয়া গেল। এরা ওদের পশ্চিম দিকের নিকটতম পড়শী। 'আমার রক্ত জল করা উপার্জন থেকে তোকে বই কিনতে দিয়েছি কারণ তাতে তোর উপকার হবে, তা বলে তোর মিষ্টি কেনবার জন্যে কিছু দেব ভাবিস যদি তো খুব ভুল করেছিস।'

এবার সব ফাঁস হয়ে গেল। বাবা লাথি কসাতেই পা তুলেছিল কিন্তু মাঝখানে টেবিলটা পড়ায় রক্ষা পেয়ে গেল। টেবিলটা ধাক্কা খেতেই কয়েকটা ভাতের বাটি মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। ঠাকুর্দা অভিমত দিল ইস্কুল থেকে ওকে ছাড়িয়ে নিলেই মঙ্গল হবে। কিন্তু ঠাকুমা চায় না তার সাধের ছেলেকে জেলে যেতে হোক। অনেক কথা কাটাকাটির পর ঠিক হল আরো কয়েকদিনের জন্য ওকে ইস্কুলে যেতে দেওয়া হবে।

এইভাবে অপদস্থ হয়ে তরুণ বিদ্যার্থী প্রতিজ্ঞা করল আরো মন দিয়ে পড়াশোনা করবে, পরিবারের মধ্যে তার হৃতসম্মান তাকে ফিরে পেতেই হবে। প্রতিদিন ইস্কুলের পর, যতক্ষণ পর্যন্ত দিনের আলো থাকে, সে নাগাড়ে পড়ে চলে। ও তো আর বুঝতে পারেনি যে সব অনর্থের মূল রয়েছে তার পাঠ্য পুস্তকের মধ্যেই।

ঠাকুমা এমনিতেই ভাবত যে বিয়ের পর থেকে তার ছেলে আর আগের মতো বাধ্যটি নেই। সংসারে তার কর্তৃত্ব বুঝি ক্রমশ ঢিলে হয়ে

আসছে। কাজেই তার নাতি যখন তার সর্বাধুনিক পাঠটি ঝালাতে বসল, ঠকুমা স্বকর্ণে শুনতে পেল সে গলা ছেড়ে পড়ছে, 'আমার বাড়িতে বাবা আছেন, মা আছেন, ভাই আছে আর আছে বোন।' ঠাকুর্দা বা ঠাকুমার সে কোন নামই করছে না। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ঠাকুমা চেঁচিয়ে উঠল, 'তাহলে এ বাড়িটা এখন তোদেরই হয়ে গেছে বল্‌? আমার আর এতে কোন অংশ নেই!' ক্ষেপে আগুন হয়ে একটা ইঁট হাতে নিয়ে বুড়ি একের এক লোহার পাত্রগুলোকেও গুঁড়িয়ে শেষ করে দিল।

'আর তোমায় রাগ করতে হবে না!' ছেলের বাবা বলল, 'আমরা আর ওকে এ ধরনের বই পড়তে দেব না। তার চেয়ে আমার জেলে যাওয়াও ভাল।'

স্বাভাবিক ভাবেই পরের দিন দেখা গেল, বাবা একজন দিন-মজুরকে ছাঁটাই করে দিয়েছে আর মাস্টারমশাই হাজিরা খাতায় ছাত্রটির নামের পাশে অনুপস্থিতের চিহ্ন বসিয়েছেন।

অনুবাদ / সিদ্ধার্থ ঘোষ

দ্বন্দ্ব ।। মাও তুন

ফ্লাইং ক্লাউড একটা গাধা বোটের পাশে বাঁধা। সাধারণত এই গাধা বোটটাকে বলা হয় "কম্পানী বোট"। বড়সড় বেতের চেয়ারটা সামনের ডেকে তৈরী করে রাখা আছে। দুজন বাহক ওটার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। জেটির সেই চিরাচরিত হট্টগোলটা নেই। যাত্রী-নামার মণ্ডটায় দাঁড়িয়ে জাহাজ কম্পানীর জনা কয়েক লোক অগ্রসরমান রিক্সাওলা আর ফেরিওলাদের দূরে সরাবার জন্য বেদম চেঁচাচ্ছে। উ-সুন-ফু আর তু দম্পতি যখন গাধা বোটের ডেকের ওপর দিয়ে পথ করে এগিয়ে আসছিল তখন একটা কেবিন বয় বৃদ্ধ মিঃ উ-কে ধরে ডেকে নিয়ে এসে বেতের চেয়ারটায় বসতে সাহায্য করছিল। ফু-শেংগ দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে বাহকদের নির্দেশ দিল চেয়ারটাকে উঠিয়ে বৃদ্ধকে সাবধানে গাধা বোটটায় আনাবার জন্যে। বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর ছেলে, মেয়ে আর জামাইয়ের সাক্ষাৎ হল। এই যাত্রার ফলে তাঁর কপালের পাশে কয়েকটা লাল চাকা চাকা দাগ ফুটে ওঠা ছাড়া আর কোন খারাপ কিছু হয়নি দেখে সবাই খুব স্বস্তি অনুভব করল। বৃদ্ধ ওদের দিকে একবার তাকিয়ে মাথাটাকে সামান্য নুইয়ে তারপর চোখ দুটো বন্ধ করে ফেললেন।

বৃদ্ধের চতুর্থ কন্যা হুয়েই ফ্যাংগ এবং সপ্তম পুত্র আ-সুয়ানও ফ্লাইং ক্লাউড থেকে গাধা বোটটায় নেমে এল।

'হুয়েই-ফ্যাংগ, পথে বাবা কেমন বোধ করছিলেন?' মিসেস তু তাঁর ছোট বোনকে অনুচ্চ স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'ভালই ছিলেন, অবশ্য বার বারই বলছিলেন কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করছেন।'

'তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে পড়।' উ-সুন-ফু অধৈর্য ভাবে বলল। 'ফু-শেংগ, শোফারকে নতুন গাড়িটা সবার আগে নিয়ে আসতে বল।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোককে মেয়েদের হেফাজতে রেখে উ-সুন-ফু, তু-চু-চাই আর আ-সুয়ান নামে কিশোরটি প্রথমে তীরে নামল। নতুন গাড়িটা আসা মাত্র বাহকরা আরোহী সমেত বেতের চেয়ারটাকে মাটিতে এনে নামাল। ওরা বৃদ্ধকে গাড়িতে বসাবার পর তু ওঁর পাশে এসে বসল। মহিলার গায়ের সেন্টের গন্ধে মনে হল বৃদ্ধের ঘুমটা যেন ভেঙে গেল। কে ওঁর

পাশে বসেছে দেখার জন্য চোখ খুলে নীচু কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'কে ? ফু-ফ্যাংগ ? হুয়েই ফ্যাংগ আমার সঙ্গে চলুক, আর আ-সুয়ানও যাবে।'

উ-সুন-ফু দ্বিতীয় গাড়িতে ছিল। কথাগুলো শুনে সামান্য একটু ভ্রূকুটি করল কিন্তু কিছু বলল না। ভাল করেই জানে ওর বাবা কিরকম বদমেজাজী আর জেদী। কথাটা চু-চাইয়েরও অজানা নয়। কাজেই হুয়েই-ফ্যাংগ আর আ-সুয়ান চাপাচাপি করে ওদের বাবার পাশে এসে বসল। ফু-ফ্যাংগ বাবার কাছ থেকে উঠে যেতে পারল না। যেখানে ছিল সেখানেই বসে থাকল। ফলে বাবাকে দুই মেয়ের চাপের মধ্যে বসে থাকতে হল। গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে সামনে এগোতেই বৃদ্ধ হঠাৎ তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠলেন, 'পুরস্কার আর শাস্তির মহত্তম ধর্মগ্রন্থটা ?' *

চিৎকারটা অদ্ভুত রকমের তীক্ষ্ণ। এক নিবু-নিবু দীপশিখায় যেন হঠাৎ তীব্র আলোর ঝলকানি। ওঁর প্রাচীন চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল, কপালের পাশে হালক লাল রঙয়ের চাকা চাকা দাগগুলো গাঢ় লাল হয়ে গেল আর ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল।

ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ব্রেকটা চেপে ভয়চকিত দৃষ্টিতে পেছনে তাকাল : অন্য গাড়ি দুটোও থেমে গেছে। কি ঘটেছে কেউ জানে না। কেবল হুয়েই ফ্যাংগ বুঝতে পারল বাবা কি চাইছেন। ফু-শেংগ এগিয়ে এসেছে দেখে ও বলল, 'ফু-শেংগ দৌড়ে কেবিনে গিয়ে হলদে দামস্কাস চামড়ায় মোড়া বইটা নিয়ে এস।'

পঁচিশ বছর আগে বৃদ্ধ মিঃ উ অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে চোট পান ফলে তিনি আংশিক ভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সেই থেকেই 'সৎকার্যের পুরস্কার এবং পাপের শাস্তি' শীর্ষক ধর্মপুস্তকে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। সৎকার্যের অঙ্গ হিসেবে তিনি প্রতি বছর সম বিশ্বাসীদের বিনামূল্যে এই বই দান করেন। তিনি স্বহস্তে পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র ভাবে এই বইয়ের অনুলিপি করেছেন। তাঁর কাছে এটাও এক সৎকার্যবিশেষ এবং সব সময়ই তিনি পাপের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচের মত এই বইটাকে সঙ্গে রাখেন।

ফু-শেংগ তাড়াতাড়ি বইটা নিয়ে এসে ভক্তিভরে তাঁর কোলের ওপর রাখল। উনি আবার চোখ দুটো বন্ধ করলেন, কোঁচকানো ঠোঁটে একটা অতি মৃদু হাসি ফুটে উঠল।

'ড্রাইভার চলো।' মিসেস তু শান্তভাবে হুকুম দিলেন। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ মৃদু হাসিমুখে পেছনের গদি-আঁটা কুশনটায় হেলান দিয়ে বসলেন। গাড়িগুলো বর্ধিত গতিতে পুব দিকে মোড় নিয়ে নর্থ সুচাও রোডের

---

* ধর্মীয় শাস্তি বিধান সম্বন্ধীয় একটি প্রাচীন পুস্তক।

মোড় ধরে, হ্যাংকাও ব্রীজ পেরিয়ে দক্ষিণে ঘুরল। সে যুগের ১৯৩০ সালের মডেলের গাড়ির পক্ষে সর্বোচ্চ গতি তুলে মিনিটে আধ মাইল হিসেবে ছুটে চলল।

প্রাচ্যের বিশাল নগরী সাংহাই-এর লোকসংখ্যা ত্রিশ লক্ষ। এহেন শহরের প্রশস্ত রাজপথে আধুনিকতম যান মোটর গাড়িতে চড়ে চলেছেন একজন আর তাঁর কোলের ওপর রাখা আছে 'শান্তি ও পুরস্কারের মহত্তম ধর্মপুস্তক' বইটা। বৃদ্ধের মন পড়ে আছে এই বইয়েরই একটি অংশে: "সকল পাপের মধ্যে যৌন ব্যভিচারই জঘন্যতম!" এও এক ভাগ্যের পরিহাস বৈকি! বৃদ্ধ মিঃ উ-র ক্ষেত্রে এই পরিহাসটা আরও লক্ষণীয় কারণ তাঁর বিশ্বাস এই পুস্তকের প্রতি তিনি অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ এবং তিনি সাংহাই শহরের সেই সব ধার্মিকদের মত নন যাঁরা ধর্মের নামাবলীর আড়ালে লোক ঠকান। তিরিশ বছর আগে বৃদ্ধ মিঃ উ এক রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন। সেই দল সংস্কারের জন্য আন্দোলন করত। ওঁর পিতা ও পিতামহ উচ্চ-পদস্থ রাজকর্মচারী হিসেবে সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তৎকালীন বৈপ্লবিক চেতনার অধিকারী ছিলেন এবং যুবক হিসেবে তখনকার পিতা এবং পুত্রের দ্বন্দ্বে সেই সমাজে সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন। যদি না তখন অশ্বারোহী বাহিনীতে প্রাত্যহিক ঘোড়ায় চড়া অভ্যেস করার সময় ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়তেন তা হলে হয়ত তিনি এমন করে "মহত্তম ধর্মগ্রন্থে" ডুবে যেতেন না। গত পঁচিশ বছর ধরে উনি ওঁর পড়ার ঘরের বাইরে যাননি। "পুরস্কার ও শান্তি বিষয়ক পুস্তক" ছাড়া অন্য কোন বই পড়েননি, বাইরের জগতে কোন ভাবেই জড়িত হননি। বর্তমানে তাঁর এবং তাঁর পুত্রের মধ্যে বিরোধ এক অতি বাস্তব সত্য। এক সময় তাঁর পিতাকে তাঁর কেমন এক খিটখিটে বদমেজাজী বৃদ্ধ বলে মনে হত, তাঁর ছেলের কাছে তিনি একেবারে তাই। ওঁর পড়ার ঘরটা হচ্ছে ওঁর দুর্গ আর ধর্মপুস্তকগুলো বর্ম। গত দশ বছর ধরে তিনি তাঁর পুত্রের সঙ্গে কোন শান্তি স্থাপন করাকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ করেছেন।

যদিও এখন তিনি একেবারে আধুনিকতম মোটর গাড়ি চড়ে যাচ্ছেন তার অর্থ এই নয় যে তিনি ছেলের ওপর নরম হয়েছেন। বরং তিনি বার বার ঘোষণা করেছেন তাঁর পুত্র ধর্মপথ ত্যাগ করে যে ঘৃণ্য জীবন যাপন করছে তা দেখার চেয়ে মৃত্যুবরণ করাও ভাল। তিনি কখনও সাংহাইতে আসতে চাননি, তাঁর ছেলেও অবশ্য এই নিয়ে জবরদস্তি করেনি। কিছুদিন যাবৎ স্থানীয় ডাকাতরা বড়ই তৎপর হয়ে উঠেছে আর আশেপাশের এলাকায় কমিউনিস্টরা একেবারে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ছে। উ-সুন-ফু

চিন্তা করল এই সময় বাবার পক্ষে দেশের বাড়িতে বসবাস করাটা আর কোনক্রমেই নিরাপদ নয়। এটা অবশ্যই তার পিতৃভক্তির নিদর্শন। ডাকাত কিংবা কমিউনিস্টরা যে তাঁর মত ধার্মিক বৃদ্ধের কোন ক্ষতি করতে পারে এটা কখনো তাঁর মনেই আসেনি। কিন্তু তিনি চলৎশক্তিরহিত, অন্যের সাহায্য ছাড়া শোয়া-বসাও করতে পারেন না। কাজেই ওরা যখন তাঁর দুর্গ দখল করে তাঁকে জাহাজে চড়িয়ে এবং সবশেষে এই মোটর গাড়ি নামক দৈত্যের গহ্বরে ঠেসে দিল তখন বাধ্য হয়ে রাজী হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিই বা করতে পারতেন তিনি। ঠিক পঁচিশ বছর আগে যেমন পক্ষাঘাত গ্রস্ত হয়ে সংস্কারকের জীবনে ইস্তফা দিয়ে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁর উপমন্ত্রী পিতার কাছে আত্মসমর্পণ করতে তেমনি সেই অভিশপ্ত অক্ষমতাই তাঁকে আজ তাঁর ধর্মীয় জীবনকে সংক্ষিপ্ত করে তোলার সংশয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করে তাঁর আধুনিক শিল্পপতি পুত্রের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করাল। এই ব্যথার কি কোন অন্ত নেই ?

অবশ্য "পুরস্কার এবং শান্তি বিষয়ক পুস্তক"টিকে তিনি এখনও তাঁর রক্ষক হিসেবে আঁকড়ে রয়েছেন। এখনও তাঁর পাশে আছে তাঁর সুযোগ্য পুত্র আ-সুয়ান এবং কন্যা হুয়েই-ফেং। কাজেই তিনি "পার্থিব স্বর্গ" সাংহাই শহরে প্রবেশ করলেও এখনো তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে তিনি তাঁর উন্নত মানসিকতাকে ধরে রাখতে পারবেন। অনেকক্ষণ আগেই তিনি মানসিক শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলেছিলেন। এতক্ষণে শান্ত আত্মবিশ্বাস নিয়ে জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করার জন্য আবার তিনি চোখ খুললেন। গাড়িটা পাগলের মত ছুটে চলেছে। উনি সামনের কাচ দিয়ে বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। ওরেব্বাস! গগনচুম্বী সব অট্টালিকার অসংখ্য আলোকোজ্জ্বল জানালাগুলো যেন দৈত্যের চোখের মত জ্বলজ্বল করছে। ওঁর মনে হল ওগুলো যেন ভীম বেগে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে আবার পরের মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে! সামনে বিছোন রয়েছে মসৃণ রাস্তা। দুধারের জ্বলন্ত বাতিগুলো নাচতে নাচতে এগিয়ে এসে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এক অন্তহীন আসা যাওয়া। সাপের মত কালো দৈত্যদের এক স্রোত, তাদের প্রত্যেকের সামনে এক জোড়া চোখ ধাঁধানো আলো, আর তাদের কর্কশ হর্নের শব্দ প্রচণ্ড বিরক্তি উৎপাদন করে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসছে। উনি ভয়ে কেঁপে উঠে চোখ দুটো শক্ত করে বন্ধ করে ফেললেন। তাঁর মনে হল মাথাটা ঘুরছে আর দৃষ্টি লাল, হলুদ, সবুজ কালো, উজ্জ্বল, চৌকো, লম্বা লম্ফমান নৃত্যশীল আকারের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে আর কর্ণকুহরে রাজ্যের গাড়িঘোড়ার হাঁকডাকের শব্দ যেন প্রাণ ওষ্ঠাগত করে

তুলছে। এইভাবে খানিকটা সময় কেটে যাওয়ার পরও যখন তেমন কোন দুর্ঘটনা ঘটল না, উনি চোখ দুটো কুঁচকে অল্প একটু খুলে তাকালেন। তাঁর পাশে গুনগুন করে কি আলোচনা হচ্ছে শোনার চেষ্টা করলেন।

—"হুয়েই ফেং, সাংহাইতেও আজকাল আর শান্তি নেই। গত মাসে বাস ধর্মঘট হয়েছিল, আর এখন চলছে ট্রাম ধর্মঘট। কিছুদিন আগে পিকিং রোডে কমিউনিস্টদের এক বিশাল জমায়েত হয়ে গেল। কয়েক শ' লোক গ্রেপ্তার হল, একজন তো ওখানেই গুলিতে মারা গেল। কিছু কমিউনিস্টের হাতে তো আবার অস্ত্রশস্ত্র ছিল! সুন-ফু তো বলে মজুরগুলো খুবই অশান্ত হয়ে পড়েছে আর যে কোন মুহূর্তেই নাকি গোলমাল কি দাঙ্গা বাধিয়ে বসতে পারে। ওর কারখানা আর বাড়ির দেওয়াল তো মাঝে মাঝে কমিউনিস্টদের লেখা স্লোগানে ছেয়ে যায়..."

—"পুলিস ওদের কাউকে গ্রেপ্তার করে না?"

—"কতকগুলোকে ধরেছে, কিন্তু সবাইকে তো ধরতে পারা যায় না! উঃ! সত্যি আমি বুঝতে পারি না ঐসব একরোখা লোকগুলো জোটে কোথেকে...কিন্তু যাই বল বাপু, তোমার এই সাজগোজ দেখে আমার হাসি পাচ্ছে। তোমার পোশাক দশ বছর আগের ফ্যাশন অনুযায়ী ঠিকই আছে কিন্তু এখন তুমি সাংহাইতে এসেছ, এখানকার ফ্যাশন তোমাকে মানতেই হবে। কাল সকালে প্রথমেই নতুন পোশাক করাবে।"

বৃদ্ধ মিঃ উ চোখ খুললেন। দেখলেন উনি যে রকম ছোট একটা বাক্স মার্কা গাড়িতে বসে আছেন আশেপাশে যেন সেই ধরনের গাড়ির এক সমুদ্র। সেই সমুদ্রের মধ্যে উনি স্থির হয়ে আছেন। আর একটু দূরে সার সার গাড়ি পরস্পরের উল্টো দিকে ছুটে চলেছে। গাড়িতে নানা ধরনের নারী পুরুষ। সব ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। দেখে মনে হয় যেন শয়তান ওদের তাড়া করেছে।

নানকিং রোড আর হোনান রোডের মোড়ে গাড়িগুলো ট্রাফিকের আলোতে আটকে পড়তেই একটা ডাণ্ডা থেকে সিঁদুরে রঙের আলো ওনার গায়ে এসে পড়ল।

—"ফু-ফ্যাং, আমি তো এখনও সুন-ফুর বৌকে দেখিনি।" হুয়েই-ফেং ফিস ফিস করে বলল, "আমাকে এরকম গেঁয়ো দেখে ও হয়ত হেসেই ফেলবে!"

হুয়েই-ফেং ওর বাবার দিকে একটা চোরা চাউনি নিক্ষেপ করে ওর চারদিকে মোটরে-বসা সব ফ্যাশানদার মেয়েদের দিকে চেয়ে দেখল। ফু-ফ্যাং খিল খিল করে হেসে উঠে রুমাল দিয়ে মুখটা চাপা দিল। বৃদ্ধের নাকে রাজ্যের সেন্টের গন্ধ যেন ও'র গা'টা গুলিয়ে দিল।

—"সত্যি হুয়েই-ফেং, তোমার ব্যাপারটা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। গত বছর যখন আমি দেশের বাড়িতে গিয়েছিলাম তখন কিন্তু তোমার মত এমন সেকেলে পোশাক কাউকেই পরতে দেখিনি।"

—"তা সত্যি, গাঁয়ের মেয়েরাও আজকাল সাজগোজ করে সুন্দর ভাবে থাকতে চায়। কিন্তু বাবা যে চান না..."

ফ্যাশান সম্বন্ধে আলোচনাটা বৃদ্ধের শিথিল মনটায় যেন ছুঁচের মত বিঁধছিল। ও'র বুকটা যেন থর থর করে কেঁপে উঠল এবং দৃষ্টি স্বাভাবিক ভাবেই ফু-ফ্যাংএর ওপর গিয়ে পড়ল। আর এই প্রথম ওর সাজপোশাকের দিকে তাঁর নজর গেল। যদিও এখন সবে মাত্র মে মাস, কিন্তু অস্বাভাবিক গরম পড়েছে আর ও ইতিমধ্যেই নিদারুণ গরমের সময়কার পোশাক পরেছে। ওর যৌবনোদ্ধত শরীরটা আঁটসাঁট নীল সিফনের পোশাকের ভেতর দিয়ে অতি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ওর সুগঠিত স্তন যুগল উদ্ধতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। তুষারধবল বাহুযুগল নগ্ন। বৃদ্ধ মিঃ উ-র হৃদয় বিরক্তিতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়ল। উনি তাড়াতাড়ি দৃষ্টি সরিয়ে বাইরে তাকাতেই রাস্তায় রিক্সার ওপর বসা এক অর্ধনগ্ন মেয়ের ওপর দৃষ্টি পড়ল। মেয়েটি স্বচ্ছ ভয়েলের হাল ফ্যাসানের ব্লাউজ পরে আছে। ওর পা এবং উরু দুটো অনাবৃত। বৃদ্ধ একটি মাত্র ভয়াবহ মুহূর্তের জন্য ভাবলেন ও বুঝি কিছুই পরেনি। সেই আপ্তবাক্যটি ও'র মনে পড়ে গেল—"সকল পাপের মধ্যে যৌন বিষয়ক শিথিলতা জঘন্যতম!" উনি কেঁপে উঠলেন। কিন্তু তখনও আরও বাকী ছিল, কারণ উনি তাড়াতাড়ি দৃষ্টি সরিয়ে দেখলেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আ-সুয়ান আগ্রহভরে সেই যুবতী মেয়েটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। বৃদ্ধ অনুভব করলেন ও'র বুক মারাত্মকভাবে ধক্ ধক্ করছে আর গলাটা এমন জ্বালা করছে যেন কেউ লঙ্কা বাটা ঢেলে দিয়েছে।

বাতিটা সবুজ হয়ে গেল। নানা রকমের যানবাহন আর মানুষের সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে গাড়িটা এগিয়ে গেল। ও'রা এগিয়ে চললেন। চারিদিকের শব্দ, পোড়া পেট্রলের গন্ধ, মেয়েদের সেন্টের সুবাস আর অপসৃয়-মান নিয়ন আলোর ঝলক এক দুঃস্বপ্নের মত তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে দিতে লাগল। কান ভোঁ ভোঁ করে উঠল, মাথার ভেতরটা ঝন ঝন করতে আরম্ভ করল আর শেষটায় ও'র ক্লান্ত স্নায়ুগুলো ব্যথিত হয়ে উঠল আর বুকটা দ্রুততম গতিতে ওঠানামা করতে লাগল।

সাঁই সাঁই শব্দ করে উনি নিশ্বাস নিতে লাগলেন কিন্তু চারিদিকের শব্দের মধ্যে না ফু-ফ্যাং, না হুয়েই-ফ্যাং কি আ-সুয়ান, কেউই তা শুনতে পেল না। তাঁর মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছল কিন্তু লাল সবুজ বাতির

আভায় কেউই সেই তফাতটা বুঝতে পারল না।

গাড়িটা দ্রুততম গতিতে ছুটে চলেছে। রাস্তার ধারের বড় বড় বাড়িগুলোর আলোকিত জানালাগুলো সরে সরে যাচ্ছে। বাইরে সন্ধ্যার মৃদু বাতাস বইছে। হুয়েই ফ্যাং যেন তার বুক থেকে একটা ভারি বোঝা নামিয়ে স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে আ-সুয়ানকে বলল—

—"এবার আমরা তাহলে সত্যি সত্যি সাংহাইতে বাস করতে এলাম। কিন্তু এখানে এমন কি আহামরি আছে যে সবাই এখানে আসতে চায়? আমার তো শহরের হট্টগোলে বিরক্তিই লাগে। মাথা ধরে যায়।"

—"একবার অভ্যেস হয়ে গেলেই দেখবে ভাল লাগছে।" ফু-ফ্যাং বলল।

—"সকলেই তো আজকাল গ্রামের দিকে ডাকাতের উৎপাত বেড়ে যাওয়াতে সাংহাইতে পালিয়ে এসে বসবাস করতে চাইছে। রাস্তার দু' ধারের বাড়িগুলো দেখছ, এগুলো তো এই দু বছরের মধ্যে গজিয়ে উঠল। কটা বাড়ি নতুন তৈরি হয়েছে সেটা বড় কথা নয়, আসলে সব সময়ই লোকে চলে আসতে চাইছে।"

মেয়েটি একটা লাল ব্যাগ খুলে একটা পাউডার প্যাক বের করে ব্যাগে আটকানো একটা ছোট্ট আয়নায় মুখটা দেখতে দেখতে ওটা মুখে বুলিয়ে নিল।

—"আমার কিন্তু মনে হয় গ্রামের দিকে এখনও বেশ শান্ত। ওখানে গণ্ডগোলের গুজবও কম। তাই না আ-সুয়ান?"

—"শান্ত? না, আমি একথা মানতে পারছি না। এই তো মাত্র হপ্তা দুই আগে আমাদের শহরে এক কম্পানী ফৌজ এল। আর এসেই চেম্বার অফ কমার্সের কাছে দাবী জানিয়ে বলল ওদের সেলাই ফোঁড়াই কাপড় কাচার জন্য লোক নাকি দরকার। কিন্তু চেম্বার অফ কমার্স বলল ওরা দিতে পারবে না। তখন ফৌজীরা নিজেরাই উঠে পড়ে যোগাড় করতে লেগে গেল। মনে নেই, আমাদের পাশের বাড়ির ফলওলার বৌটাকে ওরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল? আর, আমাদের ঝি'টা কয়েক দিন ভয়ে বাড়ির বারই হয়নি…"

—"বাবা, এত ভয়ঙ্কর কাণ্ড! অবশ্য সাংহাইতে আমরা জানতেই পারি না গ্রামে সত্যি সত্যি কি ঘটছে! আমরা শুনেছি কমিউনিস্টরা মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে কমিউনের সম্পত্তি করে ফেলছে।"

—"আমাদের ওদিকে কোন কমিউনিস্টকেই দেখিনি। তবে এই সৈন্য-গুলো আমাদের খুবই জ্বালিয়েছে।"

"ওঃ, আ-সুয়ান, কি বোকা তুমি!" ফু-ফ্যাং দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন। "অবশ্য তুমি কখনও কোন কমিউনিস্ট দেখনি। যদি দেখতে তাহলে

তোমাকে আর এখানে থাকতে হত না। চু-চাই বলছিল ওরা নাকি সব রকম নোংরামিতে সিদ্ধহস্ত। ওরা সব জায়গায় আছে। সমাজের সব জায়গাতেই ওদের দেখতে পাবে—কেউই ওদের ঠেকাতে পারছে না। আর যতক্ষণ না ওরা তোমাকে একেবারে শূন্য থেকে আক্রমণ করছে, তুমি ওদের অস্তিত্ব টেরই পাবে না।"

হুয়েই-ফ্যাং কথা শুনে ভেতরে ভেতরে দারুণ কেঁপে উঠল, কিন্তু আ-সুয়ান পুরো ব্যাপারটা বুঝে উঠতে না পেরে একটু হেসে মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে দিল। ও ফু-ফ্যাং-এর এই "ইচ্ছাশক্তি" বিশিষ্ট কমিউনিস্টদের কথায় খুবই মজা পেয়েছিল। ও মনে মনে ভাবল তাহলে কমিউনিস্টরা, একেবারে হাওয়া থেকে আক্রমণ করে? যেন একেবারে যাদুর খেলা! বাড়ির ছোট ছেলে বলে কথা, বয়সটা উনিশ বছর হলে কি হয়, ওর ছেলেমানুষি যায়নি, বাবার আদরের দুলাল।

সোফার গাড়ির হর্নটা বাজিয়ে একটা শান্ত ছায়াঘেরা রাস্তায় মোড় নিল। দু' ধারের গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রাস্তার আলো এসে পড়ে। ফু-ফ্যাং আর অন্যদের গায়ে আলোছায়ার জাফরি। বাড়িটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে গাড়ির গতিটা কমে এল। ফু-ফ্যাং ওর জিনিসগুলো গোছগাছ করে নিয়ে বাবাকে মৃদুস্বরে বলল—

—"বাবা, আমরা এসে গেছি।"

—"ঘুমিয়ে পড়েছেন।"

—"আ-সুয়ান, অমন করে চেঁচিও না। জানো ফু-ফ্যাং, বাবা যখন চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম করেন তখন উনি চান না কেউ বিরক্ত করুক।"

সোফার পর পর তিনবার হর্ন বাজাল। শেষের বারের রেশটা ধরে রেখে ওদের উপস্থিতিটা জানান দিল। বিদেশী ধাঁচের বাড়িটার সামনের কালো রঙের লোহার গেটটা সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল। গাড়িটা গড়িয়ে গড়িয়ে ভেতরে ঢুকল। আ-সুয়ান সঙ্গে সঙ্গে ওর আসনে সোজা হয়ে বসে দেখল গেটটার কাছে গুটিকয়েক চাকর আর একজন সশস্ত্র শান্ত্রী দাঁড়িয়ে। পেছনের গাড়িদুটো ওদের অনুসরণ করে এগিয়ে আসছে। তারপর আবার গেটটা বন্ধ হয়ে গেল আর গাড়িগুলো ঘন অন্ধকার ছায়াময় গাছের নীচ দিয়ে অ্যাসফ্যাল্ট মোড়া রাস্তা ধরে এগিয়ে এল। গাছের ফাঁক দিয়ে অল্প কয়েক টুকরো আলো ঝিকঝিক করছে। একটু এগিয়ে গাড়িগুলো একটা উজ্জ্বল আলোকিত তিনতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়িটার জানলা দিয়ে রেডিওর গানের শব্দ ভেসে আসছিল।

একজন দাসীর সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ঘোষণা করল—

"মাদাম ! মিঃ উ; ওঁর বাবা এবং অন্যরা এসে গেছেন।"

বৃদ্ধ মিঃ উ একটু আগেই তাঁর আচ্ছন্ন ভাবটা সামলে উঠেছিলেন। হঠাৎ সবিস্ময়ে চমকে চোখ খুললেন। সংবিৎ ফিরতেই প্রথমে যে কথা তাঁর মনে পড়ল তা হল তাঁর ছেলে আ-সুয়ান প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে রাস্তার সেই অর্ধ-নগ্ন মেয়েটিকে লেহন করেছে—আর তাঁর মেয়ে হুয়েই-ফ্যাং অনুযোগ করেছে—'এমন কি আজকাল গ্রামের মেয়েরাও সুন্দর করে সাজতে চায়, কিন্তু বাবা যে আমাকে…'

বৃদ্ধ বোঝেন তাঁর অমূল্য পুত্র কন্যারাও "পাপীর স্বর্গে" প্রবেশ করেই পালটে গেছে !

জানলা দিয়ে ভেসে আসা রেডিওর গান আর মেয়েদের হাসি থেমে গেল। তিনটি অন্ধকার মূর্তি এগিয়ে আসতে লাগল। ওদের পায়ের হিল-উঁচু জুতোর খুট খুট শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওদের মধ্যে একজন তন্বী এবং গোলাপী পোশাক পরিহিতা যুবতী তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে এগিয়ে এল। দ্রুত হাঁটার জন্যে মেয়েটির নিতম্বে দোলা লেগেছে। তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে মেয়েটি বলল, "বাবা, আসার সময় কোন অসুবিধা হয়নি তো ? ফু-ফ্যাং, এই বুঝি হুয়েই-ফ্যাং আর আ-সুয়ান ?"

বৃদ্ধ মিঃ উ সঙ্গে সঙ্গে উগ্র সেন্টের গন্ধে আবৃত হয়ে গেলেন এবং এক সুগন্ধ আচ্ছন্নতার মধ্যে, একটি একমাথা কোঁকড়ানো চুলের মধ্যে একটি গোলগাল সুচিক্কণ মুখমণ্ডল দেখতে পেলেন। এই মুখমণ্ডলের অধিকারিণীর চোখ উজ্জ্বল এবং অত্যুগ্র লাল ওষ্ঠদ্বয়ের মাঝখানে স্মিত হাসি সর্বদাই লেগে আছে। মহিলাটি তার মাথাটি ঈষৎ নত করে শিঞ্জিত স্বরে বলল—

—"সুন-ফু, তোমরা আগে ভেতরে চলে যাও। ফু-ফ্যাং আর আমি বাবাকে গাড়ি থেকে নিয়ে আসছি। হুয়েই-ফ্যাং, তুমি প্রথমে নেমে এস।"

বৃদ্ধ মিঃ উ তাঁর শেষ শক্তিটুকু প্রয়োগ করে মাথা নাড়লেন, কিন্তু কেউ লক্ষ্য করল না। হুয়েই-ফ্যাং সেই যুবতীটির চুলগুলোকে প্রায় ছুঁয়ে প্রথমে নেমে এল। ফু-ফ্যাং ওর ডান হাত বৃদ্ধের বাম হাতের নীচে গলিয়ে দিল নামতে সাহায্য করবে বলে। আ-সুয়ানও ওর হাতটা বাড়িয়ে দিল সাহায্যের জন্য। এইভাবে ওঁকে গাড়ি থেকে বের করে এনে সেই কোঁকড়া চুলওলা মহিলার হেপাজতে পৌঁছে দেওয়া হলে সে দু'হাত দিয়ে ওনার কোমর জড়িয়ে ধরল। উচ্চ হাসি এবং উগ্র সেন্টের গন্ধের মধ্যেও বৃদ্ধ তাঁর

"পুরস্কার এবং শাস্তি বিষয়ক পুস্তক"টা বুকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিলেন। তাঁর অত্যাচারদীর্ণ মনে শুধু একটা কথাই মনে হল—"এরা হয় দানব নয় শয়তান।"

অপরিমেয় বিরক্তি এবং ক্রোধ সম্ভবত বৃদ্ধকে এক অভূতপূর্ব শক্তি যুগিয়েছিল। তাই তিনি সহজেই তাঁর কন্যা এবং পুত্রবধূর বাহুবন্ধনীর মধ্যে থেকে নিজেকে মুক্ত করে সিঁড়ির ধাপগুলো বেয়ে নিজেই ওপরে উঠে এলেন। বড় বসবার ঘরটায় আলোর বন্যা, জনসমাগমে পূর্ণ। ঘরে ঢুকেই বৃদ্ধ মিস্টার উ-র সঙ্গে তাঁর জামাতার সাক্ষাৎ হল। তারপর দু'টি কোঁকড়া চুলের যুবতী তাঁর কাছে দৌড়ে এল। কুশল জিজ্ঞেস করার পর ওরা হাসতে হাসতে ওঁকে একটা উঁচু পিঠওলা আরাম-কেদারায় বসিয়ে দিল।

বৃদ্ধ চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলেন। বড় বড় চোখ দুটো ঘৃণা, ক্রোধ এবং উত্তেজনায় যেন জ্বলছে। মুখখানা আরক্তিম। উনি দেখলেন ঘরটায় আলো আর রঙের যেন ঘূর্ণি বয়ে চলছে। দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে তার বেগ। ওঁর কাছেই একটা অদ্ভুতদর্শন গোল চকচকে জিনিস এপাশ ওপাশ ঘুরে জোর হাওয়া ছেড়ে ওঁর নিশ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন একটা সোনালীমুখো ডাইনী মাথা নেড়েচেড়ে যাদু বিস্তার করছে। সোনালী চকচকে চাকতিটা যত ঘুরছে ততই যেন বড় আরো বড় হয়ে উঠছে আকারে, বড় হয়েই চলেছে। সমস্ত আকাশটাকে ছেয়ে না ফেলে যেন থামবে না। সব ক'টা লাল সবুজ আলো, যত আসবাব, নারী পুরুষ সবাই এই সোনালী আলো মেখে যেন নেচে চলেছে। গোলাপী পোশাকে মিসেস উ-সুন-ফু, আপেলের সব সবুজ পোশাকে এক মেয়ে, আর একজন মেয়ে হলুদ পোশাক পরে তাঁর চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নাচছে। হাল্কা রেশমী পোশাকে ওদের দেহের রেখাগুলো, ওদের গোলাপী আভা ছড়ানো স্তনগুলো, ওদের বাহুমূলের ছায়াগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমস্ত ঘর জুড়ে অসংখ্য স্তনের উত্তালতা, ওগুলো দুলছে, কাঁপছে আর তাঁর চারিদিকে নেচে বেড়াচ্ছে। উ-সুন-ফু-র দেহ ব্যাপারীর মন, দাঁত বের করা হাসি মুখটা, আর আ-সুয়ানের লোলুপ চোখ দুটো এই নৃত্যশীল স্তন-রাজ্যের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। অকস্মাৎ এই প্রকম্পিত, নৃত্যপরায়ণ স্তনগুলো যেন এক ঝাঁক তীরের মত বৃদ্ধ মিঃ উ-র ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর কোলের ওপর রাখা "পুরস্কার এবং শাস্তি বিষয়ক পুস্তক"টার ওপর জড় হতে লাগল। একটা প্রচণ্ড অট্টহাসিতে ঘরটা ভরে গেল—মনে হল সেই হাসিতে বুঝি ঘরটা ভেঙেই পড়বে।

—"শয়তান !" সোনালী আলোর স্ফুলিঙ্গগুলো তাঁর চোখের ওপর পড়তে চেঁচিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ মিঃ উ। তাঁর বুকে যেন এক বিশাল ভার চেপে বসেছে। আর মাথাটা বুঝি প্রচণ্ড ব্যথায় ফেটে পড়ছে।

হঠাৎ মাটি থেকে দুটি মহিলা লাফিয়ে উঠল, একজন মিসেস উ-সুন-ফু আর অন্যজন সেই আপেল-সবুজ পোশাক পরা মেয়েটি। দুজনেই রক্তমুখী হয়ে বিকট হাঁ করে হাসছে, যেন গিলে খেতে আসছে। কি যেন একটা হঠাৎ তাঁর মাথায় ভেঙে পড়ল বলে মনে হল। উনি চোখ ঘুরিয়ে নিলেন, আর তারপর, তারপর আর তিনি কিছু জানেন না।

—"কাকা আমাকে চিনতে পারছেন না ? আমি সু-সু, চ্যাং-সু-সু—" আপেল সবুজ রঙের পোশাক পরা মেয়েটা খিলখিল করে হেসে ওঠে কিন্তু মিসেস উ-সুন-ফু হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল। বৃদ্ধের জন্য আনা চায়ের কাপটা তার হাত থেকে খসে পড়ে গেল। সবাই চমকে উঠে দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্তের জন্য ঘরে পূর্ণ নিস্তব্ধতা। তারপরেই সবাই ছুটে এসে বৃদ্ধকে ঘিরে দাঁড়াল। সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে প্রশ্ন করে উঠল। বৃদ্ধকে মৃতের মত বিবর্ণ দেখাচ্ছে, মাথাটা এক পাশে ঝুলে পড়েছে আর মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে। "পুরস্কার ও শাস্তি বিষয়ক পুস্তক"টা সশব্দে মেঝেতে পড়ে গেল।

—"বাবা ! কি হয়েছে ? উঠুন, উঠে পড়ুন !" মিসেস তু বাবার মাথাটা হাতে তুলে ধরে কম্পিত গলায় চেঁচিয়ে উঠল। ওর স্বামী তু-চাই দারুণ ভয় পেয়ে পত্নীর ঘাড়ের ওপর দিয়ে তাকিয়ে রইল।

উ-সুন-ফু বাবার হাতটা ধরেই বসে রইল। তারপর অনেকগুলো চাকর এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে দেখে রাগে চিৎকার করে উঠল—

—"যাও—বেরিয়ে যাও সব কটা, জলদি গিয়ে একটা আইস ব্যাগ নিয়ে এস।"

—"একটা আইস ব্যাগ, জলদি একটা আইস ব্যাগ আন !" চাকরগুলো তাড়াতাড়ি একটা ব্যাগ যোগাড় করার জন্য বেরিয়ে যেতে যেতেই চেঁচিয়ে উঠল। "বুড়ো মিঃ উ'র স্ট্রোক হয়েছে !"

হালকা হলদে পোশাক পরা মেয়েটা চ্যাং-সু-সুকে পাকড়াও করে জিজ্ঞেস করল—"সু-সু, কি হয়েছে ? তুমি তো ওঁকে অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখলে তাই না ?"

চ্যাং-সু-সু নির্বাক দাঁড়িয়ে দেখছিল। ওর বুক দ্রুত ওঠা নামা করছিল। মিসেস উ-সু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—"আমি বাবার জন্য এক কাপ চা নিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, দেখলাম ওঁর মাথাটা ঝুলে পড়েছে—চোখ

বন্ধ হয়ে আসছে—মুখ দিয়ে ফেনা বেরচ্ছে—মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। একে কি স্ট্রোক বলে? নাকি হাঁপানি? হুয়েই-ফ্যাং, এর আগে কি বাবার কখনও এমন হয়েছে?"

ফু-ফ্যাং ওর বাবার ওপরের ঠোঁটটায় চিমটি কেটে হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর গাল বেয়ে চোখের জল ঝরছিল। ফু-ফ্যাং মিসেস উ-সুনের প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি করল—"হুয়েই-ফ্যাং, বাবার কি এর আগে কখনও এমন হয়েছিল? হয়েছিল? বল না?"

—"না, না, স্ট্রোক হয়নি, গলায় কফ আটকে গেছে। কাশলে পরে ভয়ের কিছু নেই। একবার দুবার কাশলেই জ্ঞান ফিরে আসবে।"

এই রোগ নির্ণয়টা তু-চু-চাই-এর। ভদ্রলোক উ-সুন-ফু-র দিকে তাকিয়ে, ভীত ভাবে নস্যির কৌটোটা উ-সুন-ফুকে এগিয়ে দিল। উ-সুন-ফু চাকরদের দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড রাগের সঙ্গে বলে উঠল—

—"অনেক লোক এখানে ভিড় করেছে। তোমাদের গায়ের গরমই এই বৃদ্ধ মানুষটার দম বন্ধ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।"

—"আইস ব্যাগটার কি হল?...পেই-ইয়াও, তোমার এখানে কোন দরকার নেই, যাও, ডাঃ তিং-কে ফোন কর। ওয়াং-মা, দৌড়ে একটা আইস ব্যাগ নিয়ে এস। ঘাবড়িও না ফু-ফ্যাং। বাবার বুকটা এখনও ধকধক করছে। কিন্তু ওঁকে এই চেয়ারে বসিয়ে রাখাটা ঠিক হবে না। ধরাধরি করে ওই কৌচটাতে নিয়ে যাওয়া যাক।" বৃদ্ধ মানুষটিকে ওঠাবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে সে হাত দুটো দিয়ে বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরল। অন্যরাও সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। বৃদ্ধ মিঃ উ-কে যখন ভেলভেট মোড়া কৌচে শোয়ানো হচ্ছে মিসেস উ-সুন-ফু টেলিফোন করে ফিরে এসে জানাল যে ডাক্তার মিনিট দশেকের মধ্যে উপস্থিত হবেন। ইতিমধ্যে ওঁকে কোন রকম বিরক্ত না করে একটা শান্ত ঘরে শুইয়ে রাখতে হবে। একজন দাসী একটা আইস ব্যাগ নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে উ-সুন-ফু সেটা বৃদ্ধের কপালে চেপে ধরে দরজার কাছে দাঁড়ানো অন্য একজন চাকরের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল—"বৃদ্ধ মিঃ উকে ছোট বসবার ঘরটায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কয়েকজনকে ডেকে নিয়ে এস। যে কোন সময় ডাক্তার আসবেন, দারোয়ানকে ওঁর জন্য অপেক্ষা করতে বল।"

হঠাৎ বৃদ্ধের হাতটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। গলাটা ঘড় ঘড় করে উঠল। মুখ দিয়ে খানিকটা কফ বেরিয়ে এল। —"যাক, ভাল হয়েছে।" কয়েকটা কণ্ঠস্বর স্বস্তির সঙ্গে বলে উঠল। মিসেস উ-সুন-ফু একটা সাদা রুমাল দিয়ে বৃদ্ধের মুখটা মুছিয়ে দিয়ে স্বামীর দিকে একটা ভয় মেশানো দৃষ্টি

নিক্ষেপ করল। বৃদ্ধের কপালের দু' পাশের রগ দুটো ফুলে নীল রেখার মত দেখাচ্ছে। গলার ঘড় ঘড় শব্দটা আরও জোর হয়েছে। মুখ দিয়ে ক্রমাগত ফেনা বেরচ্ছে। হঠাৎ ওঁর হাতটা আবার একটা জোর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। মুহূর্তের জন্য চোখের পাতা দুটো কেঁপে উঠে আধখোলা অবস্থাতেই থেকে গেল।

—"ওঃ, ডাক্তার তিং এত দেরী করছেন কেন? চল, বাবাকে বরং অন্য ঘরে নিয়ে যাই।" উ-সুন-ফু অধৈর্য ভাবে হাতদুটো ঝাঁকিয়ে বিড়বিড় করে উঠল। বৃদ্ধ যে কৌচটায় শুয়েছিলেন সেটা উঠিয়ে ছোট ড্রয়িংরুমে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাছে যে চারজন চাকর দাঁড়িয়েছিল তাদের দিকে সে ইশারা করল। ভদ্রলোক ও তার স্ত্রী তু-চু-চাই, ফু-ফ্যাং আর হুয়েই-ফ্যাংকে অনুসরণ করলেন। আ-সুয়ান এতক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল। এবার ভীতভাবে চারিদিকে তাকিয়ে পার্লারে এসে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

বড় ড্রইংরুমের বাকী লোকদের ওপর একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এসেছে। চ্যাং-সু-সু একটা বড় বিলাসবহুল রেডিওগ্রামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা "পুরস্কার এবং শাস্তি বিষয়ক পুস্তক"টার দিকে বিমর্ষ ভাবে তাকিয়ে আছে। দুজন যুবক মাথায় হাত দিয়ে বসে সিগারেট টানতে অন্য ঘরের দরজার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে।

ঘরে মৃদু আলোটা তখনও জ্বলছিল আর সোনালী চাকতিওলা ফ্যানটা এদিক থেকে ওদিকে ঘুরে সবাইকে শীতল বাতাস বিতরণ করছিল। যে লোকগুলো খানিকক্ষণ আগেও আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করছিল এখন তারাই কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করছে।

হালকা সবুজ রঙের পোশাক পরা মেয়েটা পিয়ানোর সামনে বসে ধীরে ধীরে একটা স্বরলিপি বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিল। ওকে অনেকটা মিসেস উ-সুন-ফুর মত দেখতে, আসলে মেয়েটি ওর ছোট বোন লিন-পেই-শান।

চ্যাং-সু-সু এতক্ষণ গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিল। হঠাৎ যেন ওর কি মনে পড়ল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে দেখছে, কাকে যেন খুঁজছে তারপর ওর দিকে লিন-পেই-শান-এর নজর পড়তে দ্রুত ওর কাছে ছুটে এসে ফিস ফিস করে বলল—"পেই-শান, আমার মনে হচ্ছে বৃদ্ধ মিঃ উ শেষ হয়ে গেছেন। আমি লোককে—"

ওর এই কথা শুনে সোফা থেকে দুজন যুবতী প্রায় লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ওর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

লিন-পেই-শান দাঁড়িয়ে উঠে ইতস্তত করে বলল—"তুমি কি করে একেবারে স্থির নিশ্চিত হলে?"

—"কি করে মানে ? আমি কি এই প্রথম একজনকে মরতে দেখছি !"

কয়েকেটা চাকর চ্যাং-সু-সুর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। ওর কথা শুনে তারা না হেসে পারে না। কিন্তু চ্যাং-সু-সু দৃঢ় মুখভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। গলার স্বরটা নীচু করে রহস্যজনক ভাবে বলল—

—"তোমরা কি ভাবছ ও'র মুখ দিয়ে কফ বেরচ্ছিল ? মোটেই না ! ফেনা বেরচ্ছিল। গরমের সময় লোক যখন মরে তখন ঠিক এমনি ভাবেই ফেনা বেরোয়। আমি জানি। আমি দেখেছি। আজ কি গরম কম নাকি ? আশি ডিগ্রি, আর আজ তো সবে ষোলই মে। ঠিক কি না বল !"

চ্যাং-সু-সু দুজন লোকের মধ্যে একজনের দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন সে ওর কথার সমর্থনই করবে। লি-ইউ-তিং লম্বায় মাঝারি গোছের, মুখটা ছুঁচলো আর চোখে মোটা লেন্সের চশমা। ইউ-টিং ওর কথায় হ্যাঁ-না কিছু না বলে একটা এড়িয়ে যাওয়ার হাসি হাসল। চ্যাং-সু-সু মোটেই খুশী হল না। ও ইউ-তিং-এর দিকে বিরক্তি ভরা চোখে তাকিয়ে লাল টুকটুকে ঠোঁটটা বেঁকিয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে বিড় বিড় করে উঠল—"হুড়োহুড়ির মধ্যেও আমার ভুল হবার কথা নয়। শিক্ষকরা সাধারণত মেরুদণ্ডহীন হয়। আর তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা তো আরও এক কাঠি। তোমাদের ছাত্ররা তাদের মনের চিন্তা সোজাসুজি প্রকাশ করে দেয় কিন্তু তোমরা চাও মাঝ রাস্তায় থাকতে। কিন্তু প্রফেসর, আমরা তো এখন ক্লাসে নেই—মিঃ উর বাড়িতে আছি।"

লি-ইউ-টিং মৃদু হাসিটা থামিয়ে গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করল। অন্য পুরুষটি, যার নাম ক্যান পো উহান, লিন-পেই-শান-এর পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। ও পেই-শানের কানে ফিস ফিস করে কিছু বলল। পেই-শান বুলেটের মতো দৃষ্টি নিক্ষেপ করল চ্যাং-সু-সুর দিকে। চোখটা বুলিয়ে কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে বলে উঠল, "তোমরা দু'জন শুরু করেছ কি ? আমার আড়ালে যত গুজগুজ ফুসফুস। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।"

লিন-পেই-শান খিলখিল করে হেসে খানিকটা দূরে সরে গেল। পাছে চ্যাং-সু-সু ওকে কাতুকুতু দেয় সেজন্য হাত দুটোকে ঠেকাবার ভঙ্গী করে সেই যুবকটির কাছে আবেদন করল—"ঝামেলা পাকিয়ে এখন মজা দেখছ—পো উয়েন !"

ঠিক সেই সময়েই ওরা একটা গাড়ির হর্ন আর তার এগিয়ে আসার শব্দ শুনল। বিদেশী পোশাক পরা একজন লম্বা মধ্যবয়সী লোক সাদা পোশাক পরা দুজন নার্সকে নিয়ে দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকলেন। একটি নার্সের হাতে একটা গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ। চ্যাং-সু-সু উঠে দাঁড়িয়ে আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল—"কেমন আছেন ডক্টর তিং ? রোগী ছোট ড্রইংরুমটায় আছেন।"

চ্যাং-সু-সু অন্য ঘরটার সামনে গিয়ে নিঃশব্দে ডাক্তার এবং নার্সের জন্য দরজাটা খুলে ধরল, তারপর নিজেও ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

মুখের ওপর এসে পড়া চুলগুলো সরিয়ে লিন-পেই-শান ওর বোনকে বলল—"দেখলে, ডাক্তারের গাড়ি কত তাড়াতাড়ি এল। যেন ফায়ার ব্রিগেড।"

—"আহা, ও'র কাজই তো তাই। ভুলে যেও না উনি চান মানুষটার মধ্যে প্রাণের আলো জ্বালিয়ে দিতে, নিভিয়ে দিতে নয়।"

—"আবার তুমি কাব্য শুরু করলে? উঃ!"

ফ্যান-কো-ওয়েন-এর দিকে একটা বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করে অন্য ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজাটা খুলে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল চ্যাং-সু-সু। তারপর একটা নার্স বেরিয়ে এসে এক চাকরকে ইশারায় ডেকে, জল নিয়ে আসবার জন্য একটা এনামেলের গামলা হাতে তুলে দিল। ও আবার ঘরের ভেতর ঢুকে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

সবাই উৎসুক চোখে চ্যাং-সু-সুর দিকে তাকাল। ও নিঃশব্দে মাথাটা ঝাঁকিয়ে রোজ-উড টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে লিন-পেই-শান আর অন্যদের সামনে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে বলল—

—"ডাঃ তিং বলছেন সেরিব্রাল হেমারেজ আর অতি উত্তেজনাই নাকি এর কারণ। উনি এখনও কোন ভরসা দিতে পারছেন না। কল্পনা কর উত্তেজনাই হল কারণ।"

ওরা নিঃশব্দে দৃষ্টি বিনিময় করল। লি-উ-তিং যেন বিপর্যস্ত চ্যাং-সু-সুকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই খানিকক্ষণ পরে প্রতিধ্বনি করল—"কল্পনা কর।"

অবশ্য আমার কাছে ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত লাগছে না। বৃদ্ধ মিঃ উ র পক্ষে উত্তেজিত হয়ে পড়াটা স্বাভাবিক। শুধু একবার চিন্তা কর গ্রামের সেই শান্ত পরিবেশে বাস করাটা ওঁর পক্ষে কতখানি ছিল। প্রায় গত বিশ বছর উনি ওঁর বাড়ির বাইরে যাননি। ওঁর বাড়ির ঘরটা প্রায় একটা জ্যান্ত কবরের মত ও'কে আটকে রেখেছিল। আর আজ হঠাৎ সাংহাইতে এসে নানা রকম শব্দ গন্ধ দৃশ্য দেখে ও'র পক্ষে উত্তেজিত হয়ে পড়া স্বাভাবিক। ও'র শরীরটাও বেশ কয়েক বছর ধরে ভাল নয়—এমন অবস্থায় সেরিব্রাল হেমারেজ হওয়াটা আর এমন কি আশ্চর্য ব্যাপার।"

ফ্যান-পো-ওয়েন মেয়েলি গলায় কথাগুলো বলল। ও একবার লিন-পেই-শানের দিকে তাকাল। ওর কাছ থেকে একটা বিপর্যস্ত মৃদু হাসি ফিরে এল। চ্যাং-সু-সু সেটা লক্ষ্য করে ইচ্ছে করেই ব্যঙ্গ করে উঠল:

—"রাজকবি ! তুমি এখন একজনের মৃত্যুকে নিয়ে কাব্য করছ !"

—"মিস চ্যাং, আমি হয়ত খুব দুঃখজনক একটা বিষয়ের অবতারণা করেছি। কিন্তু তা বলে আপনার কাছ থেকে এরকম কথা আশা করিনি।"

—"ঠিক আছে। আপনি তাহলে আপনার লিন পেই শানকে একান্তে ডেকে কথাগুলো বলুন।"

এবার লিন পেই শানের লজ্জায় আরক্তিম হবার পালা। ও নাক দিয়ে একটা শব্দ করে বিরক্তির ভঙ্গি করে এগিয়ে গেল। ওকে অনুসরণ করল ফ্যান-পো-ওয়েন। চ্যাং-সু-সু ভ্রূ কুঁচকে একবার দেখে রোজ-উড টেবিলটাকে ঘিরে পায়চারি জুড়ে দিল আর লি উ-তিং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাল ঘষতে লাগল। ঘরে একটা বিচ্ছিরি নৈঃশব্দ। শুধু পাখাটাই যা একটানা সোঁ সোঁ করে চলেছে আর মাঝে মাঝে রাস্তার গাড়ির হর্ন শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এই শব্দগুলোও যেন কেমন ভোঁতা মনে হচ্ছে। দরজার কাছে কয়েকজন চাকর দাঁড়িয়ে, আর ওয়াং-উম আর একজন দাসী প্রায় নিঃশব্দে ফিসফিস করে কথা বলছে।

ছোট ড্রইংরুমের দরজাটা খুলে ডাক্তার তিং-এর লম্বা শরীরটা বেরিয়ে এল। পেতলের টেবিলের ওপরে রাখা সিগারেট কেসটা তুলে নিয়ে উনি একটা সিগারেট ধরিয়ে আরাম-কেদারাটায় বসে পড়লেন।

ডাক্তারের কাছে এগিয়ে গিয়ে চ্যাং সু-সু নরম গলায় জিগগেস করল— "কেমন আছেন উনি ?"

—"ভাল না, এই মাত্র একটা ইনজেকশন দিলাম।"

—"আপনার কি মনে হয় এই রাত্রিটা উনি টিকবেন না ?"

—"তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

ডাঃ তিং সিগারেটটা ফেলে পাশের ঘরে চলে গেলেন। চ্যাং-সু-সু মৃদু পদক্ষেপে দরজার কাছে গিয়ে ওটাকে বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল তারপর দৌড়ে লিন-পেই-শানের কাছে ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে মুখে মুখটা লাগিয়ে বলল—"ওঃ, পেই-শান ! আমার ভারি খারাপ লাগছে ! একটা মানুষ মরে যাচ্ছে, এমন হঠাৎ মরে যাচ্ছে, আমি সহ্য করতে পারি না ! আমি মরতে চাই না—মরব না !"

—"আমাদের সবাইকেই তো একদিন যেতে হবে।"

—"না পেই-শান, আমি যাব না, আমি মরব না।"

—"তাহলে তুমি অন্যদের চেয়ে আলাদা। বুড়ো হয়ে গেলে তুমি সাপের মত খোলস ছেড়ে আবার কচি হয়ে যাবে! সে যাক আমাকে অমন করে জাপটে ধরো না। দেখ দেখি চুলটা কেমন ঘেঁটে দিলে! আঃ, ছাড় না!"

—"তার জন্য চিন্তা কি! সে তো কাল তুমি যে কোন বিউটি পারলারে ঠিক করে নিতে পারবে। শোন পেই-শান—আমাকে যদি মরতেই হয় আমি কিন্তু মরব অতি উত্তেজনায়।"

লিন-পেই শান বিস্ময়ে চমকে চ্যাং-সু-সুর চোখের দিকে তাকাল; ওর চোখদুটো উত্তেজনায় চকচক করছে। এরকমটা ও আগে কখনও দেখেনি।

—"উত্তেজনায় মৃত্যু! হ্যাঁ, আমার মনে হয় এটাই বোধহয় মারা যাবার সবচেয়ে সুন্দর উপায়। কিন্তু আজ এই বৃদ্ধ যে জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, আমি কিন্তু তেমন কোন উত্তেজনা চাই না। আমি চাই এক দারুণ বিস্ময়কর উত্তেজনা, যেমন ধর ঝড়, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প অথবা এমন একটা কিছু যাতে পুরো জগৎটাই ওলটপালট হয়ে যায়। একটা বিশাল কিছু!"

এই উচ্ছ্বাসের পর চ্যাং-সু-সু লিন-পেই-শান-এর কাছ থেকে সরে এসে দুই হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে একটা দোলনা চেয়ারে বসে পড়ল।

লি-ইউ-তিং আর কা-পো-ওয়েন কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওর কথা শুনে ওরা হেসে উঠল। মনে হল চ্যাং-সু-সুর উচ্ছ্বাস এবং তারপর ওর চুপ করে যাওয়ায় ওরা খুব মজা পেয়েছে। সব দেখে শুনে লিন-পেই-শান ওর চিন্তায় ডুবে গেল। তারপর ক্যান-পো-ওয়েন কাছে গিয়ে ওর হাতটা ধরতেই ও চমকে উঠল। ক্যান-পো-ওয়েন হাতটা ধরেছে দেখেই ও নিবিড় একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। ক্যান-পো-ওয়েন ওর বুড়ো আঙুলটা দিয়ে চ্যাং-সু-সুকে দেখিয়ে ফিসফিস করে বলল—

—"বুঝতে পারছ তো সু সুর গণ্ডগোলটা কোথায়! ওর উত্তেজনার খুব প্রয়োজন। কিন্তু নিরীহ প্রফেসর তার কিছুই দিতে পারে না। সে যাকগে, ও যা বলল তাতে বোঝা গেল ওর মধ্যে কাব্যপ্রতিভা আছে।"

লিন-পেই-শান প্রথমটা হাসছিল। কিন্তু ওর শেষের কথাগুলো শুনে ও একটা শীতল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নাক দিয়ে শব্দ করে ক্রুদ্ধভঙ্গিতে সরে গেল। ওর কথায় লিন-পেই-শান ভুল ভেবেছে বুঝতে পেরে ক্যান-পো-ওয়েন তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ওর কাঁধটা ধরল। কিন্তু লিন-পেই-শান কাঁধটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে ঢুকে ওর নাকের ওপর বন্ধ করে দিল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে ও দরজাটা ঠেলা দিল। দরজা হাট হয়ে খুলে যেতেই ও চেঁচিয়ে ডাকল—"পেই-শান!"

দরজা খোলার শব্দে সচকিত হয়ে চ্যাং-সু-সুর আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। চোখটা ওপরে তুলেই ও নামিয়ে নিল। ওর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ওর সামনে নীচু টেবিলে রাখা দামাস্কাসের মলাটে মোড়া "পুরস্কার ও শাস্তি বিষয়ক পুস্তক"টার ওপর। বইটা তুলে উঁচুমানের চীনা কাগজে ঝকঝকে হরফে ছাপা বইটার পাতা ওলটাতে লাগল। এক জায়গায় হঠাৎ বৃদ্ধ মিস্টার উ-র লেখা একটা মন্তব্য ওর চোখে পড়ল ঃ

"পুরস্কার ও শাস্তি বিষয়ক পুস্তক"-এর হাজার হাজার কপি পুণরমুদ্রিত করে আমি আমার সমবিশ্বাসীদের মধ্যে বিতরণ করেছি এবং পুরো বইটার অনুলিপি করেছি স্বহস্তে··· ।"

চ্যাং-সু-সু হাসিতে ভেঙে পড়ে মন্তব্যটা জোরে জোরে পড়তে যাচ্ছিল এমন সময় কে যেন ওর পেছন থেকে বলে উঠল—

—"উনি এমন একজন লোক ছিলেন যঁার সম্বন্ধে বলা যায় যে তাঁর একটা বিশ্বাস ছিল এবং সারাটা জীবন সেই বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়ে গেছেন।"

কথাটা বলছিল লি-উ-তিং। ও একটা চেয়ারের পিঠটা ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল। হাতে জলন্ত সিগারেট।

চ্যাং-সু-সু ঘাড়টা ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল। তারপর আবার বইটার দিকে দেখল। একটু পরে বইটা কোলের ওপর রেখে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—

—"আচ্ছা উ-তিং, কোন্ ধরনের সমাজে আমরা বাস করছি ?"

লি-উ তিং এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে অবাক হয়ে গেলেও অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে ওর জবাব দিতে কোন অসুবিধে হল না।

—"তোমার প্রশ্নের জবাবটা খুবই লম্বা। তবে এর জবাবটা তুমি পাশের ঘরেই পেয়ে যাবে। ওখানে তুমি 'অর্থ বিনিয়োগকারী' এবং শিল্প জগতের একজন নেতাকে দেখতে পাবে। ওই ছোট্ট ড্রয়িংরুমটা চীনা সমাজের একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।"

—"কিন্তু ওখানে একজন ধার্মিক লোকও আছেন। "পুরস্কার এবং শাস্তি বিষয়ক পুস্তক"-এ তঁার অগাধ বিশ্বাস।"

—"হ্যাঁ আছেন, কিন্তু তিনি বৃদ্ধ, অচিরেই মারা যাবেন।"

—"কিন্তু ভগবানই জানেন, আমাদের সমাজে তাঁর মত কত লোক আছেন।"

—"তার জন্যে চিন্তা করার কোন কারণ নেই। কারণ এরা সাংহাইয়ে পৌঁছলেই নির্ঘাৎ পটল তুলবে। এই ধার্মিক বৃদ্ধ যখন গ্রামে বাস করতো

তখন তার অস্তিত্বটা ছিল একটা মমির মতো আর গ্রামটা ছিল সেই মমির কবরখানা। এই কবরখানার মধ্যে তার দেহটা সহজে পচতে পারছিল না। আধুনিক সাংহাইয়ে এসে তার সেই পচার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। বুড়ো খতম হয়ে গেছে এবং বাঁচা গেছে। সেকেলে চীনের একজন মমিও যদি কমে তো সেও মঙ্গল। সেকেলে চীন নিজেও একটি মমি, পাঁচ হাজার বছর বয়স তার। এবার সেকেলে চীনও দ্রুত বেগে পচতে শুরু করেছে। সে আর বেশী দিন এই নতুন যুগের ঝড়ের মোকাবিলা করতে পারবে না।"

অনুবাদ / প্রকাশ চন্দ

* মিডনাইট উপন্যাসের অংশ

শারদ রাত্রির শান্তি

ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা সবে থেমেছে। পাহাড়ের ওপর দিয়ে প্রবল বেগে বয়ে চলেছে তুষার ঘূর্ণিঝড়। শরৎ কালের নিয়ম মাফিক পাহাড়ী এলাকার কনকনে ঠাণ্ডায় জমাট বাঁধা থমথমে রাত। রাস্তাঘাট জনমানবশূন্য, স্পন্দনহীন। বিশেষ করে কর্পোরেশন অফিস পাড়াটা। দুর্গম জনমানবশূন্য নির্জন প্রান্তরে ছোট্ট শহরটার সামনে দিয়ে ফুলে ফুঁসে গর্জন করে বয়ে চলেছে একটা নদী, আর শহরটার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সুউচ্চ পর্বত শ্রেণী। এমন কি, ভালো আবহাওয়া থাকলেও শহরের কর্পোরেশন অফিসের আকর্ষণীয় বিশাল ফটকটি বন্ধ হয়ে যাবার পর রাস্তাঘাটে জনপ্রাণীর দর্শন মেলা ভার।

মুহূর্ত খানেক আগেও, এককালের প্যারেড গ্রাউণ্ডটা কর্মব্যস্ততায় গম্‌গম্‌ করছিল। সাধারণত হাটের দিনে ব্যবসায়ী আর ফেরিওয়ালারা এখানে দোকান সাজিয়ে বসে—তাদের পসরা বেকাবার জন্যে। আজকের প্রদর্শনীটা ছিল কিন্তু একটু ভিন্ন ধরনের। বলতে গেলে সারা শহরটাই এসে জড়ো হয়েছিল। শিশু থেকে, নারী পুরুষ বৃদ্ধ যুবা, সবাই এসে ভিড় জমিয়েছিল তাদের একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন, অসুখী জীবনগুলোয় কিছুটা রঙ মাখিয়ে নিতে। আবহাওয়া যদি হঠাৎ এমন ভাবে পরিবর্তিত না হত, তাহলে হয়তো ওরা এখনও ওখানে আরো খানিকক্ষণ কাটাত। পুরো মাঠটা জুড়ে হাটের দিনের স্মৃতিটুকুকে বুকে নিয়ে এখন শুধু চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কয়েকটা আটপৌরে খড়ের চালার ছাউনি, রান্নাবান্নার জন্য সাময়িক ভাবে গড়া কতগুলো পোড়া উনুন, জবাই করা শুয়োরের জমাট বাঁধা রক্ত আর নাড়ি ভুঁড়ির দলা, আর আছে দু' একটা রাস্তার কুকুর, বাতাসের প্রচণ্ড গর্জন, ধাবমান জলস্রোতের কল্‌কল্‌ শব্দ আর হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা।

তবু ওই সূচীভেদ্য অন্ধকারে কেউ যদি ওখানে অত্যন্ত সতর্কভাবে কোন মানব দেহধারীর অনুসন্ধান করে তবে তার বোধহয় খুব একটা অসুবিধা হবে না। কারণ একটি পতিতাকে ওই মেলা প্রাঙ্গণেই বেঁধে রাখা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ পতিতাটিকে মেলা চলার সময়েই এখানে আনা হয়েছিল। মেয়েটির পেশাগত নাম সিয়াও কোয়াই-ফেঙ। এই ছোট্ট শহরটাতে ও আজই বিকেলে পা দিয়েছিল। কিন্তু শুরু থেকেই ভাগ্য ওর প্রতি বিরূপ। তবু

অপ্রত্যাশিত দুর্ভাগ্য ঠিক এই মুহূর্তে ওকে তেমন কোন কষ্ট দিচ্ছে না। ওর এখন একমাত্র চিন্তা কোন রকমে গা-টাকে একটু এলিয়ে দেওয়া। একটুর জন্যে হলেও ও যদি ক্লান্ত পা দু'টোকে একটু বিশ্রাম দিতে পারত! কিন্তু এমনই কপাল, বৃষ্টির জলে সারা মাঠটা একেবারে থকথকে কাদার পুকুর।

বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে ফেঙ একভাবে খাড়া হয়ে বসে আছে। ওর পাজামা আর পেছন দিকে গুটিয়ে রাখা পোশাকটা কাদাগোলা জলে ভিজে জবজব করছে। সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হল, আজ ও সারাদিন একটি দানাও মুখে দেয়নি তার ওপর প্রায় কুড়ি লী রাস্তা পায়ে হেঁটে এসেছে। শহরে পেঁৗছেই ঝরনার ধারে গিয়েছিল চুল আঁচড়ে গা ধুতে। তারপর সস্তা সুগন্ধি পাউডার মুখে বুলিয়ে নিয়ে সিল্কের ছাপা পোশাকটা পরে, সাদা সুতোর ফুল তোলা জুতো দুটো পায়ে গলিয়ে সোজাসুজি বেরিয়ে পড়েছিল মাথা গোঁজার জন্য একটা সরাইখানার খোঁজে। তারপরেই একেবারে আচমকা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক শত্রুর সঙ্গে ওর মুখোমুখি দেখা।

যতদূর মনে পড়ে, গত দু'বছরে দুর্ভাগ্য কখনো এমন নির্মম আঘাত হানেনি। লাঞ্ছিত বা অপমানিত হওয়াটাকে ও তেমন বড় করে দেখে না। এ রকম ব্যবহার ওর গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু আজ ওকে অপমানের চূড়ান্ত করা হয়েছে। সজোরে গালে চড় মেরে ওকে টেনে এনে সবার সমক্ষে একটা দর্শনীয় বস্তু করে বেঁধে রাখা হয়েছে। বিনা প্রতিবাদে অপমান সয়ে নিলে ওকে হয়তো আজ এমন ভাবে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখা হত না আর কাদার মধ্যে বসে বসে ঠাণ্ডা হাওয়ার চাবুকও খেতে হত না। কয়েকদিন আগে ওরই মতো একই পেশাভুক্ত কয়েকটি মেয়েকে যেমন শহর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, ওকেও হয়তো সেইভাবে তাড়িয়ে দিত। তার বেশী কিছু নয়।

আশপাশে একটা দেওয়াল বা এমন একটা কিছু নেই যার গায়ে ঠেস দিয়ে একটু জিরিয়ে নিতে পারে। চারপাশ ঘিরে রয়েছে শুধু কন্‌কনে শূন্যতা। বারবার ভাবে, আর নয়, এবার কাদার মধ্যেই শুয়ে পড়বে। তবু সিঁটিয়ে যায়। পরনের এই পোশাকটাই যে ওর পরে বেরোনোর মতো একমাত্র পোশাক!

নৈরাশ্যের তাড়নায় জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে ফেঙ, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে।

"কি এমন অপরাধ করেছিলাম আমি?" কান্না চেপে বিড় বিড় করে বকতে শুরু করে। "আমি তো কোন জিনিস চুরি করিনি—কারুর কাছ থেকে জোর করে তো কিছু ছিনিয়ে নিইনি।"

প্রতিটি ফোঁপানির মধ্য দিয়ে ফেঙ-এর দুঃখ ক্রমশঃ আরো ঘনীভূত হয়। এই প্রথম সে তার শোচনীয় ভাগ্যের স্বরূপ পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছে, শুধু পেটটুকু ভরানোর জন্যে ওকে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে যেতে হবে, আর ছোটার পথে যার সঙ্গেই ওর মোলাকাত হবে তাকেই সঙ্গ দিতে হবে, খুশী করতে হবে। বিনা প্রতিবাদে সইতে হবে অত্যাচার আর অবমাননার গ্লানি। ওর অবস্থাটা এখন একজন দাগী আসামীর চেয়েও খারাপ। সত্যিই তো, ও ওর জীবনে কোন অপরাধীকে কোনদিন ঠিক এই ভাবে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে এমন পা বাঁধা অবস্থায় উদোম মাঠের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেনি।

বেশ কিছুক্ষণ গুঙিয়ে গুঙিয়ে কেঁদে হঠাৎ ও কান্না থামায় শ্বাস নেবার জন্যে। ভয় পাওয়া চোখ দুটো মেলে চারিদিকের জমাট বাঁধা অন্ধকারকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে।

"সত্যিই কি ওরা সারারাত ধরে আমাকে বেঁধে রেখে দেবে? ওঃ ভগবান!"

ফেঙ বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করে যে ও নিজেই কখন চিৎকার করতে শুরু করে দিয়েছে, উন্মাদের মতো ঝটাপটি করছে। ও যেন একটা বিচিত্র ক্ষমতা লাভ করেছে। ফেঙ আর কাঁদে না। যত রাগ বাড়ছে সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বরও তত চড়ছে। বাকী রাতটুকু আর কিছুতেই ও এভাবে কাটাতে রাজী নয়।

ফেঙের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ক্যাঁচক্যাঁচ করতে করতে কর্পোরেশন অফিসের বিশাল ফটকটা খুলে গেল।

"কিরে! তোর প্রতি অবিচার করা হয়েছে বলে নালিশ জানাচ্ছিস নাকি?" এবার কতকগুলো গালাগালি। অবশ্য তেমন নোঙরা নয়।

"নিশ্চয় নালিশ করছি!" ঝাঁঝিয়ে উঠল ফেঙ। মুহূর্তের জন্য ভুলে গেছল যে যাকে ও কথাগুলো বলছে সে এই শহরেরই অতি সম্মানীয় সরকারী পাহারাদার। মুক্তি পেতে হলে এই পাহারাদারকেই অনুনয় বিনয় করে, তোষামোদ করে খুশী করা দরকার। "তুমি নিজেই একবার আমার জায়গায় এসে বসে দেখ না? ঠাণ্ডায় জমে কাঠ হয়ে গেছি। ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে। সারাটা সময় ঠায় বসে থাকতে থাকতে কোমরটা প্রচণ্ড ব্যথায় টন্‌টন্ করছে। আমি কি চোর? কোন জিনিস কি চুরি করেছি? কারো কাছ থেকে জোর করে কিছু ছিনিয়ে নিয়েছি…?"

"আমি তো আর তোকে বাঁধিনি।" পাহারাদার কথা বাড়াতে দেয় না।

"কে বেঁধেছে সেটা বড় কথা নয়। একজন দাগী আসামীরও অধিকার আছে এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় একটা আশ্রয় পাবার, একটু খড়কুটো..."

অতি কষ্টে ঢোঁক গিলল মেয়েটা। হাঁপ টেনে শ্বাস নিল। ক্ষমতায় আর কুলোচ্ছে না। বাঁধন খোলার জন্য ধস্তাধস্তিও থামিয়ে দিয়েছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাহারাদারের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। "আচ্ছা মুস্কিল! সব দোষটা যেন আমার।" একটু বাদে শ্বাস চেপে বিড়বিড় করে উঠল পাহারা-দার। তারপর আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঁচু কালো গেটটা পেরিয়ে অফিসের ভেতরে ঢুকে গেল।

এই গাঁট্টাগোট্টা পাহারাদারটির নাম সিয়ে লাও-ওয়া। বুদ্ধিটা ওর তেমন প্রখর নয়। কিছু করা, কি নড়াচড়া বা কিছু ভাবা, সবতাতেই শ্লথ। বেশ কয়েক বছর ধরেই ও কর্পোরেশনের অফিসে পাহারাদারের কাজ করছে তবু ওর গেঁয়ো স্বভাবটা আজ পর্যন্ত পালটায়নি।

আস্তে আস্তে পিছন ফিরে গেটটাকে বন্ধ করবে বলে হাত দু'টো তুলেও তখুনি নামিয়ে নিল লাও-ওয়া। স্কোয়াড লীডার চেন ইয়াও টুঙ ফোঁস ফোঁস করতে করতে এগিয়ে আসছে।

"শালা আবার জ্বালাতে আসছে।" রাগে গরগর করে উঠল সিয়ে। "মানুষ তো নয় যেন একটা বুনো বেড়াল!..."

স্কোয়াড লীডারের ঢ্যাঙা লিকলিকে চেহারা, বয়স ত্রিশের কোঠায়। দু' হাত ভর্তি পাঁচড়া। ছোটখাট এক জোতদারের একমাত্র পুত্র। তাস পাশার জুয়া খেলা ছাড়া আর কোন কিছুতেই ওর উৎসাহ নেই। যদিও সবসময়ই ও হেরে ভূত হয়। সৈন্যবাহিনীতে বাধ্যতামূলক অন্তর্ভূক্তি এড়াবার জন্য চেনকে ওর বর্তমান পদে যোগ দিতে হয়েছিল। তারপর এক বছরও এখনো পেরোয়নি। সন্ধ্যেবেলায় একা একা শোবার ঘরে শুয়ে হঠাৎ একটা বদ বুদ্ধি ওর মাথায় এসেছিল—ওই ভবঘুরে বেশ্যাটার সঙ্গে তো দিব্যি মাগনায় রাত কাটানো যায়! সারা সন্ধ্যেটাই এই এক চিন্তা ওকে কুরে কুরে খেয়েছে। আর সেই জন্যেই টে ওয়া-ত্জের শুঁড়িখানা থেকে আগেভাগে পালিয়ে এসেছে এখানে।

পাহারাদারের মুখোমুখি হতে স্কোয়াড লীডারের সারা মুখে একটা কপট হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

"ঠিক আছে, এবার তুমি শুতে যেতে পার।" অলস ভাবে টেনে টেনে বলল কথাগুলো। ওর হাসিটা যেন একটা লজ্জার ব্যাপার হয়ে উঠল।

"ঘুম? দূর্—আমার কপালে কী আর সে সুখ আছে!"

"আচ্ছা আহম্মক তো।" ঝটপট বলে উঠল স্কোয়াড লীডার। "বলছি না,

তোমার হয়ে আমিই পাহারা দেব।"

দোনোমোনা পাহারাদার মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল। "সত্যি বলছ, সারারাত জুয়া খেলে কাটাবে না?" অবিশ্বাসের সুরে কথাগুলো বলল সিয়ে।

"জুয়া? আরে বাবা মালটা অবধি তো টানলাম ধারে। বিশ্বাস না হয় পকেটে হাত দিয়ে দেখ না! কানাকড়ি নেই।" পাহারাদারের বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্য পকেটটা জোরে জোরে নাড়তে লাগল চেন।

আড়চোখে একবার তাকালো পাহারাদার ওর দিকে। মাথা নাড়ল। শেষ পর্যন্ত একটা চোরা ঘুম মারার সিদ্ধান্ত নিল। তবু চলে যাবার জন্যে কোন ব্যস্ততা নেই ওর। কান দু'টো খাড়া করে সজাগ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাতের অন্ধকার ফালাফালা করে মেয়েটির ফোঁপানি কানে আসতেই আবার ও বিড়বিড় করে উঠল. "আমিই যেন ওকে বেঁধে রেখেছি!"

মেয়েটি সম্বন্ধে কিছু বলবে ভেবেছিল স্কোয়াড লীডারকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সশব্দে একটা হাই তুলে বলল, "আজকের রাতে এখানে শুধু তুমি আর আমি, এই দুটি প্রাণী, জান তো?" স্কোয়াড লীডারকে একা গেটের মুখে রেখে ও ঘুরে ভেতরে ঢুকে গেল।

নিজের কামনাকে চরিতার্থ করার জন্য স্কোয়াড লীডারকে অনেক চিন্তা করতে হয়েছিল। কেরানীরা কেউই এখন অফিসে নেই। বড়বাবুও নিজের চিকিৎসার জন্য দেশের বাড়িতে চলে গেছেন। এখন এখানে থাকার মধ্যে মাত্র কয়েকজন প্রহরী। এদের আবার বেশীর ভাগেরই নিজের নিজের বাড়ি আছে, তাই এদেরও পথ থেকে সরাতে তেমন কোন অসুবিধা হয়নি। কেবল অবিবাহিত ওই সিয়ে লাও-ওয়াটাই হল আসল সমস্যা। চেন বার দুয়েক স্বেচ্ছায় ওর দায়িত্ব বহন করতে চেয়েছে। কিন্তু এই বুদ্ধু বশংবদ পাহারাদারটা বিশ্বাসই করতে চাইছিল না যে ও জুয়া খেলতে যাবে না। ও তো প্রায় আশাই ছেড়ে দিয়েছিল। যাই হোক সিয়ে এতক্ষণে প্রায় বিনা সন্দেহেই শুতে যাবে বলেছে। স্কোয়াড লীডার সঙ্গে সঙ্গে প্যারেড গ্রাউণ্ডের ওখানে বেশ্যাটার কাছে গেল না। ওর যে কোন বদ মতলব নেই এমন একটা ভান দেখিয়ে গেটটা অর্ধেক বন্ধ করে পাহারাদারের পিছনে পিছনে ভেতরে এসে ঢুকল। এই বড় হলঘরটা এক সময় ছিল একটা মন্দির। 'পূর্ব পর্বত-এর দেবতার কাঠের মূর্তিটা থাকত হলঘরটার ঠিক মাঝখানে। সেটা আর এখন নেই। অতি প্রাচীন অব্যবহৃত একটা কেরোসিন বাতি সবচেয়ে বড় কড়িকাঠটা থেকে ঝুলছে। তারই নীচে একটা টেবিল আর গুটি কয়েক টুল। খুচরো খাচরা দু'চারটে দেবতার মূর্তি এখনও আশপাশে

পড়ে আছে। আর এদেরই একটার পায়ের কাছে একটা তেল ভর্তি ফাটা পাত্রে জ্বলছে টিম্‌টিমে একটা বাতি। বেদীর সামনে ফায়ার প্লেসে কয়েকটা কাঠ চিড়বিড় করে উঠল। পেছনের ঘর থেকে কোন শব্দ আসছে কিনা সেদিকে কান রেখে স্কোয়াড লীডার আগুনের পাশে এসে বসল। একটু পরেই শুনল পাহারাদার হাই তুলছে, তারপর তার খড়ের চটি খোলার শব্দকে অনুসরণ করল কাঠের চৌকির মচ্‌মচানি। তারপরই স্তব্ধতা।

কিন্তু চেন তবু নড়ল না। একটা নিদারুণ ক্লান্তি যেন তাকে পেয়ে বসেছে। অন্যের হাই তোলার ছোঁয়াচে ও-ও হাই তুলল। আগুনের তাতে গরম হয়ে হাতের পাঁচড়াগুলো চিটপিট করে উঠল। পাঁচড়ার ঘাগুলো এমন যে একবার চুলকোতে শুরু করলে যতক্ষণ না বেশ ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে চুলকোন যাচ্ছে ততক্ষণ শান্তি নেই। একটা বোবা হাসি হেসে শেষে উঠে দাঁড়াল স্কোয়াড লীডার। আগুনের ধার ছেড়ে পা টিপে টিপে গিয়ে দাঁড়াল গেটের কাছে। অত্যন্ত সন্তর্পণে গেটটা খুলে চোরের মতো রাতের অন্ধকারে হাঁটতে লাগল।

অভাগা মেয়েটা এখনও একটানা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে। কেউ যে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে ওকে এই দুর্বিপাক থেকে উদ্ধার করবে এমন দুরাশা ওর নেই। পাহারাদারের চেহারা আর কথাগুলো বারবার ওকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল আজ সারা দিনের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাগুলোর কথা। ওর জীবনটা খুবই ভাগ্যবিড়ম্বিত তবু আজ যে-মেয়েটা ওর বিরুদ্ধে লোকজনদের লেলিয়ে দিয়েছিল তেমন জাঁদরেল মেয়েমানুষের সঙ্গে এর আগে কোনদিন ওর মোলাকাত হয়নি। দেখে মনে হয়েছিল প্রত্যেকেই ওই মহিলাকে বেশ সমীহ করে। ভয় পায়ই বলা ভাল। আর অবাক কাণ্ড, গাঁট্টাগোট্টা গোঁয়ার পুরুষগুলোও মাগীটার একেবারে হাতের মুঠোয়! মাগীটা প্রতিবাদ জানানোর সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো একদল শিকারী কুকুরের মতো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হেনস্থার একশেষ করেছিল।

হ্যাঁ, এই হিংসুটে ডাইনীটার হাতেই এর আগেও ওরই জানাশোনা দু'তিনটে মেয়ের এই একই হাল হয়েছে। কারুর কারুর বেরনোর একমাত্র পোশাক ছিঁড়ে ফালাফালা করে দিয়েছে, ভাঙা কাঁচের টুকরো দিয়ে এমন ভাবে কারুর কারুর মুখ ঘষে দিয়েছে যাতে ওরা বেশ কিছুদিন ধান্দায় বেরোতে না পারে। ওর এখনকার হালের চেয়ে সেটা বোধহয় আরও মর্মান্তিক। তবু একথা ভেবেও ও কোন সান্ত্বনা লাভ করে না। এই মুহূর্তে ও তার পূর্ববর্তী নিগৃহীতাদের প্রায় হিংসে করছে। এখন ওর যা অবস্থা তাতে তুলনামূলক ভাবে পোশাক-আশাক নষ্ট হওয়া কিংবা শরীরের জেল্লা কিছুটা

খোয়ানো, ওর কাছে খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। একটু যদি খেতে পাওয়া যেত! কিংবা একটু আগুন! তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্ত দেহটাকে টান টান করে এলিয়ে দিতে পারত।

দুর্ভেদ্য অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই ওর নজরে পড়ে না। আরও গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে ফেঙ।

"একি বজ্জাতি! দোষটা আমার কী? আমি কি কিছু চুরি করেছি না কারো কিছু ছিনিয়ে নিয়েছি...?"

অগ্রসররত স্কোয়াড লীডারের পায়ের শব্দ শুনেই মেয়েটা চুপ করে গেল। কি বলবে বুঝতে না পেরে লোকটা ওর সামনে এসে বোকার মতো হাসতে শুরু করেছে। জীবনে সে এই প্রথম কোন মেয়েমানুষের মুখোমুখি হচ্ছে না। ও বিবাহিত। গুটি কয়েক কাচ্চাবাচ্চারও বাপ। কিন্তু এই প্রথম ও এমন একটি মেয়েমানুষের মুখোমুখি হয়েছে যাকে সবাই পণ্য হিসাবে ব্যবহার করে। মুখে ওর এই বোকা হাসির বিশেষ কারণ হল, একটা আদিম কামনা ওকে খোঁচা দিচ্ছে আর তারই সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একটা অদ্ভুত ভয়, যদি মেয়েটার কাছে বোকা বনে যেতে হয়!

"আর দিন পেলি না, আজকে এখানে এসে জুটলি?" কথা শুরু করার একটা জুতসই রাস্তা ঠাওরাতে পেরে চেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

"সেটা কি আমার দোষ?" ঝাঁঝিয়ে ওঠে মেয়েটা। হাতের কাছে অভিযোগ করার মতো একজনকে পেয়ে ও যেন বর্তে গেছে। "আর যদি দোষ করেই থাকি, আমাকে চলে যেতে দিলেই হতো! আমার সঙ্গে এমন দাগী আসামীর মতো ব্যবহার কেন? দাগী আসামীর চেয়েও খারাপ বলব! এরকম উদোম একটা খোলা জায়গায় বেঁধে রেখে দিয়েছ।"

কথা থামিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে মেয়েটা। দুঃখে তার চোখ দিয়ে জলের ধারা নামে। "ভগবানের দোহাই বলছি, আমাকে একটু দয়া করো!" কাঁদতে কাঁদতে ও বুঝিয়ে বলতে চায়, "এ দয়ার কথা কোনদিন আমি ভুলব না, কোন দিন না।"

"তার মানে বলতে চাস্, আমায় তুই কোন দিন ভুলবি না, এই তো?" একমুখ হেসে চট্‌পট্ জবাব দিল স্কোয়াড লীডার। "একটা সৎ ভালোমানুষ পেয়ে ফায়দা ওঠাতে চাইছিস, বুঝেছি।"

ঠিক এই কথাগুলো ও বলতে চায়নি। কিন্তু কথাগুলো বলে ফেলে দেখল জড়তাটা বেশ কেটে গেছে। অত্যন্ত অশ্লীল এবং নোংরা ভাবে ও মেয়েটার সঙ্গে বাচালের মতো বকতে লাগল। ওর ধারণা একটা বাজারের মেয়ের সঙ্গে এটাই উচিত ব্যবহার। আশার একটা ক্ষীণ আলো দেখতে

পেয়ে মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে ওর ইঙ্গিতে সায় দিল। অস্বাভাবিক কিছু না ঘটলে এবার ও খুব সম্ভবত ওর একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য, একটু উষ্ণতা আর বিশ্রাম অর্জন করতে পারবে। এগুলোর জন্য ওর আকাঙ্ক্ষা এত তীব্র যে মেয়েটা তার পেশাগত নিয়মমাফিক ছেনালীটুকুও বাদ দিল। লোকটা যাও বা রাখঢাক করছিল ও তার চেয়ে অনেক খোলাখুলি ভাবে ওর সব ইচ্ছে পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিল।

স্কোয়াড লীডার মেয়েটার পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে ওকে নিয়ে অফিসের দিকে এগিয়ে চলল। ভেতরে ঢুকে মেয়েটাকে আগুনের পাশে বসিয়ে উদ্বৃত্ত ভাত আনতে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াতে গিয়েও কিন্তু থমকে গেল চেন। বেশ্যাটার ছোটখাট কুঁকড়ে যাওয়া শরীরটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে ওর মুখে আবার সেই আগের বোকা বোকা হাসিটা ফুটে উঠল।

"কি গো, খেয়া পেরিয়ে শেষে মাঝিকে কলা দেখাবে না তো?" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।

মাথা উঠিয়ে ক্লান্ত স্বরে উত্তর দিল মেয়েটা, "তোমাকে ঠকিয়ে লাভ?" ওর গলার স্বর আর দৃষ্টির ক্লান্তি দেখে মনে হচ্ছিল এখন স্বয়ং ভগবানের ভগবান এসে হাজির হলেও, ও সেদিকে নজর দেবে না। ওর এখন একমাত্র কামনা উবু হয়ে বসে মাথাটা হাত দুটোর মধ্যে গুঁজে একটু বিশ্রাম নেওয়া। হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল, কিছু খাওয়া দরকার। একটা ভ্রূকুটি লক্ষ্য করল ও স্কোয়াড লীডারের মুখে। জোর করে মুখে একটা ছেনাল হাসি ফুটিয়ে বলে উঠল, "না গো, কথার খেলাপ করবো না। দোহাই তোমার, দ্যাখ না যদি একটু গরম চা পাওরা যায়! তেষ্টায় একেবারে মরে গেলুম যে!"

ওর ঢলানি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে স্কোয়াড লীডার আস্তে আস্তে বলল, "ঠিক আছে, দেখছি।"

চেন মনে মনে ওর ভাগ্যকে অভিশাপ দিতে দিতে এগিয়ে গেল। মেয়েটার উস্কখুস্ক চুল, ছুঁচোল নাক আর কেঁাচকান ঠোঁটওলা বিবর্ণ হতশ্রী মুখ। মুখের ওপরের রুজ আর সস্তা পাউডারের প্রলেপ বৃষ্টি আর চোখের জলে ধুয়ে গেছে। ক্ষয়াটে ডিগডিগে চেহারা, নকল হাসি আর গলার বাচাল স্বর—সব কিছু মিলে চেন ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠছে। কেমন একটা হতাশার ভাব ওর সমস্ত উৎসাহগুলোকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে।

এই জন্যেই বোধহয় রান্নাঘর থেকে ঘুরে এসে সামনে পাহারাদারকে দেখেও চেন কিন্তু ক্ষেপে উঠল না। গলার আওয়াজ পেতেই তাড়িঘড়ি

ঘর থেকে বেরিয়ে মেয়েটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে পাহারাদার। উলটোপালটা একটা কিছু ঘটে যাবার ভয়ে এতক্ষণ জেগেই ছিল। অনেক ডেকেও স্কোয়াড লীডারের কোন সাড়া না পেয়ে উঠে পড়েছে শেষে। দু'জনের কেউই ভাবেনি যে ওদের এরকম মুখোমুখি দেখা হবে। পাহারাদারকে দেখে মনে হচ্ছে ও যেন বেশ স্বস্তি পেয়েছে।

"এ্যাইয়ো! আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম, তুমি আবার হয়তো জুয়া খেলতে বেরিয়ে গেছ।" পাহারাদার বলল।

"জুয়া? কোন্ চুলোয় যাব জুয়া খেলতে?" স্কোয়াড লীডার একটু হেসে চটপট জবাব দিল। "জানো তো আমার কাছে একটি আধলাও নেই।"

পাহারাদার ওর থুতনি নাড়িয়ে ইশারায় মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল, "তাহলে তুমি ওকে ছেড়ে দিয়েছ, অ্যাঁ?"

"তাছাড়া আর করবোটা কি?" চেন খানিকটা বিরক্তি প্রকাশ করল। "ওর একঘেয়ে গোঙানি আমাকে প্রায় পাগলা করে দিয়েছে।"

"তা তো বটেই!" পাহারাদার একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, "সম্ভব হলে সর্বদাই অসহায় মানুষকে দয়া দেখানো উচিত।" ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মেনে নিয়েছে যে স্কোয়াড লীডার একটা প্রশংসার কাজই করেছে। "পারলে আমি ওকে নিজেই ছেড়ে দিতাম। কিন্তু আমার তো সে ক্ষমতা নেই। এমন তো নয় যে শহরের সব ব্যাপারেই আমরা খুব কড়াকড়ি করি। কি বলো…" ঈষৎ হেসে পাহারাদার মাথাটা ঝাঁকালো তারপর আগুনের পাশে বসে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল।

মেয়েটা ততক্ষণে ওদের কথপোকথনে জেগে উঠেছে। ফায়ার প্লেসের একটা জ্বলন্ত কাঠের পাশে এসে বসেছে। স্কোয়াড লীডার ভাতের পাত্রটা ওর সামনে রাখল। একটা গভীর ভ্রূকুটি চেনকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। প্রথমটায় তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল। পাহারাদার ওর ধাক্কাটা ধরে ফেলে থাকে যদি! তারপর মেয়েটির প্রতি সিয়ের আন্তরিক করুণা লক্ষ্য করে ও কেমন একটা লজ্জা অনুভব করেছিল। এখন কিন্তু ও অন্যের এই অনধিকার চর্চায় বেশ বিরক্ত।

ঘরে একজনের মধ্যেই খানিকটা আনন্দের প্রকাশ দেখা গেল। মেয়েটা ভাতের পাত্রটাকে দেখেই ক্লান্তির কথা ভুলে গিয়েছিল।

"এ্যাই শোন! সত্যি বলছি কপাল আমার খুব ভাল। ভাগ্যিস, তুমি আজ এখানে ছিলে।" ভাতটা নাড়াচাড়া করতে করতে কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলল মেয়েটা।

"এ তো দেখছি ঠাণ্ডায় একেবারে শক্ত মেরে গেছে!" পাহারাদার হাই তুলতে তুলতে মন্তব্য করল।

"তাহলে তুমি নিজেই গিয়ে ওর জন্যে খানিকটা জল গরম করে নিয়ে এস না?" মন্তব্য করল স্কোয়াড লীডার। ওর গলার স্বরে বিরক্তি ফুটে উঠল।

বেশ খানিকটা উদ্বিগ্ন মনে হল পাহারাদারকে। "দেখি, যদি কিছু জ্বালানি কাঠ পড়ে থাকে।" বিড়বিড় করতে করতে ও রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। খানিক পরে এক জগ ভর্তি গরম জল আর তিনটে মাটির গেলাস নিয়ে ফিরে এল।

মেয়েটা খুব খুশী হয়ে উঠেছে। সিয়ের এই ভালোমানুষিতে চেনও না হেসে পারে না, "ওরা যে বলে, তোমার মনটা খুব উঁচু তাতে অবাক হবার কিছু নেই।" হেসে বলল চেন।

"হুঁঃ! উঁচু মন!" পাহারাদার বিব্রত হয়ে বলল।

জল ভরে স্কোয়াড লীডারের দিকে পাত্রটা এগিয়ে দিল সিয়ে। তারপর শুকনো মুখটা উঁচু করে বেশ্যাটাকে খুঁটিয়ে দেখল। "কপাল ভালো, ওরা তোমার মুখটাকে আঁচড়ে দেয়নি!" লম্বা পাইপটা টানতে টানতে বিমর্ষ স্বরে মন্তব্য করল।

"একটা কথা আমি জানতে চাই—" মেয়েটা পাহারাদারের কথায় উত্তেজিত হয়ে দু'জনকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল। ভাত নাড়াচাড়া বন্ধ করে এমন ভাবে কথা বলতে শুরু করেছে যে মনে হল সহজে থামবে না। "ওই শয়তান মাগীটা আসলে কে বল তো? অনেক জায়গায় ঘুরেছি, বদ লোকও কম দেখলুম না, বদের ঝাড়ও অনেক দেখেছি। কিন্তু মাইরি, এটার মতো কোথাও দেখিনি! এই প্রথম এখানে আমি আজ পা দিলুম আর মাগীটা বলে কিনা আমি ওর কোন পিরীতের নাগরের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেছি......!" খানিকটা সামনের দিকে ঝুঁকে মেয়েটা জলন্ত দৃষ্টিতে পাহারাদারের দিকে তাকাল। ওর চোখ দুটোয় টলটল করছে অশ্রু।

আজই দিনের বেলা যে লজ্জা আর দুর্ব্যবহার পেয়েছে মনে যেন তা ঝিলিক দিয়ে উঠল।...

রাস্তা দিয়ে যতখানি সম্ভব লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে করতে ও একটা সরাইখানার খোঁজে যাচ্ছিল। কালো ড্রাগন আঁকা একটা দরজা পেরিয়ে যাবার সময় পেছন থেকে এক ঝাঁক গালাগালি শুনতে পেয়ে ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে মেয়েটা পিছন ফিরেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওকে স্তম্ভিত করে ওর দিকে ধেয়ে এসেছিল একটা গাট্টাগোট্টা মেয়েমানুষ। মেয়ে-

মানুষটার ওপরের ঠোঁটে একটা কালো জড়ুল আর মাথায় একরাশ ঘন কোঁকড়ানো চুল। আঙুলে আঙুলে সোনার আংটি। কথা বলতে গিয়ে মেয়েটা সবে মুখ খুলতে যাবে, অমনি সশব্দে গালে এসে পড়ল একটা চড় আর শুরু হয়ে গেল অকথ্য অশ্লীল গালাগালি বর্ষণ।

"মর্ মাগী, মর্!" ফোঁপানী চেপে ফেঙ বলে উঠল। "ভাবেটা কী আমায়? ওই কি দুনিয়ায় একমাত্র মা বাপের লাল?"

"তুমি বড় ভুল দিনে এসে পড়েছ মেয়ে।" পুরু নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল পাহারাদার। "দিন পনের আগে কিংবা এই শহরের প্রধান যখন ছিল তখনো যদি আসতে তাহলে কিছুই হত না। এই তো, দিন দুয়েক আগেই এক দল মেয়েকে এখান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। তারপরেই তুমি এলে কিন্তু তোমার আসাটা যেন ঝড়ের মধ্যে এক ময়দার ফিরিওলা আসার মতো, বুঝেছ?"

খানিক হেসে পাইপটা মাটিতে ঠুকে ঠুকে পোড়া তামাকগুলোকে ফেলতে লাগল ও। ঠিক এই সময় স্কোয়াড লীডার হঠাৎ খুব জোরে হেসে উঠল। "কিন্তু এর তুমি কি জবাব দেবে শুনি?" গোমড়া মুখে বলল চেন, "তুমি তো কারুর না কারুর স্বামীর বারোটা বাজাও?"

"এর জন্য কেউ কাউকে দোষ দিতে পারে না। প্রত্যেকে তার নিজের জন্য দায়ী।" আপত্তি জানাল পাহারাদার।

"কিছু লোক আছে যারা কোন কিছু বাদ-বিচার করে না। হাতের কাছে যা পায় তাই নিয়ে..."

বেশ্যাটা আরক্তিম হয়ে লজ্জা ঢাকার জন্যে আবার খেতে শুরু করল।

পাহারাদারের কথায় ও বুঝতে পারল ওরা কোন একজন বিশেষ লোককে ইঙ্গিত করছে। সেই লোকটির জন্যই ওর এই হেনস্থা। (ও জানত না যে এখানকার নগর-প্রধান অসংযত জীবন যাপনের ফলে স্বাস্থ্যটি নষ্ট করার পর থেকেই ওর স্ত্রী বেশ্যা মেয়ে দেখলেই তাদের ওপর চড়াও হয়। এটা এখন তার অভ্যেসে পরিণত হয়েছে।)

ও আরো খানিকটা ভাত নিল। এমন ভান করছে যেন ওদের কথা শুনতেই পাচ্ছে না। কিন্তু তার পরেই ও ভাতের পাত্রটাকে হঠাৎ এক ঝটকায় পাশে ঠেলে দিল।

"কারুর না কারুর স্বামীর বারোটা বাজাচ্ছি মানে, কি বলতে চাও?" চোয়াল বার করা শীর্ণ মুখটাকে উঁচু করে ঝাঁঝিয়ে উঠল ও, "এর আগে আমি কি কখনো এখানে এসেছি? আমি জানিই না সে লোকটা দেখতে কেমন? মুখে ব্রণর দাগ আছে? তেলতেলে চেহারা?"

"বুঝলে না, ও শুধু ঠাট্টা করছে।" মেয়েটাকে ক্ষেপে যেতে দেখে পাহারাদার মুচকে হাসল।

"এঃ! শুধু ঠাট্টা!" পুনরাবৃত্তি করল মেয়েটা। "ভাবো অন্যের বুঝি আর মন নেই, যা খুশি তোমরা ঠাট্টা করতে পার, না? নিজেকে আমার জায়গায় বসাও তো দেখি, কেমন সহ্য করতে পার!" আবার ও ঢোঁক গিলল। ওর গলার স্বরটা ভেঙে এল, "সব মানুষই সমান হয়ে জন্মায়, তাই না? কোন মেয়ের যদি উপায় থাকে তাহলে সে কি কখনো আমার মতো এই পোড়ার কাজ করে?"

স্কোয়াড লীডার একইভাবে বোকার মতো হেসে যাচ্ছে। ওর কেমন লজ্জা হচ্ছে।

"যাকগে। থাক ওসব কথা।" অবশেষে বিষণ্ণ ভাবে হেসে বলল, "তুমি একটুতে বড় খচে যাও।"

"আমার মতো একজনকে খচিয়ে কার কি এসে যায়! লাথি ঝ্যাটা খাবার জন্যেই তো আমার জন্ম।"

মেয়েটার হাতের চপস্টিকের মাথা দু'টো ওপর দিকে ওঠানো। নাকের ওপর গড়িয়ে পড়া চোখের জলটাকে চেটোর উল্‌টো পিঠ দিয়ে মুছে ও চুপ করে গেল।

পরের মুহূর্তে ও আবার খেতে শুরু করল। কিন্তু কয়েক গ্রাস মুখে তুলেই ওর খিদে মরে গেল। শেষে ভাতের পাত্রে ঢালা জলটুকু চুমুক দিয়ে খেয়ে নিল।

পাহারাদার চোরা চাউনি হেনে মেয়েটাকে আর স্কোয়াড লীডারকে এক পলক দেখে আবার পাইপটা ধরালো। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করেনি চেন, কিন্তু মুখে একটা উদাস হাসি ফুটিয়ে রেখেছে। সত্যি বলতে কি ওর সম্মান আহত হয়েছে। ও যদি কিছু না করত তাহলে মেয়েটাকে কি এখনও এই বাইরে, এই শীতের রাতে হিমের মধ্যে খাদ্য বা আগুনের তাপ ছাড়াই পড়ে থাকতে হত না? শেষ পর্যন্ত চেন একসময় মেয়েটার দুরবস্থার কথা ভুলে বসল। আর সেই সঙ্গেই ভুলল নিজের মনের কামনার কথাটাও। একটা বিষণ্ণতা ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

"হ্যাঁ ভালো কথা–" চেন কথাটা এমন ভাবে বলল যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে। "ঘড়িতে পাঁচ বারের ঘণ্টা বাজলেই তোমাকে কিন্তু তখন যেতে হবে।" সে আড়চোখে একবার মেয়েটাকে দেখল। কথাটা শুনে মেয়েটা ভয় পায়নি দেখে ও মনে মনে বেশ হতাশ হল।

"কথাটা মনে থাকে যেন, সকাল বেলা আমাদের আবার ঝামেলায় ফেল

না।" একটু থেমে দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বলে চলল চেন। "আমরা যখন তোমাকে বেঁধে আসব, তোমাকে গাড্ডায় ফেললাম বলে আবার যেন চেল্লাচিল্লি জুড়ে দিও না। এ ব্যাপারে কোন ভুল বোঝাবুঝি হলে সেটা তোমার পক্ষে আরো খারাপই হবে।"

"তোমাকে অত ঘাবড়াতে হবে না।" বিষাদগ্রস্ত কণ্ঠে জবাব দিল মেয়েটা, "ভালোমন্দ কি আমরা জানি।"

"দ্যাখ, আমরা যদি তোমাকে দয়া না দেখাতে যেতাম, সিয়ে আর আমি এতক্ষণ লেপের তলায় দিব্যি একটা লম্বা ঘুম মারতে পারতাম। তাতে আরামটা অনেক বেশী, তাই না?"

"ঠিক আছে।" পাহারাদার বলল, "তোমার যদি ঘুম পেয়ে থাকে তাহলে এক ছিলিম তামাক খেয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়।"

স্কোয়াড লীডার পাহারাদারের হাত থেকে পাইপটা নিয়ে নিঃশব্দে টানতে লাগল।

কথাটা শুনেই চেন ভাবল এবার বেশ মৌজ করে তামাকটা টেনে তারপর সিয়েকে পাহারায় রেখে শুতে যাবে। রাতের পাহারাদারের পাঁচ বারের ঘণ্টিটা শোনার পর অপ্রিয় কাজটার দায়িত্বটাও আর তাহলে নিজেকে পালন করতে হবে না। মেয়েটার প্রতি আর কোন কামনা অনুভব না করায় নিজেকে বেশ হালকা মনে হচ্ছিল চেনের। অবশ্য রাত্রে ওর না ঘুমোনোর অভ্যেস আছে। তাছাড়া পাঁজরাগুলোও অসম্ভব চুলকোতে শুরু করেছে। কাজেই তামাকে কয়েকটা টান দেবার পর ওর ঘুমটা চলে গিয়ে বেশ একটা আমেজ এল। পাইপটা ও মেয়েটার দিকে এগিয়ে দিল।

মেয়েটার দিকে পাইপটা এগিয়ে দেবার সময় তার দিকে চট করে একবার দেখে নিল।

"আমার মনে হয় তোমার বয়েস কুড়ি পেরিয়েছে, তাই না?" মেয়েটাকে খানিকক্ষণ খুঁটিয়ে দেখে হঠাৎ পাহারাদার প্রশ্নটা করল।

"আরে না, না।" মেয়েটা একমুখ ধোঁওয়া ছেড়ে জানাল ওর বয়েস মাত্র আঠার।

"হুম্!" আধা সন্দেহ, আধা বিস্ময় ভরে উচ্চারণ করল সিয়ে।

কেমন যেন একটা অস্বস্তি নিয়ে পাইপের [illegible] ছাড়ল মেয়েটা, "সত্যি বলছি।" এমন ভাবে জোর দিয়ে কথাটা বলল যেন ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। "তুমি নিজেই গুণে দেখ না। আমি জন্মেছি ড্রাগনের [illegible], তাহলে এ বছর আঠারো হচ্ছে না? আমার বাপু বয়েস লুকোনোর অভ্যেস একেবারেই নেই।

আর, লুকোনোর আছেটাই বা কি ? যার যা বয়স !"

স্কোয়াড লীডার এতক্ষণ ধরে ওকে দেখতে দেখতে ঘাড়টাকে একদিকে কাত করে জিজ্ঞেস করল, "কতদিন হল তুমি এ পেশায় আছ ?"

"আসছে বসন্তে দু বছর হবে।" খুব ঠাণ্ডা ভাবে জবাব দিল মেয়েটা, "সত্যি বলছি, আমার তো মনে হয় না স্বেচ্ছায় কেউ এ জীবন বেছে নেয় !" মেয়েটা করুণ ভাবে বলে চলে, "তোমরা হয়তো শুনে হাসবে, কিন্তু আমি পরোয়া করি না। এক সময় আমাদের পরিবারও সবার মতো নিজেদেরটা চালিয়ে নিতে পারত। আমাদের নিজেদের কয়েক মৌ জমি ছিল আর কয়েক মৌ ছিল ভাড়া করা। বছরে বছরে বিক্রি করার মতো কিছু শুয়োর ছানাও ছিল আমাদের। কেউ কি কোনদিন ভাবতে পেরেছিল যে পেটের দায়ে আমাকে এত নীচে নেমে যেতে হবে ?"

হাত দুটো টান টান করে বিছিয়ে দিয়ে পাহারাদারের ওপর থেকে স্কোয়াড লীডারের দিকে চোখ ফেরাল মেয়েটা। তারপর মাথাটাকে ঝুঁকিয়ে বসে রইল। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটল। তারপর সোজা হয়ে বসে পাইপটায় তামাক ঠাসতে লাগল।

"ওঃ সেই বেজম্মা ডায়মণ্ডটা !" অভিশাপ দিল মেয়েটা। "ওই কুত্তার বাচ্চাটাই সব কিছুর জন্য দায়ী।

"ডায়মণ্ড কে ?" স্কোয়াড লীডারের কৌতূহলী প্রশ্ন।

"জানো না, ও হচ্ছে আমাদের শিয়েন পাও প্রধান।" একটা কঞ্চি আগুনে ঠেলে দিতে দিতে বলল মেয়েটা।

"তাহলে তোমাদের ওখানে ওকে নগরপাল বলে না ?"

"সে তো ওর ছেলে, নগরপাল হয়েছিল।" ওর হাতের কঞ্চিটা জ্বলে উঠল। কিন্তু পাইপটা না ধরিয়ে ও একটানা বলে চলল, "অবশ্য, সব লিয়েন পাও প্রধানদের যখন নগরপ্রধান বলে সম্বোধন করা শুরু হল তখন ও-ও নিশ্চয় নগরপাল হয়েছে। সে যাকৃগে, ওর ছেলে ট্রেনিং কোর্স শেষ করে নগর পাল হয়েছিল..."

"আরে ! এখানেও তো তাই হয়েছে।" যেন মস্ত একটা কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছে এমন ভাবে চেঁচিয়ে উঠল স্কোয়াড লীডার। তারপর পাহারাদারের দিকে তাকাল।

"হু ! আমিও এবার বুঝতে পেরেছি।" পাহাদারকে দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন একটা ধাঁধার উত্তর খুঁজে পেয়েছে।

চেন পাঁচড়া চুলকানো বন্ধ করে গভীর দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকাল। তোমার বাপ মা এখনো বেঁচে আছে ?"

"বছর দুই আগে আমার বাবা মারা গেছে। "

"সত্যি কথা, সূর্যের নীচে সব কাকই কালো।" ওদের দু'জনের কথায় কান না দিয়ে পাহারাদার আপন মনেই বিড়বিড় করে উঠল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আরো জ্বালানি কাঠ আনতে পা বাড়াল। ওর সারা মুখে একটা অবজ্ঞা মেশানো ঠাট্টার ছাপ। ফিরে এসে পাহারাদার আবার বলল, "হ্যাঁ, সূর্যের নীচে সব কাকই কালো।" আগুনে কাঠ গুঁজতে গুঁজতে পাহারাদার মেয়েটার বড় ভাইয়ের দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনতে লাগল।

"কেন, তুমি যেখানে থাকতে সেখানে ওর মুক্তিপণ দিতে পারনি?" আগুনে কাঠ দেওয়া ভুলে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল পাহারাদার।

"দু'বার দিয়েছি।" দুঃখ করে বলল মেয়েটা। "কিন্তু কোন লাভ হল না। ওরা একই ভাবে ওকে ফৌজে আটকে রাখল।" ব্যথা ভরা পিঠটা টানটান করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বার কয়েক হাই তুলল। কিন্তু তারই মধ্যে ওর প্রতি ওদের সহানুভূতি লক্ষ্য করতে ভুলল না।

"এরপর কি হল তোমরা সহজেই অনুমান করতে পার।" প্রায় প্রত্যেকটি কথাই কেটে কেটে বলে চলল মেয়েটা। "আমার মা, নড়া চড়া করতে অক্ষম, আর আমার বৌদি বাইরের হাওয়া গায়ে লাগলেই অসুস্থ হয়ে পড়ছে। বাড়িতে কাজ করার লোক বলতে কেউ নেই। প্রথমে আমরা ভাবলাম আমাদের নিজস্ব যে কয়েক মৌ জমি আছে তাই চাষ করা যাক। কিন্তু আমাদের জমিতে যা ফলল তার চেয়ে আমাদের খোরাক হয়ে গেল বেশী।... তখন, ওখানে টাকা রোজগার করা সোজা বলে মা আমাকে পাঠাল মিয়েন ইয়াং কাপড় কলে।"

ঘুমে মেয়েটা ঢুলছিল। কিন্তু ওর কোঁচকানো পোশাকের দিকে নজর পড়তেই ও সোজা হয়ে বসল। সব যেন নুনে জরানো বাঁধাকপির পাতার মতো কুঁকড়ে গেছে। মেয়েটা লাফিয়ে উঠল। "জানো, আমার টাকার থলেটা অবধি সে মাগী রেখে দিয়েছে।"

"ও তোমাকে ওগুলো ঠিক ফেরত দিয়ে দেবে।" পাহারাদার সান্ত্বনা দিয়ে বলল। "তুমি শুতে যাচ্ছ না কেন?"

"আহারে! কি কপাল আমার তোমাদের সঙ্গে আজ দেখা হয়েছিল।..." আর একটা হাই তুলল ও।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য মেয়েটা হাসতে চেষ্টা করল। কিন্তু ওর মাথাটা ঝুঁকে পড়ল ওর হাঁটু দুটোর ওপরে।

"দোহাই, আমাকে একটু ঘুমিয়ে নিতে দাও।" কথাটা যেন ও স্বপ্নের ঘোরে বলল। একটু বাদেই ওর নাক ডাকার শব্দ শোনা গেল।

লোক দু'জন একটা হাসি বিনিময় করে প্রায় এক সঙ্গেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

"মেয়েটার ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।" পাহারাদার বলল।

"আগুনের তাতে থাকলে ঠাণ্ডা লাগবে না।" ত্বরিতে উত্তর দিল স্কোয়াড লীডার।

মেয়েটার প্রতি পাহারাদারের এই আন্তরিকতা দেখে ওর রাগ হল না। বরং মেয়েটা যা-যা বলেছে সেই চিন্তাতেই ও মগ্ন ছিল। ওকে যাতে সেনা বাহিনীতে জবরদস্তি ধরে না রাখে তার জন্য স্কোয়াড লীডারের পরিবারও ঘুষ দিয়েছে। তবুও ও এই কর্পোরেশনের পাহারাদারের কাজ থেকে রেহাই পায়নি। ওর বাবার শরীরের গতিক খারাপ, ওর মা-ও বেশী কাজের ধকল সইতে পারে না। বাবা নিশ্চয় খুব অসুবিধেয় পড়েছে···

"আমাকে বোধহয় দিন দুয়েকের জন্য ছুটি নিতে হবে।" আপন মনে কথাগুলো বলল চেন। তারপর পাহারাদারের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে উঠল, "এই, দুজনে মিলে খানিকক্ষণ তাস পিটলে কেমন হয়?"

"আমার কোন আপত্তি নেই।" একটু চিন্তা করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গিয়ে বলল।

ওরা একটা টুল নিয়ে এসে তার ওপর তেলের বাতিটা রাখল। স্কোয়াড লীডার একটা তৈলাক্ত মলিন তাসের প্যাকেট বের করল। তারপর খেলা শুরু হল। ধীরে ধীরে ওরা সব কিছু ভুলে গেল। এই যে অন্ধকার, এখন যে মধ্যরাত্রি, ওই পেট মোটা লাল টুপি মাথায় কালো পোশাক পরা পুরু ঠোঁটওলা মূর্তিটা···সব বিস্মরণ।

একমাত্র তাসগুলো ভাঁজবার সময় ওরা মাঝে মাঝে মেয়েটার দিকে দেখছিল কিংবা আগুনটাকে উসকে দিচ্ছিল। তারপর আবার ডুবে যাচ্ছিল খেলার মধ্যে।

অনুবাদ / রমা ভট্টাচার্য

স্বপ্না চুন চ্যান ইয়ে

পাহাড়ে বড় গরম, এত গরম যে দম বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম। আর এরই মধ্যে সারা দিন ধরে হেঁটে বেড়িয়েছি। ঘামে চব্‌চব্‌ করছে, পা দুটোয় ফোস্কা পড়ে গেছে। এমনি করে চলতে চলতে অবশেষে একটা ছোট্ট উৎরাই-এ এসে পৌঁছলাম, এবং উৎরাই বেয়ে নীচে নামতেই তুঙ্‌তিঙ্‌ হ্রদ দেখতে পেলাম। তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে, ঝিরঝির করে মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। এখানে কেউ আশ্রয় নেয় নি, রাস্তায় গাড়িঘোড়া বা লোক জনেরও ভিড় নেই এবং জাপানী বিমানও উড়ছে না। লড়াইয়ের হাঙ্গামা শেষ পর্যন্ত পিছনে ফেলে এসেছি। একটা নিঃশ্বাস—সত্যিকারের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এমন সময় হ্রদের অপর তীর থেকে নীরবতা ভঙ্গ করে ঘেউ ঘেউ শব্দ কানে এল। সঙ্গে সঙ্গেই আবার হ্রদের চারদিক শান্ত নীরবতায় ভরে গেল।

পিঠ থেকে ময়লা কাপড়ের গাঁটরিটা নামিয়ে তারই ওপর মাথা রেখে ঘাসের উপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। আকাশের রংটাও যেমন নীল, নীচে জলের রংটাও তেমনি নীল; সেই নীলাভ আকাশ ও জলের ওপর দেখতে দেখতে লজ্জার রক্তিম আভার মত অস্তগামী সূর্যের সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়ল। একদল হাঁস কলকণ্ঠে ঘরে ফিরল। সূর্য তখন অস্ত গেছে।

এক মুহূর্তের জন্যে চারিদিক নিস্তব্ধ হল, এমন কি, একটি ঝিঁ ঝি পোকার শব্দও শোনা যায় না, অথচ আসবার সময় পথে ঝিঁঝির ডাক অনেক শুনেছি। তারপর ধীরে ধীরে কানে এল জলোচ্ছ্বাসের অস্পষ্ট একটা শব্দ—যেন বহু দূরে কোথাও ঢেউয়ের তুফান উঠেছে। প্রথমে শব্দটা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল না, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যেন সেটা ঘণ্টাধ্বনির মত স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটা বাতাসের ঝাপটায় চার দিক প্লাবিত করে যেন সে শব্দ ভেসে এলো। এবার আর আমার বুঝতে বাকী রইলো না সেটা কিসের শব্দ। আমারই পরিচিত গান, সে গান আমি মধ্যচীনের মেয়েদের

গাইতে শুনেছি বিস্তীর্ণ চারণভূমিতে। তখন আমি ছিলাম রাখাল বালক। ওই গান শুনলেই আমার মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত ঃ

ওই আকাশের প্রান্তদেশে
যাবো তোমার সাথে ;
সঙ্গে যাবো মহাসাগর পারে।
সাগর হয় তো শুকিয়ে যাবে,
চূর্ণ হবে অটল গিরিশ্রেণী ;
হৃদয় আমার এমনি রবে,
এমনি রবে হায় !
এপার ওপার যেখানে যাই
শেষ যেন তার নাই।

এই নির্জন স্থানে এই গান শুনে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। এই কথা ভেবে আমি আরও বিস্মিত হলাম যে, তা হলে নিশ্চয়ই এর কাছাকাছি কোথাও মানুষের বাস আছে—যেখানে কেউ গাইছে এই সহজ সরল গান। মানুষ ? কথাটা ভাবতেই আমার মনে হল—যদি কিছু খাবার পেতাম ! যতই একথা মনে ভাবি ততই অনুভব করি যে, আমি ক্ষুধার্ত, সারাদিন কিছু খাইনি। আমার যেন বেশ মনে হচ্ছে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমি উপবাস করেই কাটিয়ে এসেছি। বেওকুফের মত ঘাসের উপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকলে কি হবে ! আকাশ ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছে। আমি লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম এবং গান লক্ষ্য করে এগিয়ে চললাম।

হ্রদের ঠিক ডান দিকে একসারি গাছের পিছনে একখানি গ্রাম দেখতে পেলাম। গ্রাম্য ময়দানে একটা জনতা মিলেছিল, তখন তারা সকলে একে একে চলে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে আছে তরুণ চাষী মজুর, ছিন্নবাস শিশুর দল আর লম্বা নলে ধূমপান রত বুড়োর দল। আমি সেখানে পৌঁছবার আগেই তারা যে যার চলে যাচ্ছিল। কারুর মুখে বিষাদ কালিমা, আবার কেউ কেউ বা নর্তকীদের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। নর্তকীরা যেন হতাশ ভাবেই সেখানে দাঁড়িয়েছিল। কোন কোন সরল মেয়ের চোখের পাতা তখনও সজল ছিল। গানটি যে তাদের কোমল প্রাণকে অভিভূত করে ফেলেছে তাতে সন্দেহ নেই। আমি জানতাম যে, গানটি বড় করুণ, কারণ এর পিছনে যে কাহিনীটি আছে সেটি বড় মর্মান্তিক। কায়ক্লেশে পিঠে বোঁচকাটা নিয়ে যখন তাদের কাছে পৌঁছলাম, তখন জনতা আর সেখানে ছিল না। তারা সকলেই খাবার জন্যে যে-যার বাড়ি চলে গেছে। মনে

হল, এরা লড়াইয়ের কোন খবরই হয় তো রাখে না ! ওদের ভাগ্য ভালো।' এবং আমার মনটা যে বেন খারাপ্ হয়ে গেল; তার কারণও আমি জানতে পারলাম না।

আমি গিয়ে এক বুড়োর মুখোমুখি দাঁড়ালাম। লোকটি ভবঘুরে, তার মুখে চোখে একটা নির্বোধের মত চাউনি। তার পাশেই দাঁড়িয়ে দুটি তরুণী, নর্তকী ; তাদের একজন বেশ হৃষ্টপুষ্ট; দেখতে বেশ সুশ্রী, যেন একটি ফুটন্ত পদ্ম। অপর মেয়েটি তখন হতাশ ভাবে দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়েছিল। মেয়েটি কৃশ, যেন ক্রন্দনরত উইলো গাছের একখানি ডাল। আমরা পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি, কারুর মুখে কোন কথা নেই। ক্রমে চারিদিক অন্ধকারে ছেয়ে এল, সেদিকেই আমাদের একাগ্র লক্ষ্য। দেখতে দেখতে আমাদের চারপাশ অন্ধকারে ডুবে গেল।

অবশেষে বুড়ো নীরবতা ভেঙে আমাদের লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'তুমিও কি আমাদের মতই হা-ঘরে ?'

'হ্যাঁ,' জবাবে বললাম, 'জাপানীদের অগ্রগতির মুখ থেকে আমি পালিয়ে এসেছি। সেদিন তারা মধ্য চীনের উচ্যাং অধিকার করেছে।'

'বেশ, তা হলে তো ভালই হল, আমরা সবাই দুর্দিনের সাথী। এখন কথা হচ্ছে, রাতটা কাটাবার মত একটা আশ্রয় তো খুঁজে নেওয়া দরকার।'

এই বলে সে আগে আগে চলতে লাগল। আমি যেন সম্মোহিত হয়ে তার অনুসরণ করলাম. আমার পিছনে আসছিল মেয়ে দুটি। আমার অবস্থাটা যে অত্যন্ত অপ্রীতিকর সেটাও আমার মনে হল সঙ্গে সঙ্গেই। সত্যি বলতে কি, অচেনা মেয়েদের সামনে আমি প্রথমটায় ভারী সঙ্কুচিত হয়ে পড়ি, বিশেষতঃ কোন মেয়ে যদি আমার প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করবার সুযোগ পায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বৃদ্ধ আপন মনেই চলতে শুরু করে দিল। তার সামনের দিককার দাঁতগুলি সবই পড়ে গেছে, তাই তার কথাগুলি স্পষ্ট বোঝা যায় না। সে বললে ঃ

'ওহে ছোকরা, বুঝতেই তো পারছ, আমি একজন গাইয়ে।'

'আজ্ঞে হাঁ, দেখতে পাচ্ছি,' তার গলায় চামড়ার বকলশে ঝুলানো জরা-জীর্ণ জয়ঢাকটার দিকে চেয়ে জবাবে বললাম। তার চলার ছন্দে ঢাকটাও বেশ তালে তালে দুলছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও জেনেশুনেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা খুড়ো, আপনি সাধারণত কি যন্ত্র বাজান ?'

'কেন, জয়ঢাক। দেখো নি তুমি ?' তার কথায় এটাই প্রকাশ পেল যে, সেটা যে আমার জানা আছে তাতে তার মনে এতটুকু সন্দেহ নেই। একটু বাদেই সে যেন আশ্বস্ত করবার জন্যেই আমাকে আবার বললে ঃ 'আমিই

দলের অধিকারী. বুঝেছ ?'

'দল, কিসের দল ?' আমি সত্যিই একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লাম।

'কেন, নাচ-গানের দল ! তোমার পিছনে যে মেয়ে দুটি আসছে, দেখেছ তো ? অবিশ্যি তারা আমারই মেয়ে, তবে তারাই আমার দলের শিল্পী। প্রথম শ্রেণীর নর্তকী, বুঝলে, একেবারে প্রথম শ্রেণীর !'

এমনি ধারা আলাপ করতে করতে এক সময় আমরা পাহাড়ের গোড়ায় এসে পৌঁছলাম। জায়গাটা নির্জন। সেখানে একটা অতি প্রাচীন মন্দির আছে।

'বুঝলে বাপু, এখানটায় আমাদের আজ থাকতে হবে,' সে বলল।

ভিতরে গেলাম। মন্দিরটা যেমন নিস্তব্ধ, তেমনি নির্জন। দিয়াশলাইর সাহায্যে প্রদীপ জ্বালালাম। অথচ একটা ইঁদুরও ভয় পেয়ে ছুটোছুটি করছে না দেখে ভারী আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কি করব, ঠিক করতে না পেরে আমি বোকার মত অতি পুরাতন সেই প্রদীপের অনুজ্জ্বল আলোর সামনে অস্থির ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার পিঠের বোঁচকাটা দোলাতে লাগলাম।

'এইটি আমার বড়মেয়ে ভায়োলেট,' মোটাসোটা মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বুড়ো আমাকে বললে। মেয়েটি আমার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। 'আর এটি ছোট মেয়ে—ওর নাম স্প্রিং।'

তারপর সে এক গাদা খড় বিছিয়ে নিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে শুয়ে পড়ে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'যাক, আর একটা দিন তবু কাটল !'

আমার সঙ্গে মেয়েদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় আমি মৃদু হাসলাম। তারাও আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসল। তাদের সে হাসিতে এমন একটা আত্মীয়তার আমেজ ছিল যে আমি তা বর্ণনা করতে পারি নে। তাদের সে হাসিতে ছিল একটা আগ্রহ। আমার দিকে তারা তাকিয়ে রইলো। তাদের দৃষ্টিতে দেখলাম একটা আন্তরিক বন্ধুত্বের আমন্ত্রণ। একটা কথা আমার মনে হলো, বৃদ্ধকে বলে উঠলাম ঃ

'খুড়ো, আমাকে তোমার দলে নেবে ?'

'কেন—তোমাকে দেখে তো বেশ মনে হচ্ছে তুমি ছাত্র, লেখাপড়া জান।' বিস্ময়ের সঙ্গে আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে বুড়ো জবাব দিল। 'সত্যি বলতে কি, আমাদের কাজ বড় মেহনতের, বড় কঠিন।'

'কিছু আসে যায় না', জোরের সঙ্গেই বললাম। 'আমি দু-তারা 'এর্‌হু' বাজাতে জানি। তোমার কাজে আসতে পারে। অবশ্য এটা বলাই বাহুল্য যে, তুমি স্বয়ং একজন ওস্তাদ।' আমার শেষের দিককার কথাগুলো যে আমার

মনের কথা নয়, শুধু মন-রাখার উদ্দেশ্যেই বলা, এটাও নিজের কাছে অস্বী-কার করতে পারিনে, তবু না-বলে পারলাম না। কথাটা আপনা থেকেই এসে গেল। সে যাই হোক, আমার মনে হল, আমার প্রশংসায় বুড়ো খুশিই হল। সে বলল, 'বেশ, তা হলে তাই হোক। তুমি নিজেই যখন চাইছ,তখন আর কি, আমাদের একজন হয়েই থাক। আর এটাও জানি যে, সব মানুষই ভাই-ভাই।'

অত্যন্ত খুশি হলাম। মেয়ে দুটি সম্পর্কে আমার যে সংকোচ ছিল তা সঙ্গে সঙ্গেই দূর হয়ে গেল। উনুন ধরানো ও রান্নার আয়োজনে আমি সাহায্য করতে লেগে গেলাম। প্রথমে কাজ সম্বন্ধে এবং তারপর পরস্পরের জন্মস্থান সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা চলল। এই প্রসঙ্গে জানতে পারলাম, ওরা মাঞ্চুরিয়া থেকে এসেছে, কিন্তু ওদের আদি নিবাস ছিল মধ্য চীন, সেখান থেকে মাঞ্চুরিয়ায় এসে ওরা উপনিবেশ করে। তাই ওদের গান আমার অত পরিচিত। তা ছাড়া, এটাও আবিষ্কার করলাম যে, ভায়োলেটের কণ্ঠস্বর আমার ভাল লেগেছে, কেন না, তার স্বর যেমন হালকা, তেমনি মেয়েলী। স্পিং-এর চোখ দুটিও আমার বড় ভালো লাগে, সে দুটি যেমন ডাগর, তেমনি অশান্ত এবং কালো, একেবারে রাত্রির অন্ধকারের মতো কালো।

খাওয়া দাওয়া শেষ হতেই বৃদ্ধ খড়ের উপর শুয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল আর একটিও কথা না বলে। কিন্তু তার জিভটা তখনও নড়ছে, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। গভীর কৌতুকের সঙ্গে আমি তার দিকে চেয়ে রইলাম। ঘুমন্ত অবস্থায় কাউকে কখনও এরকম করতে দেখিনি।

'ওর দিকে অমন করে চেয়ে থেকো না!' ভায়োলেটের যে মেয়েলী কণ্ঠস্বর আমাকে মুগ্ধ করেছে সেই কণ্ঠস্বর তার কথায় ফুটে বেরুল। 'বরং চাঁদের দিকে দেখো, চাঁদের আলো আজ বড় মনোরম হয়েই দেখা দিয়েছে।'

মাথাটা একটু তুলে উঠোনে নজর দিতেই দেখলাম, নির্মেঘ আকাশ থেকে উজ্জ্বল চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। মধ্য চীনে জাপানী আক্রমণের পর থেকে এ কয় মাস চাঁদের কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

'বাঃ, কি চমৎকার। 'বলে উঠলাম! এমন সুন্দর জ্যোৎস্না বহুকাল দেখিনি। দারুচিনি গাছের সারির ফাঁক দিয়ে দূরান্তরের অস্পষ্টতার মধ্যেও চাঁদের মা বুড়ীকে দেখতে পাচ্ছি।' আমার উচ্ছ্বাসটা এত জোরে প্রকাশ পেল যে স্পিং রাগতস্বরেই আমাকে থামিয়ে দিল।

'চুপ!' উঠোনের এক কোণে যে অতি পুরানো বট গাছটি আছে সেটার দিকে ইসারা করে ও আমাকে বললে। 'ওই দেখো, কি হচ্ছে!'

গাছটার দিকে তাকালাম—একটা বিকটাকার গাঁটওয়ালা প্রাচীন গাছ, এক-

গাঁট রয়েছে যে ওটার বয়স কমসে-কম একশ বছর হবেই। এবং সেই সঙ্গে আরও দেখলাম যে, হেলে-পড়া গম্বুজের পালকের মত গোটাকয়েক পাতা নীচের দিকে ঝুলে আছে। উপরের দিকের ডালে পাখীর ডানা ঝাপটানোর শব্দও শুনলাম।

'ও তাই,' মনে মনে বললাম। ঘুমন্ত পাখী আমার কণ্ঠস্বরে ভয় পেয়ে গেছে, বেচারী।

'এ সম্পর্কে আমার একটা অনেক শোনা চলতি কথা মনে পড়ল,' স্প্রিং বলে চলল, তার স্বরে কোন উত্তেজনা নেই। 'যদি কেউ বার বার তিনবার কোন ঘুমন্ত পাখীর ডানার ঝাপটা শুনতে পায়, তা হলে সে একটি ভাল স্বপ্ন দেখে এবং সে স্বপ্ন নাকি সফলও হয়।'

ঔৎসুক্যের সঙ্গে প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, তা হলে তুমি ক'বার তা শুনেছ ?'

'ঠিক, তিন বার।'

'তা হলে তো ভালই হল, ভাল স্বপ্ন দেখবে।'

'বিশ্বাস করতে পারছি নে,' স্প্রিং ঠোঁট বাঁকিয়ে ক্ষীণ স্বরে জবাব দিল। 'ক'বছর ধরে, তো কেবল দুঃস্বপ্নই দেখে আসছি।'

'এর মধ্যে কি একটিও ভাল স্বপ্ন দেখোনি ? কি আশ্চর্য! আচ্ছা, কেন বল ত ?'

বুঝতে পারলাম আমার স্বরে খানিকটা আকুলতা ফুটে উঠছে। অন্য লোকের স্বপ্ন সম্পর্কে আমি কেন অতটা আগ্রহ দেখাব—ভেবে পেলাম না। শুধু তাই নয়, এতটা অধীরতাও আমাকে মানায় না।

স্প্রিং জবাব দিতে পারল না। সে শুধু তার চুলের মত কালো এক জোড়া চোখে বেড়ালের চোখের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে আমার পানে চেয়ে রইল। হয়তো সে একটার সঙ্গে আর একটা জিনিস গুলিয়ে ফেলেছে। সেটা কি, তাও বুঝতে পারছে না। তার এই অপ্রতিভ অবস্থাটা আমাকেও এমন অপ্রতিভ করে তুলল যে, তার চোখ ঝলসানো সরল চাউনির ভিতর আমি নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। বুদ্ধিমতী ভায়োলেট একটা ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমাদের নীরবতা ভেঙে দিল। সে বলল :

'তার কারণ, আমাদের জীবন অত্যন্ত অস্থির। চার বছর আগে জাপানীরা যখন আমাদের গ্রামটা পুড়িয়ে দেয় তখন থেকে আমরা একদিনের জন্যেও স্বস্তি পাইনি। আমরা যেখানেই যাইনা কেন, শত্রুরা আমাদের অনুসরণ করে।'

'এখন কিন্তু আমরা দস্তুর মত স্বস্তিতেই আছি।' হঠাৎ স্প্রিং নীরবতা ভঙ্গ করল। মনে হল, হয় তো ওর মনে কোন নতুন ভাব জেগেছে। 'গত

তিন দিন জাপানীদের কোন সাড়া শব্দই অবশ্য পাইনি।...'

এ সম্বন্ধে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহই রয়েছে। তাই আপন মনেই মাথা নেড়ে গোপনে ভাবলাম, 'সবুর কর, দেখতে পাবে।' কিন্তু ওদের মনের প্রশান্তি নষ্ট করতে প্রবৃত্তি হল না। তাই বললাম ঃ 'তা হলে তোমরা ভাল স্বপ্ন নিশ্চয়ই দেখতে পাবে। আচ্ছা, তোমরা কেমনতর ভাল স্বপ্ন দেখতে পেলে খুশি হও? তোমরা কি যাদুকরের যাদুদণ্ড চাও—যা ছোঁয়ালেই যে-কোন জিনিসই সোনা হয়ে যায়? না, একজোড়া ডানা, যাতে ভর করে তোমরা সুখের দেশে পাড়ি জমাতে পার? কি চাও তোমরা?'

'আমরা যাযাবরের মেয়ে, আমাদের অতটা বড় আশা নেই।' স্প্রিং একটি মৃদু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কথাটা বললে। 'আমি পড়াশুনা করতে চাই। লেখাপড়া শেখাই আমার ইচ্ছে। লেখাপড়া শিখতে পারলে গানের স্বরলিপি পড়তে পারব, নিজেও লিখতে পারব। ছেলে বেলায় মা যখন গান আবৃত্তি করতেন তখন থেকেই পড়াশুনা ভাল লাগত। মা বেশ ভাল নাচতে গাইতে পারতেন এবং বাবার চেয়েও ঢের বেশী উপার্জন করতেন।' হঠাৎ সে থেমে গেল। তারপর বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে স্বপ্ন ও বাস্তবে নিজেকে হারিয়ে ফেলল।

ভায়োলেটও উৎফুল্ল হয়ে উঠল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার কেন যেন সে একটু বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। সে যে গোপনে একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, এটা আমার নজর এড়াল না। সে বলল, 'আমিও লেখাপড়াই শিখতে চাই।'

'তাই নাকি? সত্যি লেখাপড়া শিখতে চাও!' স্প্রিং তার আচ্ছন্ন ভাব থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। 'সেদিন যখন তুমি গ্রামের ময়দানে নাচ দেখাচ্ছিলে, তখন গ্রামের জমিদার সেখানে দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তোমাদের নাচের তিনি বিশেষ তারিফ করেন, পরে বাবাকে বলেছিলেন, তিনি তোমাকে কন্যা হিসেবে দত্তক নিতে চান। তিনি তোমাকে স্কুলে দেবেন, ভাল করে লেখাপড়া শেখাবেন। বিশেষত তার স্ত্রী মারা গেছে, ছেলেমেয়েও কেউ নেই। আসলে তুমি ভণ্ড, তখন কিন্তু বলেছিলে যে তুমি আর কিছু চাও না, বাবার দারিদ্র্যকেই গ্রহণ করবে।'

কথা শুনে ভায়োলেট যেমন ভড়কে গেল, তেমনি ঘাবড়ে গেল, কি বলা উচিত, ঠিক করতে পারল না। শুধু আম্‌তা আম্‌তা করল ঃ 'বুড়ো শয়তানটা যা বলেছিল, কাজে সে তা করত না। অত বোকা নই, তার মতলব যেন বুঝিনে! আসলে তার মতলব ছিল অন্য রকম।'

'কে কোথায় আছ, রক্ষা করো, রক্ষা করো! ওই দেখো ও আমার স্ত্রীকে নিয়ে যাচ্ছে!' একটা বজ্রাঘাতের মত চিৎকার আমাদের কানে এসে

পৌঁছল। তৎক্ষণাৎ আমাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। চিৎকারটা আসছিল আমাদের বুড়োর কাছ থেকে। সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই খড়ের গাদায় নাক ডাকতে শুরু করল। আমার মনে হল, হয় তো একটা সাপ তার ঘাড়ে কামড়ে দিয়েছে, কেন না, এরকম নির্জন পরিত্যক্ত জায়গায় সাপ আসাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কাজেই একগাছি লাঠি জোগাড় করবার জন্যে আমি ছুটে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ভায়োলেট আমাকে বাধা দিল।

'ও কিছু না,' সে বললে। 'উনি স্বপ্ন দেখছেন। 'জাপানীরা যেদিন আমাদের গাঁয়ে ঢুকে আমার মাকে নিয়ে যায়, সেদিন থেকেই উনি মাঝে মাঝে এরকম করেন। তারপর মায়ের কি হল আমরা জানতে পারিনি। আমার বিশ্বাস, মা মরে গেছে।...'

সব বুঝতে পারলাম। কাহিনীটি বড় করুণ, কিন্তু বিস্তারিত জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলাম না, কেন না, তাতে ওদের মনে আরও আঘাত লাগতে পারে এবং আমারও মনে কম বেদনা লাগত না। আশ্চর্যের বিষয়, যুদ্ধের সময় লোকেরা যেন স্বভাবতই কেমন কোমল অন্তঃকরণ হয়ে পড়ে। তাই শুধু বললাম, 'যাক, এখন শুয়ে পড়া যাক। কাল থেকে তো আমার এই বাড়তি পেটটি ভরাবার জন্যে তোমাদের আরও খানিকটা বেশী মেহনত করতে হবে।' এবং শুভরাত্রি না জানিয়ে তাদের তরুণ মনে আশার ক্ষীণ আলো দেখাবার উদ্দেশ্যে শুধু বললাম: 'আমাদের দেশ থেকে যখন শত্রুরা সব চলে যাবে, দেশ যখন মুক্ত হবে, আমরা স্বাধীন হব, তখন সকলের জন্যে আমরা স্কুল প্রতিষ্ঠা করব। তখন প্রত্যেকে লেখাপড়া শিখবে, গানের স্বরলিপিও পড়তে পারবে।' এই বলেই আমি শয্যার আশ্রয় নিলাম।

পরের দিন প্রাতে আমরা পাশের এক গাঁয়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমি 'এরহু' বাজালাম আর বুড়ো বাজালেন তার ঢাক। মনে হল, আমি ভালই বাজিয়েছি, তবে অনেক দিন এমনি ধারা বাজাইনি। আমাদের বাজনা ও স্প্রিং-এর গান মিলে ভায়োলেটের নাচে নিশ্চয় একটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। আগেই বলেছি যে, সে ছিল দস্তুর মত যাকে বলে মোটাসোটা, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার বাজনার তালে তালে সে এমন স্বাভাবিক সুন্দর নেচেছিল যে, আমার মনে হল, ও যেন মৎস্যকন্যা, জলের উপর ভেসে বেড়াচ্ছে। নাচের সঙ্গে সঙ্গে সে গানও গাইছিল, তার কণ্ঠস্বর যেমন হালকা, তেমনি মেয়েলী। আমি নিজে মুগ্ধ হয়ে গেলাম এবং আমার বিশ্বাস, তরুণ গ্রামবাসীদের অন্তরও তেমনি বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে তার রক্তিম ঠোঁটে এক একবার করে ছোট্ট একটি কৃত্রিম হাসি খেলে গেলেও তাতে যে একটি করুণ বিষণ্ণতার ছাপ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই, আর সেই

কারণেই তা দর্শকদেরও চিত্ত আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। কিন্তু তা হলেও দর্শকের সংখ্যা বেশী ছিল না।

পেশাদার বাজিয়ের মত গম্ভীরভাবে আমি যন্ত্রটি বাজিয়ে চলেছি, আর বেচারী ভায়োলেট সেই প্রায় জনহীন গ্রাম্য মাঠে দর্শকদের প্রশংসাবাদ না পেয়েও একা একা নেচে চলেছে—কথাটা মনে হতেই মনটা আমার বড় দমে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা সম্পর্কেই আমার মনে একটা বেদনাবোধ ছিল। বুড়ো শেষের দিকে কয়েক মিনিট পাগলের মত ক্ষেপে গিয়ে ঢাক বাজিয়ে হঠাৎ ঢাকের কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে একখানি পাথরের উপর বসে পড়ে শ্রান্ত কণ্ঠে ভায়োলেটকে বলল : 'মা, এবারে একটু জিরিয়ে নে বাছা।' ভায়োলেট এরপর সোজা গিয়ে বাবার পাশে বসে পড়ল। তখনও কিন্তু তার মুখে সেই ভঙ্গীহীন হাসি ও বিষাদক্লিষ্ট চাউনি ছিল।

একটু বাদেই আমরা আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আর একটি গাঁয়ে যাত্রা করলাম। তখন মধ্যাহ্ন হয়ে গেছে। বড় রাস্তায় গিয়ে দেখতে পেলাম দলে দলে লোক চলেছে, তাদের মাথা নুয়ে পড়েছে, দোলনায় শিশু ও বোঁচকাগুলি পিঠে নিয়েছে, পিছন পিছন কুকুরগুলি জিভ বের করে চলেছে। তাদের কপাল সূর্যের তাপে পুড়ে যাচ্ছে, ঘাম চকচক্ করছে এবং টপ্‌টপ্‌ করে তাদের তোবড়ানো গালে এসে পড়ছে। দেখেই বুঝতে পারলাম—ব্যাপারটা কি। কিন্তু তবু নিশ্চিত জানবার জন্যে এক বুড়োকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম :

'জাপানীরা পিছনেই আসছে,' সে বলল। 'আজকে সকালেই একটা লোহার শকুন আমাদের গাঁয়ে ডিম ফেলেছে। ডিম ফুটে গিয়ে পঁচিশ জন মারা গেছে, তার মধ্যে ছ'জন শিশু আর তিনটে গরু।'

'নাঃ, এ পৃথিবীতে আর বাস করা চলল না!' বুড়ো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে উঠল। 'চার বছর ধরেই এই বীভৎসতাকে এড়িয়ে চলবার জন্যে পালিয়ে বেড়াচ্ছি কিন্তু কোথাও এতটুকু স্বস্তি পাচ্ছি নে।' তারপর সে মেয়েদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে উঠল, 'তোদের নিয়ে এখন আমি কি করি বল্‌ত মা? আমি ক্রমেই নির্জীব হয়ে পড়ছি, আর তোরাও ক্রমেই বড় হয়ে উঠছিস।...'

মেয়ে দুটি জবাব দিল না। তারা দুজনেই মাথা নীচু করে রইল, আর আমরা কায়ক্লেশে হাঁটতে হাঁটতে আর একটা গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলাম। গ্রামখানি খালি। এমনি করে তৃতীয় গ্রামে গেলাম, সেখানেও লোকজন কেউ নেই। আমাদের কারুরই কিছু খাওয়া হয়নি, রোজগারপাতিও কিছু হয় নি। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ও শ্রান্তিতে আমরা আর চলতে পারছিলাম না।

'বরং কাল যে মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলাম সেখানেই ফিরে যাই, কি বল ?' বুড়ো শেষটায় বলে উঠল। 'খামকা পথ চলে কোন ফয়দা নেই। তা ছাড়া, আমি আর চলতে পারছি নে।'

সঙ্গে সঙ্গে আমরা তার পিছন পিছন চললাম। মন্দিরে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন আর আমাদের দাঁড়াবার শক্তি রইল না। মেয়ে দুটি খড়ের গাদার উপর বসে পড়ল, তাদের পাশেই দেয়ালে ঠেসান দিয়ে আমি বসলাম আর বুড়ো বসল আমাদের সামনে। আমরা কেউ কথা বলতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল যেন আমাদের জিভ নেই। কিন্তু সেই মেয়ে দুটির নিরীহ চোখে একটা অসহায়, নির্বোধ ভাব, এবং সেই সঙ্গে এমনি একটা বিষণ্ণতার ছাপ আমার নজরে পড়ল—যা সকল ভাষাকে হার মানায়। তাদের দৃষ্টি বৃদ্ধের দিকে নিবদ্ধ, আর বৃদ্ধ তখন পাগলের মত নিজের টাক পড়া মাথাটা জোরে জোরে চুলকোচ্ছে, তার সর্বাঙ্গ ঘামে সপসপে হয়ে গেছে। হঠাৎ সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল ঃ

'কিছু তো খেতেই হবে। দেখি, জমিদার মশায়ের কাছ থেকে কিছু চাল ধার করতে পারি কি না।' এই বলেই সে ভায়োলেটের দিকে তাকাল। 'লোকটা বদমাস নয় বলেই মনে হচ্ছে। সে যখন তোকে দত্তক নিতে চাইছে, তখন তার যে অন্য কোন মতলব আছে তা কিন্তু আমার মনে হয় না।'

এই বলেই সে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। সত্যি সে বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তাই এ বয়সে তার পক্ষে ওরকম ছুটে যাওয়া ঠিক হয় নি। কিন্তু সে না গেলে আর কে যাবে ? এই প্রথম আমারও মনে হল, আমরা কত অসহায় !

ঘণ্টা দুই বাদে সে একটা থলেয় করে কিছুটা চাল নিয়ে ফিরে এল। আমরা সকলেই খুশি হয়ে উঠলাম। আমি ছুটে গিয়ে তার হাত থেকে থলেটা নিলাম, সেটা তখন আমাদের কাছে সোনার মত। স্পিং তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে ধরে খড়ের গাদায় বসিয়ে দিল, ভায়োলেট আস্তে আস্তে হাওয়া করতে লাগল। শরৎ কালে বিল থেকে যেমন কুয়াসার মেঘ ওঠে, তেমনি ওর কপাল থেকে ধোঁয়া বেরুতে লাগল। কিন্তু বুড়ো সন্তুষ্ট হতে পারে নি। ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠল ঃ

'তোরা সব বস দিকি।' তারপর একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভায়োলেটকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল ঃ 'ভায়োলেট, তোমার ব্যবস্থা করে এলাম। ব্যবস্থাটা নেহাৎ মন্দ নয়, খুব তাড়াহুড়ায় হয়ে গেল বটে, তবে তার জন্যে অবশ্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত।'

'কি বলতে চাও বাবা ?' ভায়োলেটের চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

'যে জমিদার মশায় চাল দিয়েছেন, তিনি বলেছেন—তিনি কে, তোমরা জান। তোমাকে তার বড় পছন্দ হয়েছে। কিন্তু তিনি এখন তোমাকে দত্তক নিতে পারবেন না, কেন না, এখানে কোন স্কুল নেই, পড়াশুনার সুবিধাও নেই। কাজেই তিনি তোমাকে বিয়ে করবেন। তবে কথা দিয়েছেন, তোমাকে সুখে রাখবেন।'

'তুমি কি তাঁকে কথা দিয়েছ ?' ভায়োলেট জানতে চাইল। তার কণ্ঠস্বরেও চোখ দুটির মতই একটা দুরন্ত ভাবের আমেজ।

'নিশ্চয়ই।'

'বাবা, আমি তোমার কাছেই থাকব !'

'দুর বোকা মেয়ে !' বাপ জবাবে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল। কিন্তু ক্রমে সে শান্ত হয়ে এল, বলতে লাগল, 'আমি জানি, তোমার পক্ষে সে একটু বেশী বয়সের, কিন্তু মা, আমার কাছে এমনি ধারা বেঁচে থাকার কথাটাও তো ভাবতে হবে। তোর বয়স বেড়ে যাচ্ছে। আমিও বড় তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে পড়ছি। জীবনে আর অবস্থার উন্নতি করতে পারব না। সে ধনবান। তার কাছ থেকে তোকে কোন বিষয়েই এতটুকুও ভাবতে হবে না। তোর ছেলেমেয়েরা স্কুলে লেখাপড়া শিখবে, শিক্ষিত হবে। আমি তোর কি হাল করেছি ভেবে দ্যাখ্ ঃ ভবঘুরের মেয়ের মতই তোকে তৈরি করেছি।...'

তার কণ্ঠস্বর ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে একসময়ে একেবারে নীরব হয়ে গেল।

ভায়োলেট মমির মতই নিঃশব্দে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। দূরে অস্পষ্ট একটা কোলাহল শোনা গেল। বৃদ্ধ পিতা মাথা তুলে ক্ষীণ স্বরে বলে উঠল, 'জমিদার মশায় তোকে নেওয়ার জন্যে লোক পাঠিয়েছেন। বুঝলে মা, শত্রুরা ক্রমেই কাছাকাছি এসে পড়ছে। আর দেরী করা চলে না। জমিদার শিগ্‌গির নিরাপদ কোন জেলায় সরে যাবেন। বোকামি করো না। যাওয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।'

ইতিমধ্যে একখানা পালকী এসে দরজার সামনে উপস্থিত হল। পালকীখানা লাল রঙের, তাতে কারুকার্যখচিত ঝালর ঝুলছে। তবে বিয়ের কনের যাওয়ার জন্যে যে পালকী ব্যবহৃত হয় এখানা সে পালকী নয়। দ্বিতীয় স্ত্রীর জন্যে কেউ বিয়ের পালকী পাঠায় না। ষণ্ডা প্রকৃতির একজন যুবক আর দু'জন পালকী বেহারা পালকীর সঙ্গে এসেছে, লোকটা জমিদারের গোমস্তা। পালকী বেহারারাও বেশ জোয়ান লোক, কোমর পর্যন্ত তারা উলঙ্গ, বাহুতে কঠিন মাংসপেশী। তাদের দেখে মনে হয় যেন তারা কাউকে গায়ের জোরে

অপহরণ করতে এসেছে।

বৃদ্ধ নড়ল না, এমন কি, ষণ্ডাগোছের গোমস্তাটাকে নমস্কার পর্যন্ত করল না। বাক্যহীন বোকার মত সে বসে রইল। তারপর হঠাৎ সে বলতে শুরু করল : 'সত্যি ভায়োলেট, আমার প্রতি যদি তোমার এতটুকু শ্রদ্ধা ভালোবাসা থাকে, তা হলে আমার কথা শোন। পালকীতে উঠে বসো। আমি তোমার বাপ, তোমাকে জন্মাতে দেখলাম, তোমাকে এত বড়টি হতে দেখলাম। তোমাদের সুখ শান্তি ছাড়া আমার জীবনে আর কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই। সুসন্তানের মা হও—এই কামনাই আমার রইল।'

ভায়োলেটের মুখে রা নেই। সম্মোহিতের মত সে ধীরে ধীরে গিয়ে পালকীতে উঠে বসল। ষণ্ডাগোছের গোমস্তাটা তাড়াতাড়ি পালকীর দরজা বন্ধ করে দিল। বেহারারা অতি সহজে সাধারণ মালের মতই পালকীটা কাঁধে তুলে নিয়ে চলে গেল। ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে এল বটে কিন্তু পশ্চিমাকাশে একটি অসম্পূর্ণ মনোজ্ঞ রামধনু দেখা দিল। কোথাও ঝড় হয়েছে নিশ্চয়, কেন না, ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। হাওয়ায় বটপাতাগুলির খস্‌খসানি শুরু হয়েছে, তারা যেন গাইছে এবং একই সঙ্গে নালিশও করছে।

হঠাৎ একটা আর্ত কান্না গুমরে উঠল। কোন হতভাগিনী মা সন্তানের শোকে গলি পথে যেন ডুকরে কেঁদে উঠে বাতাসকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। কান্নার গভীরতা থেকেই বুঝতে পারলাম—এ কান্না ভায়োলেটের। কিন্তু অবিলম্বেই সে কান্না অস্পষ্ট হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তারপর আবার সেই মৃত্যুর মত নিস্তব্ধতা, চারিদিকের সূচীভেদ্য অন্ধকার, রামধনুর শেষ খিলানটি কিন্তু তখনও জ্বলজ্বল করছে।

আমার মনটা এমন ভারী হয়ে রয়েছে, যে মনে হচ্ছে যেন কোন গুরুভার চেপে বসেছে। আমি এক রকম চেঁচিয়ে উঠলাম : 'এই আমাদের পূর্ব পুরুষদের জন্মভূমি ; এই আমাদের জীবন !' মনে হল, এর থেকে এখন আর আমাদের পরিত্রাণ নেই। কোথাও গিয়ে কেউ আশ্রয় নিতে পারে না। এই দেশেই আমি জন্মেছি, এখানেই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। কাজেই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আমি বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে গেলাম, সে তখনও চোখ দুটি বুজেই রয়েছে।

বললাম, 'কর্তা, ঘুমের ব্যাঘাত করার জন্যে মার্জনা করো। শত্রুদের সঙ্গে লড়বার জন্যে আমি গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিতে চাই। তোমাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে, এর জন্যে আমি দুঃখিত।'

বুড়ো চোখ মেলে অর্থহীন দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাল, তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'বেশ। আজকের পৃথিবীটা তোমাদেরই। কিন্তু সারাদিন

তো কিছু খাওয়া হয়নি, রাতে খাওয়া দাওয়া কর, কাল সকালে যেয়ো।'
তারপর আবার চোখ বুজল। সে কিছু খেতে রাজী হল না।

একটু নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লাম। কাজেই স্পিং-এর দিকে নজর দিলাম। সে তখন বেদীর সামনে খড়ের উপর একা বসেছিল। আমার মনে হয়েছিল, ও নিশ্চয়ই দিদির জন্যে গোপনে চোখের জল ফেলছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ও কাঁদেনি। ও তখন রামধনুর শেষ খিলানটি ও বটপাতার খসখসানির দিকে লক্ষ্য রেখে আপন মনেই ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে ঃ 'আশ্চর্য, কাল রাতে স্বপ্ন দেখলাম না! অথচ পাখীটার ডানা ঝাপটানোর শব্দ তিন তিন বার স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলাম।...'

'এ কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়,' আমি মন্তব্য করলাম।

সঙ্গে সঙ্গে ও চম্‌কে উঠল।

'না, না, তা নয়। আমার মা বিশ্বাস করতেন কি না,' ও তাড়াতাড়ি বলে উঠল। আমার উপস্থিতিতে ও যেন আঁতকে উঠল। 'আচ্ছা, তুমি কি সত্যি লেখাপড়া কর?'

'নিশ্চয়ই।'

'আচ্ছা, তা হলে ভালই হল। আমাকে বর্ণ-পরিচয়টা শিখিয়ে দাও না।' ওর সুরে অনুনয়। সঙ্গে সঙ্গেই আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে আমাকে ওর পাশে বসিয়ে দিল। 'আর এখন আমাদের নষ্ট করবার মতো সময় নেই। বর্ণপরিচয়টা আমাকে এখুনি শিখিয়ে দাও। আর সময় নষ্ট করতে পারিনে।'

একটা কাঠি দিয়ে বালির উপরে গোটা কয়েক অক্ষর বড় বড় করে লিখলাম। প্রথমটা রামধনু (হুঙ্)। 'এ অক্ষরটার দু-অংশ,' আমি ওকে বুঝিয়ে বলতে লাগলাম, 'বাঁ দিকের অংশটার মানে কীট, আর ডান দিকেরটার মানে শিল্প। কাজেই, রামধনু হচ্ছে একটা শৈল্পিক কীট।'

'আমাদের ভাষাটা কেমন কবিত্বময়।' আনন্দে ও হয়ে উঠল উচ্ছ্বসিত আর চোখ দুটো হয়ে উঠল উজ্জ্বল। 'আমি যদি লিখতে পড়তে জানতাম! কবে যে শিখব, ভগবান জানেন! মায়ের গানগুলিই আগে লিখতে পড়তে শিখব।'

'দুর বোকা!' চেঁচিয়ে উঠলাম। আমার মনে হল, সমস্ত অবস্থাটা কি রকম হাস্যকর। ও যেন আমাদের ভাষার কবিত্বগুণ ছাড়া আর সব কিছুই, এমন কি, ওর দিদির ভাগ্য বিপর্যয় পর্যন্ত ওর মনে নেই। এতে আমার মনটা আরও বিষণ্ন হয়ে পড়ল। আমাদের বর্ণমালার গড়ন সম্পর্কে আলোচনা করবার আগ্রহটাও আমার আর রইল না। অবসাদের ভান করে

আমি শুয়ে পড়লাম বটে কিন্তু ঘুমোতে পারলাম না। ভায়োলেটের কথা ভাবতে লাগলাম, তার সেই হালকা মেয়েলী কণ্ঠস্বর, তার রক্তিম ওষ্ঠপুট এবং বিষাদ মাখা হাসি—সব কিছু মনে পড়ল। তার হাসি সময় সময় আমার অন্তরটা মুচড়ে দিত।

পরদিন প্রাতে আমিই সর্বাগ্রে ঘুম থেকে উঠলাম। আমাদের দলের অধিকারী ও স্পিং-এর কাছে বিদায় নিয়ে যাত্রা করব ঠিক করলাম। কিন্তু বুড়ো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হওয়ার ভান করেছিল, কেন না, তার চোখের পাতা মাঝে মাঝে মিট মিট করছিল। সে হয় তো গোপনে কাঁদছে, তাই আমি মুখ খুলতে সাহস পেলাম না। আর স্পিংও তখন পাথরের মত অনড় হয়ে আছে। কাজেই তাদের কাছে বিদায় না নিয়েই চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। কিন্তু যেই আমি পা বাড়াচ্ছিলাম ঠিক তখনই মেয়েটি হঠাৎ চোখ মেলল, তার সে দৃষ্টি যেমন উদাসীন তেমনি করুণ, অশ্রুসজল ; দিনের আলোয় চক্ চক্ করছে।

'তা হলে তুমি চললে ?' ও জিজ্ঞাসা করল। 'জান, কাল রাতে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি !'

'ভাল স্বপ্ন, নিশ্চয়ই ?' আমার কণ্ঠস্বরে একটা বিষণ্ণতার আমেজ।

'হ্যাঁ, ভাল স্বপ্ন,' তার মুখে জোর-করে-আনা একটি করুণ হাসি ফুটে উঠল। 'স্বপ্নে দেখলাম, দিদির বিয়ে হয়েছে একটি প্রিয়দর্শন ছাত্রের সঙ্গে। দিদি এখন লেখাপড়া শিখছে, গানের স্বরলিপি পড়তে, লিখতে শিখেছে। ...'

বলতে যাচ্ছিলাম, 'তাই যেন হয়।' কিন্তু কি একটা অজানা শক্তি যেন আমার জিভটাকে চেপে রাখল। বোকার মত মেয়েটির সুমুখে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'তা হলে বিদায়,' মেয়েটি অবশেষে আমাকে বলল। কিন্তু তার চোখ দুটি ক্রমেই চঞ্চল হয়ে উঠল, ও কি যেন বলতে চায়। অথচ আমি বুঝতে পারছিনে।

ওদের ছেড়ে আমি চলে এলাম। অনেক দিন আমি ওর সে দৃষ্টির মানে বার করতে চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি। কিন্তু এখন যেন বুঝতে পারছি বলে মনে হয়।

অনুবাদ / পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

মা ॥ দ্রৌপদী

মহিলার স্বামী চামড়ার ব্যবসা করত। গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে গরুর চামড়া এবং গ্রামাঞ্চলের শিকারীদের কাছ থেকে বুনো পশুর চামড়া সংগ্রহ করে বড় শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করাই ছিল তার প্রধান কাজ। ব্যবসা ছাড়া মধ্যে মধ্যে সে একটু আধটু ক্ষেত খামারের কাজও করত। ধান চাষের ভরা মরসুমে চাষীরা যখন ক্ষেতের কাজ নিয়ে হিমশিম খায় তখনই তার ডাক পড়ে। ধানের বিয়ান এক জায়গা থেকে তুলে অন্য জায়গায় পুঁতে দেবার কাজে সে পটু বলেই এই সময় চাষীরা তাকে বেশী মজুরী দিয়েও কাজে নেয়। চারা গাছের সারি পর পর সাজিয়ে নিখুঁত ভাবে সোজা করে পুঁতে দিতে তার জুড়ি নেই। ধানের ক্ষেতে পাঁচজন চাষী এক সঙ্গে কাজ করতে নামলে তাকেই সর্বাগ্রে থাকতে হয় নিশানা ঠিক রাখার জন্য।

এসব গুণ থাকা সত্ত্বেও সে তার ভাগ্যের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। জীবন থেকে বছরগুলো একটি একটি ক'রে পার হ'য়ে যায় আর তার ঋনের বোঝাটাও পাহাড় প্রমাণ হয়ে ওঠে। অভাব অনটনের সঙ্গে লড়তে গিয়ে ব্যবসায়ী মানুষটা একেবারে থেঁতলে গেল। কঠিন বাস্তবের কষাঘাত ভোলবার জন্যই হয়ত এই সময় সে নিজেকে ধূমপান, মদ্যপান আর জুয়া খেলার বদ নেশায় ডুবিয়ে দিল। নেশা করলে মেজাজ মর্জি রুক্ষ খিট্‌ খিটে হবে তাতে আর আশ্চর্য কি! দারিদ্র্য তার সম্বল কেড়ে নিয়েছে। এখন কেউ আর তাকে একটি পয়সাও ধার দিতে চায় না।

দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে নানা রোগও যেন লোকটাকে ছেঁকে ধরলো। গায়ের রং বিবর্ণ হলদে হয়ে গেছে। মুখের দিকে আর চাওয়া যায়না। হলদে হ'তে হতে একটা পিতলের কলসীর রূপ নিয়েছে। এমনকি চোখে যেটুকু সাদা অংশ আছে, তার রংও ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। সকলেই বলতে শুরু করলো লোকটাকে শেষ পর্যন্ত ন্যাবা রোগে ধরেছে। ছোট ছেলেমেয়েরা তাকে দেখলেই খিল্‌ খিল্‌ করে হাসে আর বলে, "ও পিলে পেট, পিলে পেট! তোমার পেটে পিলে হয়েছে?"

জীবন যুদ্ধে পরাজিত খেটে খাওয়া মানুষটা হতাশায় অবসন্ন হয়ে অবশেষে একদিন স্ত্রীকে বলল, "আর আমার কোন উপায় নেই। এভাবে আর ক'টা দিন চললে আমাদের কেটলিটা পর্যন্ত অন্যের কাছে বাঁধা পড়বে। এখন একমাত্র পথ তুমি যদি তোমার দেহের বিনিময়ে আমাদের বাঁচাতে পার।

আমার সঙ্গে এই অসহায় দাম্পত্য জীবন যাপন করে মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন লাভ হবেনা তোমার।"

তার স্ত্রী বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে প্রশ্ন করল, "কি বললে! আমার দেহের বিনিময়ে?"

সে তখন মাটির উনুনের পাশে বসে তার তিন বছরের ছোট ছেলেটাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিল। স্বামীর প্রস্তাব শুনে মাতৃ হৃদয় মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। রুগ্ন স্বামী তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব চড়িয়ে আবার বলল, "হ্যাঁ, তোমার দেহ। আমি ইতিমধ্যেই টাকার বিনিময়ে তোমাকে বন্ধক রাখার প্রস্তাবে রাজী হয়েছি।"

"সেকি!"

স্ত্রীর কণ্ঠস্বর ছুরিকাহত মানুষের অসহায় মিনতির মত শোনাল। কিছুক্ষণের জন্য কারও মুখ থেকে আর টুঁ শব্দটি বেরল না। একেবারে নীরব। নিজেকে খানিকটা সংযত করে নিয়ে তার স্বামীই এবার বলল, "তিন দিন আগে সেই নেকড়ে "ওয়াঙ্" তার পাওনা টাকার জন্য বিশ্রী ভাষায় তাগাদা দিয়ে গেছে। নেকড়েটা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও বেরিয়ে পড়েছিলাম। আনমনা হয়ে হাঁটতে হাঁটতে যখন 'নয় একর দিঘী'র কাছে পৌঁছলাম তখন আমার মনে হল এরপর আমার আর একদণ্ডও বেঁচে থাকা উচিত নয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা মগডালে চড়ে দিঘীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বো। কিন্তু গাছে চড়ে ঝাঁপ দেবার মত শক্তি শরীরে ছিল না। মনে তেমন সাহসও পেলাম না। লক্ষ্মীছাড়া একটা পেঁচা সর্বক্ষণ আমার কানের কাছে বিশ্রী সুরে চেঁচাচ্ছিল। এতেই বোধ হয় আমি মনের বল হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাই ওখান থেকে সরে এলাম। ফেরার পথে রাস্তায় দেখা হল সেই ঘটকী শান মেয়ের সঙ্গে। সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, এতক্ষণ আমি বাইরে কি করছিলাম। লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে তার কাছে কিছু টাকা ধার চেয়ে বললাম, যদি ধার দেওয়া একান্তই সম্ভব না হয় তবে মেয়েদের কিছু পুরনো কাপড় চোপড় বা গয়নাগাটি বন্ধক রেখে সে যেন কিছু টাকার বন্দোবস্ত করে দেয়। কারণ পাওনাদার ওয়াঙ্-এর নেকড়ের মত সবুজ চোখ দুটোর জ্বলুনি আর আমি সইতে পারছি না। সান মেয়ে প্রথমে আমার কথা হেসেই উড়িয়ে দিল। পরে বলল, 'তোমার অবস্থা যখন এতই খারাপ তখন বউকে আর বাড়িতে রেখে পুষছো কেন? নিজের চেহারাতো প্যাঁকাটির মত হয়েছে। চোখ মুখের রংও হলদে পাশুটে।'

"আমি মাথা নীচু করে রইলাম। কিছু বলতে পারলাম না। সান্ মেয়ে বলেই চলল, 'অবশ্য তোমার ছেলেকে আমি ছাড়তে বলছি না। ঐ

একটাতো ছেলে বাছা! কিন্তু তোমার বউ......'

"এই বলে সে একটু থামল। আমি মনে মনে শংকিত হলাম। বৌকে বেচে দেবার কথা বলছে না তো! সান মেয়ে বলতে লাগল, 'অবশ্য ও তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, সহধর্মিণী। কিন্তু তুমি যে গরীব! একেবারেই অসহায় এবং অসুস্থ। এ অবস্থায় বৌকে ঘরে রেখে লাভ কি?' একটু থেমে সে আসল কথাটা পাড়ল। 'একজন "শিউচ্ছায়" * ধনী লোকের সন্ধান আছে। যদিও তার বয়স বেশী তবু ভেবেছিলো টাকার বিনিময়ে একজন তরুণী রক্ষিতা ঘরে আনবে। তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী তাতে রাজী নয়। তার স্ত্রী বলেছে, তিন বা পাঁচ বছরের জন্য কোন মেয়েছেলেকে যদি তার স্বামী বন্ধক নেয় তবে তাতে সে রাজী আছে। "শিউচ্ছায়" লোকটি আমাকে পছন্দসই একজন মহিলার খোঁজ নিতে বলেছে। বয়স ত্রিশের মধ্যে থাকলেই ভাল হয়। তবে ইতিমধ্যে দুই বা তিন সন্তানের মা হয়েছে এমন মেয়ে চাই। তাছাড়া তাকে খুব সৎ হতে হবে এবং স্বেচ্ছায় এই শর্ত মেনে চলতে হবে। তাছাড়া তার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কাছে বিনয়ী ও বাধ্য থাকতে হবে। এই সেদিনই নাকি শিউচ্ছায়ের স্ত্রী তাকে বার বার করে বলেছে, যদি সব শর্ত সন্তোষজনক হয় তাহলে সে ৮০ থেকে ১০০ "য়ুয়ান" পর্যন্ত মূল্য দিতে রাজী। আমি সেই থেকে খুঁজছি। কিন্তু তেমন মহিলা খুঁজে পেলাম না।'

"আমার সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই সান্ মেয়ের নাকি তোমার কথা মনে পড়েছে। তার মতে, তুমি সর্বদিক থেকেই উপযুক্ত। তাই সে সরাসরি আমার কাছে প্রস্তাব উত্থাপন করলো। অনেকক্ষণ ভেবে আমি রাজী হয়ে গেলাম।" এই পর্যন্ত বলে লোকটার মাথা আপনিই নুয়ে এলো। তার স্ত্রী এ ব্যাপারে একটি কথাও বলল না। মনে হল, সে যেন কি এক অসহ্য বেদনায় হতচেতন হয়ে পড়েছে। তার স্বামী অবশ্য বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতে পারল না। যেমন করেই হোক কথাটা যেন তার শেষ করাই চাই। সে বলতে লাগল, "সান্ মেয়ে কালই "শিউচ্ছায়" লোকটির বাড়ি গিয়েছিল। সব শুনে তার খুবই পছন্দ হয়েছে। প্রথম পক্ষের স্ত্রীও নাকি খুশী মনেই তোমাকে নিতে চেয়েছে। দাম দেবে ১০০ "য়ুয়ান"। তিন বছরের জন্য বন্ধক। ঐ তিন বছরের মধ্যে যদি কোন সন্তান না হয় তাহলে পাঁচ বছর। সান্ মেয়ে তারিখও ঠিক করে ফেলেছে। আগামী আঠারোই—মাঝে আর পাঁচদিন আছে। বন্ধকের চুক্তিপত্র সই ক'রে আজই পাঠাবে।"

সব কথা শুনতে শুনতে স্ত্রীর সমস্ত শরীর থর্ থর্ করে কাঁপছিল। সে

---

* গ্র্যাজুয়েট

পাগলের মত বলে উঠলো, "তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন ? এ তুমি কি করলে ?"

তার স্বামীর ক্ষীণ কণ্ঠের জবাব শোনা গেল। "কাল তিন তিনবার ঘুরে গিয়েছি। কিছুতেই বলতে পারিনি। তুমি তো বুঝতে পারছ সব ! কিছু টাকা সংগ্রহ করা ছাড়া এখন আর কোন পথ খোলা নেই।"

কথা বলতে গিয়ে তার স্ত্রীর দুই ঠোঁট অসহায় ভাবে কেঁপে উঠলো। "তুমি কি শেষ কথা দিয়ে ফেলেছো ?"

"হ্যাঁ, আমি শুধু লিখিত চুক্তিটা হাতে পাবার অপেক্ষায় আছি।"

তার স্ত্রী তখন দুই হাতে নিজের চোখ মুখ চেপে ধরে আহত কণ্ঠে কঁকিয়ে ওঠার মত বলল, "ওঃ ! কি লজ্জা ! ওগো, এছাড়া আর কি কোন উপায়ই নেই ? আমি যে মা ! আমার বসন্ত মণির কথাও একবার ভাবলে না ?"

এই পর্যন্ত বলে সে তার কোলের ছেলেকে আরও কাছে নিয়ে বুক ফাটা কান্নায় ভেঙে পড়লো।

"লজ্জা ! হ্যাঁ, আমিও তা ভেবেছি। কিন্তু আমরা গরীব। মরতে যদি না চাই তবে এছাড়া আমাদের আর কি পথ আছে বল ? আমার শরীরের হাল খুবই খারাপ। এ বছর হয়ত ক্ষেতের কাজেও জন খাটতে পারব না।"

"সবই বুঝি ! কিন্তু বসন্ত মণির কি হবে ? ওর তো বয়স মাত্র তিন বছর। মা ছাড়া ছেলেটা বাঁচবে কেমন করে ?"

"কেন ? আমি ওর দেখাশোনা করব। পারব না ? ছেলের তো এখন বুকের দুধ ছেড়ে ভাত মাছ ধরার সময় হয়েছে।"

মনে হল কথা বলতে বলতে তার স্বামী ক্রমে রেগে যাচ্ছে। নিজের ভিতরের উত্তেজনাকে সংযত করার জন্যই বোধ হয় সে সেখান থেকে উঠে দরজার বাইরে চলে গেল। তার রুগ্ন কোটরগত দুই চোখে অশ্রু বিন্দু। তিন বছরের ছেলেকে বাপ মানুষ করবে এই কথা ভাবতে গিয়ে মায়ের মনে পড়লো এক বছর আগের একটি ঘটনা। ঠিক এক বছর আগে তার কোলে একটি ফুটফুটে মেয়ে এসেছিল। তখনও সে প্রসব বেদনায় বিছানায় মৃতপ্রায়। একেবারে মরে যাওয়া বোধহয় এত যন্ত্রণাদায়ক নয়। মেয়েটি ভূমিষ্ঠ হবার পর তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে আছে। ঘরের শুকনো ঘাসের ওপর শুয়ে নবজাত শিশুটি ছোট্ট হাত-পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ক্যাঁ ক্যাঁ করে কাঁদছিল। সবে মাত্র নাড়ি কেটে মায়ের শরীর থেকে শিশুটিকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। জড়িয়ে জড়িয়ে চেঁচাচ্ছিল বাচ্চাটা। মায়ের মন মানে না। ঐ মৃতপ্রায় অবস্থায়ও সে উঠতে চেয়েছিল শিশুটিকে পরিষ্কার করে দেবার জন্য। অনেক চেষ্টায় সে শুধু তার মাথাটাকেই নাড়াতে পেরেছিল।

শরীর টেনে তোলার শক্তি ছিল না। তারপর সে দেখল নরপশু স্বামী এক বাল্‌তি গরম জল নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। রাগে তার চোখ মুখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছিল। স্ত্রী তখন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল, "ওগো! থামো! থামো!"

কিন্তু ওই নরপশু তাকে আর কিছু বলবার সুযোগ দিল না। কষাই যেমন মেষ শাবককে শক্ত হাতে চেপে ধরে বলি দেয় তেমনি নবজাত শিশু-টিকে তুলে নিয়ে গরম জলের বালতির মধ্যে ছেড়ে দিল। গরম জলের মধ্যে ডুবে যাবার আগে কচি মেয়েটার কঁ্যা কঁ্যা দু'টো চিৎকার মায়ের কানে পৌঁছেছিল। এখন তার মনে পড়ছে সন্তানের এই নির্মম মৃত্যু দেখেও কেন জোরে চিৎকার করে বাধা দিতে পারেনি। কচি শিশুর এই মর্মান্তিক করুণ মৃত্যু কেন সে নীরবে মেনে নিয়েছিল? কারণ সে তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলে-ছিল। সেই মুহূর্তে কে যেন তার হৃদয়টাকে এক কোপে দু'টুকরো করে দিয়েছিল। অতীতের এই স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে তার চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। কঠিন মর্ম বেদনায় সে হাঁ হাঁ করে উঠলো, "একি পোড়া কপাল আমার!"

বসন্ত মণি এই সময় মুখ থেকে মাইয়ের বোঁটা ছেড়ে দিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "মা, মা! ওমা!"

এ বাড়ি থেকে চলে যাবার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা ঘরের সবচেয়ে অন্ধকার কোণটাই সে বেছে নিয়েছিল। স্টোভের সামনে একটা কেরোসিন তেলের বাতি জোনাকি পোকার মত টিম্‌ টিম্‌ করে জ্বলছিল। ছেলেকে কোলের আশ্রয়ে জড়িয়ে রেখে গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল মা। মন চলে গিয়েছিল অনেক অনেক দূরে। সে যে কত দূরে তা সে নিজেই জানে না। ধীরে ধীরে চিন্তার সূত্র যখন ফিরে এলো, কোলের ছেলের কাছে মুখ নামিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকলো, "বসন্ত মণি, আমার সোনা।"

"কি মা?"

মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে উত্তর দিল ছেলে। "তোমার মা তো কাল অনেক দূরে চলে যাবে।"

কিছু না বুঝেই বাচ্চাটা বলল, "হুম।"

তারপর তার নিত্যদিনের অভ্যাস মত মায়ের পায়ের সঙ্গে মাথা ঘষ্‌তে লাগল।

"তোমার মা আর ফিরে আসবে না। তিন বছরের মধ্যে সে আর কোনদিন তোমার কাছে আসতে পারবে না।"

এমনি দু'একটা কথা বলে সে থেমে থেমে চোখের জল মোছে। ছেলে মুখ তুলে শুধায়, "মা, কোথায় যাবে তুমি ? ওই মন্দিরে ?"

"নাগো সোনা, তোমার মা যাচ্ছে দশ মাইল দূরে আর এক বাড়িতে।"

"আমিও যাব।"

"না বাবা। তোমাকে যেতে নেই।"

ছেলে বিদ্রোহ করে বলল, "আমি যাবই।"

তারপর সে এ ব্যাপারে নিরুৎসাহ দেখিয়ে মায়ের মাইয়ের বোঁটা নিয়ে খেলতে লাগল। "তুমি বাবার সঙ্গে বাড়িতে থাকবে। বাবা তোমার সব কিছু করে দেবে। তোমাকে নিয়ে ঘুমোবে, খেলতে যাবে। লক্ষ্মী সোনা, বাবার অবাধ্য হয়োনা। সব কথা শুনবে তারপর তিন বছর হয়ে গেলে......"

"বাবা আমাকে মারবে।" বলতে বলতেই তিন বছরের ছেলেটা কেঁদে ফেলল। মা তার ডান গালে হাত রেখে তেমনি ধরা গলায় বলল, "বাবা আর কোনদিন মারবে না তোমায়।"

তার গালের ঠিক ঐ জায়গাতেই একটা বড় ক্ষত চিহ্ন ছিল। নবজাত মেয়েটাকে খুন করার তিনদিন পরে তার বাবা কাস্তের বাঁট দিয়ে পিটিয়ে এমনি ঘা করে দিয়েছিল ছেলের গালে। ছেলের সঙ্গে আজ মায়ের কেবল কথা বলতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু বেশী কথা বলা হল না। তার স্বামী সেই সময় দীর্ঘ পদক্ষেপে দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলো। স্ত্রীর সামনে এগিয়ে গিয়ে ডান হাত পকেটে ঢুকিয়ে বলল, "আমি সত্তর য়্যুয়ান হাতে পেয়ে গেছি। বাকী ত্রিশ য়্যুয়ান তুমি সেখানে পৌঁছবার দশদিন পরে পাবে।"

এই পর্যন্ত বলে সে থামল। "তোমাকে নেবার জন্যে তারা একটা ডুলি পাঠাতে রাজী হয়েছে।"

আর একবার ঢোক গিলে নিল সে।

"ডুলি বাহকরা সকাল বেলার জলখাবার খেয়েই চলে আসবে।"

কথা ক'টা বলার পর সে আর এক মুহূর্তও দেরী করল না। যেমন এসেছিল তেমনি নীরবে বাইরে বেরিয়ে গেল। রাত্রে স্বামী স্ত্রীতে আর কোন কথা হল না। কেউ কিছু খেলও না।

পরদিন ভোরবেলা থেকেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। ডুলী এসে পৌঁছেছিল ভোরের অনেক আগে। বসন্ত মণির মা সারারাত দুই চোখ এক করেনি। প্রথমে সে তার ছেলের পুরনো ছেঁড়া জামা প্যাণ্ট ক'টা রিপু করে তালি দিয়ে ব্যবহারের যোগ্য করে তুলেছে। বসন্তকাল প্রায় শেষ। এর পরেই তো গ্রীষ্মকাল। তবুও সে ছেলের কোটটা নামিয়ে সম্ভব মত জোড়া তালি দিয়ে রাখল। যাবতীয় পোশাক ও ভাঙাচোরা

খেলনা ইত্যাদি যেখানে যা ছিল এক সঙ্গে জড়ো করে স্বামীর বিছানার পাশে রেখে অনেকক্ষণ কাঁদলো। তার স্বামী তখনও ঘুমিয়েছিল। ছেলের সম্বন্ধে কয়েকটি জরুরী কথা স্বামীকে সে বলতে চেয়েছিল। একটা দীর্ঘ রাত শেষ হয়ে গেল কিন্তু মুখ ফুটে সে কিছু বলতে পারল না। দুই একবার ডেকেও ছিল সে। তার গলার স্বর এতই অস্পষ্ট ছিল যে তার স্বামী কিছুই শুনতে পায়নি। সারা রাত তার অবচেতন মনে এক অজানা বোবা ভয় তাকে নীরব করে রেখেছিল। শেষ রাতের দিকে বসন্ত মণি সজাগ হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। মা তাকে স স্নেহে কোলে তুলে নিয়ে বলল, "ওরে বসন্ত মণি, আমার মাণিক! খুব শান্ত হয়ে থেকো সোনা। একটুও কান্নাকাটি করো না। শান্ত হয়ে থাকলে বাবা তোমাকে কখনো মারবে না। আমি আসার সময় তোমার জন্য অনেক চকোলেট নিয়ে আসব। একদম কাঁদবে না।"

বসন্ত মণি এর কিছুই বুঝতে পারে না। সে তার অভ্যাস মত মায়ের গলা জড়িয়ে গান শুরু করে দেয়। মা ছেলের দুই ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলে, "গান গেও না মাণিক। তোমার বাবার ঘুম ভেঙে যাবে!"

এমনি ভাবেই রাত কেটে গেল।

দরজার সামনে একটা বেঞ্চির উপর ডুলি বাহকরা বসেছিল। লম্বা পাইপে ধূমপান করতে করতে ওরা যে যার গল্পে মশগুল। একটু পরেই ঘটকী সানু মেয়ে পাশের গ্রাম থেকে এসে হাজির হল। সানু মেয়ে বর্ষীয়ান মহিলা। ঘটকালীতে যেমন পাকা সংসারের বৈষয়িক ব্যাপারে ততোধিক অভিজ্ঞ। ঘরে ঢুকেই সে তার বর্ষাতির জল ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "এই দেখোনা, কেমন গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। খুব শুভ লক্ষণ। সুখে সম্পদে সংসার ভরে উঠবে।"

বেশ ব্যবসায়িক ভারিক্কি চালে ঘরের মধ্যে কয়েক বার ঘুরপাক খেলো সানু মেয়ে। তার সাধারণ অর্থ হল, এ ধরনের একটা ঘটনা ঘটানো সত্যিই প্রশংসনীয়। তারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে উভয় পক্ষের লাভজনক কেমন একটা সুন্দর চুক্তি কত সহজে সম্পাদিত হয়ে গেল। এবার সে মনের ভাবটা ভাষায় প্রকাশ করে ফেলল "বুঝলে বসন্ত মণির বাপ, সত্যি কথা বলতে কি, লোকটা যদি আর মাত্র পঞ্চাশ য়ুয়ান খরচ করতো তাহলে সে একটি সুন্দরী তরুণী রক্ষিতা ঘরে আনতে পারত।"

এ যেন তার অকাট্য যুক্তি। এ যুক্তি খণ্ডন করার জন্য কেউ কিছু বলুক তা সে চায় না। সে বরং বসন্ত মণির মাকে তৈরি হবার জন্য ধন

ঘন তাড়া দিতে থাকে। বসন্ত মণির মা ছেলেকে বুকে আঁকড়ে ধরে নিশ্চল পাথরের মত বসেছিল। কারও কোন কথা তার কানে যাচ্ছিল না। বৃদ্ধা ঘটকী তখন তার কণ্ঠস্বর পঞ্চমে তুলে বলল, "এত দেরী করলে চলে না। ডুলী বাহকেরা বাড়ি গিয়ে ভাত খাবে বুঝতে পারছ। তাড়াতাড়ি চলো।"

বসন্ত মণির মা তার দুটি করুণ মিনতি ভরা চোখ বৃদ্ধার চোখের দিকে তুলে যেন বলতে চাইছে, "ওগো, আমাকে যেতে বলনা। এখানে না খেয়ে মরব, সেও আমার ভাল।" অভিজ্ঞ ঘটকী তার মনের ভাষা বুঝতে পারল। সে তার কাছে গিয়ে ইংগিতের হাসি হেসে বলল, "তোমার যা রূপ তাতে তুমি পুরুষের মন কেড়ে নিতে পারবে। বলো তো, ওই পিলে পেট মিনসেটা তোমাকে কি দিয়ে সুখী করবে? যে পরিবারে তুমি যাচ্ছ সেখানে খাওয়া পরায় কোন অভাব নেই। একশ একর জমিতে চাষ হয়। কত টাকার মালিক সে। নিজের বাড়ি। কত জন-মজুর, হালের গরু বারমাস খাটে। বুঝলে বসন্ত মণির মা, লোকটার স্ত্রীর অন্তঃকরণও খুব ভাল। সকলের প্রতি অমায়িক ব্যবহার। কারও সঙ্গে আলাপ হলে তাকে দুটো না খাইয়ে ছাড়ে না। তার স্বামী তো লেখাপড়া জানা বয়স্ক লোক, "শিউচ্ছায়"— বুঝলে না? সাদা ধবধবে মুখে দাড়ির চিহ্নও নেই। পড়াশোনা করতে করতে কাঁধ দুটো যেন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। খুব মার্জিত রুচি সম্পন্ন। ডুলি থেকে নেমে বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারবে আমি ঘটকালী করতে এসে এক বর্ণও মিথ্যা বলিনি।"

এসব কথা শোনবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না। সে নীরবে চোখের জল মুছে মৃদু গলায় বলল, "আমার বসন্ত মণিকে এভাবে কেমন করে ছেড়ে যাই, বলুন?"

বৃদ্ধা ঘটকী তার কাঁধে হাত রেখে বলল, "আরে দূর! এ জন্য তুমি চিন্তা করো না। তিন চার বছর বয়সের ছেলের সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক কতটুকু? ও ছেলে এখন তোমাকে ছেড়ে দিব্যি থাকতে পারবে। সেখানে নিজে একটু করিৎ কর্মা হও। আর একটি কি দু'টি সন্তান পেটে ধরতে পার তো চমৎকার।"

ডুলি বাহকেরা ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। তারা খুব অসন্তুষ্ট। বিড় বিড় করে বলছে, "একি বিয়ের কচি কনে নাকি? ন্যাকাপনা কান্নাকাটি!"

বৃদ্ধা ঘটকী তখন বসন্ত মণিকে তার কোল থেকে কেড়ে নিয়ে বলল, "আমি একে আমার সঙ্গে নিয়ে যাই।

বসন্ত মণি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো। বুড়ির কোলের মধ্যে হাত-পা ছুঁড়ে

লড়াই শুরু করে দিল। শেষ পর্যন্ত পাশের দরজা দিয়ে ছেলেটাকে বাইরে নিয়ে গেল বুড়ী। তার মা চোখের জল মুছে ডুলিতে উঠতে উঠতে বলল, "ওকে তোমরা ঘরে নিয়ে এসো। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। ঠাণ্ডা লাগবে।"

তার স্বামী দুই হাতে নিজের মাথা আলতো ভাবে চেপে যেখানে বসেছিল মুখ ফুটে একটি কথাও বলল না।

গন্তব্য স্থানের দূরত্ব দশ মাইল হলেও ডুলি বাহকরা খুব ছুটে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে সেখানে পৌঁছে গেল। বসন্তের গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ও হাওয়া ডুলির ভিতরে ঢুক মহিলার গায়ের পোশাক আধভেজা করে দিয়েছিল। দরজার সামনে তাকে অভ্যথনা জানালো এক মহিলা। তার মনে হল মহিলা বেশ বয়স্কা। বয়স হলেও মুখশ্রী গোলগাল নাদুস-নুদুস। কুঁদে কাটা টানা টানা চোখ। তার বুঝতে দেরী হল না, ইনিই এ বাড়ির গিন্নী। নবাগতার দুই চোখে বিষণ্ণ বিহ্বলতা। বাড়ির গিন্নী তাকে সাদরে পথ দেখিয়ে ঘরের দিকে নিয়ে গেল। ঘরে ঢোকবার মুখে তার দেখা হল একজন সুদর্শন পাতলা অথচ ভদ্র চেহারার লোকের সঙ্গে। সযত্ন সমীক্ষার ভঙ্গিতে তাকিয়ে উদার হাসি হেসে ভদ্রলোক বল্লেন, "বেশ তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছ। তোমার পোশাক বোধ হয় ভিজে গেছে, তাই না?"

গিন্নী অবশ্য কর্তার উপস্থিতির কোন গুরুত্ব দিল না। চলতে চলতেই প্রশ্ন করল, "তোমার কিছু খাওয়া হয়েছে?"

"না।"

এই সময় প্রতিবেশী মহিলারা বাইরে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারছিল। নবাগতার মনে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা, "একি তার ভাগ্যের পরিহাস।" ফেলে আসা গৃহকোণ, বসন্ত মণি, এরা তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অথচ সে এখন ক্রীতদাসী ছাড়া আর কিছু নয়। স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক এ জীবন তাকে মেনে নিতেই হবে। এই তিন বছরের বন্দিনী জীবন তার কাছে এখন বাস্তব সত্য। এ বাড়ি এবং বাড়ির গৃহস্বামী তার ফেলে আসা বাড়ি ও স্বামীর চেয়ে ভাল তাতে সন্দেহ নেই। যে লোক "শিউচ্ছায়" পরীক্ষা পাশ করেছে সে নিঃসন্দেহে সহৃদয় ও সুরুচি সম্পন্ন। লোকটির শান্ত ধীর কথাবার্তাই তার প্রমাণ। তার স্ত্রীকেও আশাতীত ভাবে স্নিগ্ধ স্বভাবের মনে হয়। ক্রীতদাসী জেনেও তাকে যেভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছে এবং তার সঙ্গে যেমন অনাবিল ভাবে কথাবার্তা বলেছে তাকে সহৃদয় মহিলা বলেই বিশ্বাস হয়। ইতিমধ্যেই মহিলা তার বিয়ের সুমধুর রোমাঞ্চকর কাহিনী থেকে শুরু করে স্বামী স্ত্রীর জীবনের কত খুঁটিনাটি ঘটনা অনায়াসে বলে ফেলেছে। সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরের সে সব কাহিনী। পনের কি ষোল বছর আগে তার কোলে

একটি ফুট্‌ফুটে ছেলে এসেছিল। সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা দেখে মায়ের মন ভরে গিয়েছিল। মাত্র দশ মাস বয়সেই সেই শিশু বসন্ত রোগে মারা যায়। তারপর আর কোন সন্তান হয়নি। তার নাকি ইচ্ছা ছিল, টাকা যখন খরচ করতেই হবে তখন স্বামী একটি সুন্দরী তরুণী রক্ষিতা ঘরে আনুক। স্ত্রীর ভালবাসায় পাছে ভাগ বসায় সেই আশঙ্কাতেই তার স্বামী এতদিন কাউকে ঘরে আনেনি। এই বয়স্কা গিন্নীর এতসব কাহিনী শুনে সরলা তরুণী ব্যথিত হল। তার তিন বছরের দাসী জীবন হয়ত ক্লেশদায়ক নাও হতে পারে, এরকম একটা আশাও তার মনে এলো। টাকার বিনিময়ে তাকে কেন এ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে গিন্নী তাও উল্লেখ করল। শুনে তরুণী নারীর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল। গিন্নী তাকে আরও ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে চাইল, "তোমার তো সন্তানাদি হয়েছে, সবই জান। এ ব্যাপারে তোমার অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে অনেক বেশী। বোঝাবার দরকার হবে না। নিজেই একটু চেষ্টা চরিত্র করবে।"

এরপর তাকে শোবার ঘরে রেখে গিন্নী অন্য ঘরে চলে গিয়েছিল। বাড়ির কর্তাও তাদের পারিবারিক ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেছিল। তাঁর কথায় কখনও ভালবাসার গর্ব প্রকাশ পেয়েছে, কখনও বা বন্ধকী নারীকে উৎসাহ দেখার ভঙ্গিতে অথবা অংশতঃ কথাগুলো আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টায়ও সে ত্রুটি করেনি। নবাগতা বসেছিল রক্তিম মেহগনি কাঠের দেরাজওলা একটা বড় আলমারির পাশে। এমন সুন্দর আলমারি তার নিজের বাড়িতে কোন দিন দেখেনি। অবাক হয়ে দেখছিল আলমারিটা। কর্তা এসে কাছে বসে প্রথম প্রশ্ন করেছিল, "তোমার নাম কি ?"

নবাগতার মুখ দিয়ে কথা বেরল না। কেনা দাসী হয়েও সে এই বিদ্বান লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে মন রাখার হাসিটুকুও হাসতে পারল না। নিজের মুখ লুকোবার জন্যই হয়ত সে ওখান থেকে সরে গিয়ে বিছানার পাশে দাঁড়াল। কর্তা তাকে অনুসরণ করে বলল, "তুমি খুব লাজুক, তাই না ? স্বামীর কথা মনে পড়েছে বুঝি ?"

দুই হাত দিয়ে আলতো ভাবে তরুণীকে আঁকড়ে একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সোহাগ ভরা সুরে বলল, "এখন আমিই তোমার স্বামী।"

তার আচরণের মধ্যে কোন অভদ্রতা বা অশ্লীল অভিব্যক্তি ছিল না। তরুণীকে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে নিজের শরীরের সঙ্গে আকর্ষণ করে সান্ত্বনা দেবার সুরে বলল, "অত মন খারাপ করো না। তুমি যে তোমার ছেলের জন্য ভাবছো তা বুঝি, কিন্তু..."

এ বাড়ির কর্তা-গিন্নী টাকা খরচ করে তাকে কেন নিয়ে এসেছে সে কথা

মনে করে নবাগতা নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল। জোরালো যুক্তি খুঁজে পেল না বলেই কর্তা তার কথা শেষ করতে পারল না বরং মুখে হাসির রেশ টেনে নিজের গা থেকে লম্বা গাউনটা টান মেরে ফেলে দিলো। তারপর তরুণীর জামার বোতাম খুলতে খুলতে হাসল। নতুন স্বামীর ঘরে স্ত্রীর ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই তার। তাই সে মন থেকে সমস্ত চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সলজ্জ দৃষ্টিতে এই নতুন পুরুষের চোখের দিকে তাকাল। কি এক অনিবার্য আকর্ষণে তরুণীর দুই ঠোঁটে স্নিগ্ধ হাসির তরঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠলো। প্রভু হলেও এ পুরুষের চোখে মুখে প্রভুত্ব নেই। আছে অনাবিল মমত্বের ছাপ।

সহসা ঘরের বাইরে বাড়ির গিন্নীর তীব্র কণ্ঠের ভৎসনার আওয়াজ শোনা গেল। কাকে যে জাহান্নামে পাঠাচ্ছে বোঝা গেল না।

নবাগতা উৎকণ্ঠিত হল। তার স্বামীর সঙ্গে এক ঘরে থাকার জন্য এ গালাগালি কি তাকেই উদ্দেশ্য করে। হঠাৎ এমন উগ্রমূর্তি ধারণ করার কারণ কি?

"শিউচ্ছায়" বিছানায় শুয়ে বলল, "ও সব সময় এমনি চেঁচামেচি করে। বাড়ির চাকরটাকে ওর খুব পছন্দ। কিন্তু চাকরটার আবার নজর রাঁধুনী ওয়াঙ্ মেয়েটার ওপর। তাই রাঁধুনীর ওপর ও খুব খাপ্পা। উঠতে বসতে অমনি চীৎকার গালাগালি। তুমি আবার এ নিয়ে মন খারাপ কর না। শোবে এসো।"

সময়ের যাদুকাঠি মানুষের সব বেদনাই ভুলিয়ে দিতে পারে। বসন্ত মণির মা-ও তাই তার ফেলে আসা সংসারের কথা ধীরে ধীরে ভুলে যেতে লাগল। বর্তমান পরিস্থিতি ও পরিবেশ ক্রমেই তাকে আপন করে তুলল। কখনও সখনো সে যখন কোন চিন্তায় আনমনা হয় তখনই তার কানে যেন ভেসে আসে বসন্ত মণির কান্না। গভীর রাতে স্বপ্নের মধ্যে অনেকবার বসন্ত-মণিকে আদর করতে করতে তার ঘুম ভেঙেছে। নতুন সংসারের দায় দায়িত্ব তার ঘাড়ে যত চেপেছে ততই সে সব ভুলেছে, এমনকি এখন আর তেমন স্বপ্নও দেখে না।

নতুন স্বামীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে গিয়ে ক্রীতদাসী নারী টের পেল, এ বাড়ির গিন্নীর ভয়ানক সন্দেহ বাতিক! আপাত দৃষ্টিতে তাকে উদার মনে হলেও আসলে সে খুব হিংসুক। ক্রীতদাসীকে তার স্বামী অতিরিক্ত সোহাগ করে কিনা, যে উদ্দেশ্যে তাকে এ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যে সিদ্ধির জন্য তাকে যেটুকু দেওয়া দরকার স্বামী তার বেশী তাকে দিয়ে ফেলে কিনা; এ সব সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। সব সময় গোয়েন্দাগিরি

করে। বাইরে থেকে এলে স্বামী যদি ক্রীতদাসী বৌয়ের সঙ্গে আগে কথা বলে, তখনই তার সন্দেহ হয় স্বামী বোধ হয় ওর জন্য বিশেষ একটা কিছু নিয়ে এসেছে। দূর থেকে গোয়েন্দাগিরি করেই সে ক্ষান্ত হয়না। রাতে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে আদেশ, উপদেশ আর নানাবিধ ক্রুদ্ধ গঞ্জনায় স্বামীর প্রাণ ওষ্ঠাগত করে, "এই খেঁকশিয়ালীটা এখনই এত যাদু করে ফেলেছে? নিজের বুড়া হাড়ের ক্ষ্যামতা তোমার জানা নেই?"

এমনি অশ্লীল ব্যঙ্গোক্তি শুনে শুনে গৃহকর্তার কান ঝালা পালা হয়ে গেছে। বৃহৎ স্বার্থের কথা চিন্তা করে এখন আর সে বিচলিত হয়না। ক্রীতদাসী নারী যতটা সম্ভব সামলে চলার চেষ্টা করে। সে যখন ঘরে একা থাকে সেই সময় স্বামী ঘরে এলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বাড়ির গিন্নীর কাছাকাছি থাকলেও সে গৃহকর্তার সঙ্গে দূরত্ব বাঁচিয়ে চলে। এ ব্যাপারে স্বাভাবিক ও নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টায় সে একটুও ত্রুটি করে না। কারণ বুড়ীর রোষ ক্রমে তার উপরই বাড়বে। চেঁচিয়ে মেচিয়ে পাড়া মাৎ করে বলবে, ক্রীতদাসী হয়ে তার স্বামীকে হাত করতে চাইছে আর অন্যের চোখে গৃহকর্তাকে হেয় করার ফন্দি আঁটছে। কিন্তু এত সামলে চলেও বুড়ীকে সে শান্ত করতে পারল না। সে ক্রীতদাসী বই আর কিছু নয় সেটা নিখুঁত ভাবে প্রমাণ করার জন্যই এ বাড়ির সব কাজ কর্মের বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলো। বন্দিনী নারী তাকে খুশী করার জন্য বুড়ীর কাপড় চোপড় পর্যন্ত ধুয়ে শুকিয়ে পরিপাটি করে রাখত। এজন্য বুড়ী হয়ত কখনো সখনো বলত, তুমি আবার আমার কাপড় ধুচ্ছো কেন? বরং তোমার নিজের কাপড় চোপড়ও ধোয়ার জন্য ঐ রাঁধুনী ওয়াঙ্ মেয়েকে দিতে পার। এসব কাজতো ওরই করার কথা।"

বুড়ীর মেজাজ যখন খুশী থাকত তখন সে আদরের সুরেই বলত, "নীচে গিয়ে শুয়োরের খোঁয়াড়টা একবার দেখে এসো না বোন। খোঁয়াড়ের চারিদিকটা ভালভাবে পরীক্ষা করবে। দু'টো শুয়োর এমন অকারণ গোঁ গোঁ করছে কেন বুঝতে পারছিনা। বোধ হয় ওদের পেট ভরে খেতে দেওয়া হচ্ছে না। ওয়াঙ্ মেয়েটা খাবার দিতে বড় গাফিলতি করে।"

শীতকাল এসে পড়ছে। আট মাস হল ক্রীতদাসী এ বাড়িতে এসেছে। এর মধ্যে একদিন সে নিজেই আবিষ্কার করল, ভাত খাওয়ায় তার রুচি নেই। তাজা নরম সেমাই আর মিষ্টি আলু খানিকটা খেতে পারে। কয়েকদিন পর তাও আর মুখে রুচলনা। যা খায় তাই যেন বমির সঙ্গে বেরিয়ে আসতে চায়। কিছুই পেটে রাখা যাচ্ছেনা। স্কোয়াশ আর কুল খেতে তার ভারি ইচ্ছা করে। কিন্তু এসব এখন পাওয়া যায় না। খবর শুনে 'শিউচ্ছায়' খুব খুশী। সে নিজেই বাজারে গিয়ে পোয়াতির রুচিকর

খাবার যা যা পাওয়া গেল তাই কিনে নিয়ে এলো। ফলের দোকান থেকে কিছু কমলালেবুও কিনলো। কামরাঙা আর বিশেষ ধরনের আরও কিছু কমলালেবুর জন্যে ফলের দোকানে আগাম বায়না দিয়ে এলো। 'শিউচ্ছায়'-কে খুবই উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। সে কেবল বারান্দায় পায়চারী করে আর কি সব বিড় বিড় করে আওড়ায়। অন্যেরা কিছু বুঝতে পারেনা।

নববর্ষের উৎসবের সময় দেখা গেল শরীরের এই হাল নিয়েও পোয়াতি মেয়ে রাঁধুনী ওয়াঙের সঙ্গে পিঠার চাল পেষাই করছে। প্রায় এক কিলো-গ্রামের মত চাল পেষাই করার পর মহিলা ক্লান্তিতে হাই তুলছিল। তখন 'শিউচ্ছায়' তার কাছে গিয়ে বলল, "তুমি বিশ্রাম কর। চাল পেষাইয়ের কাজ তো আমাদের চাকরটাও করতে পারে। পিঠে খাওয়ার সময় সবাইকেই পাওয়া যায়।"

'শিউচ্ছায়' মাঝে মাঝে রাতের দিকে কেরোসিনের লম্ফ জ্বালিয়ে মোটা মোটা কি সব বই মনোযোগ দিয়ে পড়ে। তা দেখে চাকরটা বলে, "তুমি এত বই পড় কেন গো বাবু? বুড়ো বয়সে আবার পরীক্ষায় বসবে নাকি?"

চাকরের কথায়, "শিউচ্ছায়" মুখ তুলে তাকায়। তার নরম গালে আঙুলের টোকা দিয়ে বলে, "জীবনের আনন্দ সম্বন্ধে তোর কি কোন বোধ আছে রে? তবে শোন হতভাগা! "আলো ঝলমল্ বিয়ের রাতের ফুল" আর পাশের তালিকায় "পরীক্ষার্থীর নাম যেন তাল তাল সোনা"—এই বাক্যাংশ দুটোর মানে বুঝিস? এই দুটোই হল জীবনের পরম আনন্দের মুহূর্ত। অতীতে এই দুই আনন্দই আমি ভোগ করেছি। কিন্তু বর্তমানে আমি যে আনন্দের মুখোমুখি হয়েছি সে আনন্দ ঢের বেশী তৃপ্তিদায়ক।"

'শিউচ্ছায়-এর' মন্তব্য শুনে তার দুই স্ত্রী ছাড়া অন্য সকলে হো হো করে হেসে উঠলো। এ উদ্ধৃতি বাড়ির বুড়ী গিন্নীর কাছে খুবই অপমানজনক মনে হলো। তার বন্ধকী সতীনের পেটে বাচ্চা এসেছে জেনে তার মনে তো কম আনন্দ হয়নি। কিন্তু স্বামীর এই রসাল উদ্ধৃতির আদিখ্যেতায় তার তার বড় অভিমান হল। তার পেট যে স্বামীর ঋণ শোধ করতে পারেনি সে দোষ তো তার নয়।

চলতি বছরের তৃতীয় মাসে সামান্য অসুস্থতা ও মাথাব্যথার জন্য পোয়াতি তিন দিন বিছানায় শুয়ে কাটিয়েছে। 'শিউচ্ছায়' নিজেই এ ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। পোয়াতির এমনিতেও বিশ্রাম দরকার। মানসিক অশান্তি যাতে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই 'শিউচ্ছায়' পোয়াতির বিছানায় গিয়ে বার বার খোঁজ খবর নিচ্ছিল, তার কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা। বিশেষ কিছু প্রয়োজন কিনা, সে কথাও জিজ্ঞাসা করেছিল। বুড়ো কর্তা আর তরুণী

গিন্নীর ব্যাপার স্যাপার লক্ষ্য করে বুড়ী গিন্নী এক সময় খুব উত্তেজিত হয়ে মন্তব্য করেছিল, "ঢঙ্ দেখে জ্বলে যাই।"

বুড়ী সর্বক্ষণ বিড় বিড় করে নানা রকম বিদ্রূপ আর বিদ্বেষের বিষ ঢেলেই চলেছে। এক দিন তো পোয়াতির কাছে গিয়ে বলেই ফেললো, "নিজের দাম বড় বেশী চাড়িয়ে দিয়েছো। কখনো পেটের পাশে ব্যথা, কখনও মাথায় যন্ত্রণা কত না ভণিতা! সোহাগ আর ঢলাঢলি দেখলে উপরতলার বেশ্যারাও হার মানে। এ আমি হলফ করে বলতে পারি; আট মাসের পেট নিয়ে নিজের বাড়িতেও এতটা নাই পেতেনা, সেখানে রাস্তার কুত্তার মত বশ্যতা স্বীকার করতে হত আর এক গাদা কুত্তার ছা পেটে নিয়ে এক টুকরো খাবারের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হত। ঐ বুড়ো রাস্কেলটার জন্যই এত বাড়াবাড়ি।"

বুড়ী আজকাল প্রায়ই স্বামীকে রাস্কেল বলে মনের ঝাল মেটায়। কিছুতেই তার মেজাজ ঠাণ্ডা হতে চায় না, রাঁধুনী মেয়ে ওয়াঙকে ডেকে শুনিয়ে দেয়, "এত আদিখ্যেতা কিসের? একটা ছেলে তো? আরে আমাদেরও ছেলে হয়েছিল। আমিও দশ মাস গর্ভে সন্তান ধারণ করেছিলাম। এত দেমাকের কথা আমি তো ভাবতে পারিনি। ওর ছেলে তো এখনো কোন্ রসাতলের নাম ডাকার খাতায় রয়েছে তার হিসাব নেই। কে বলতে পারে, ও যেটাকে প্রসব করবে সেটাকে কোন কুৎসিত ব্যাঙের মত দেখাবে কিনা? সেই পশুটি বুকে হেঁটে বেরিয়ে আসুকনা, তখন না হয় দর্প দেখা যাবে। ছেলে এখনও একদলা মাংস বইতো কিছুনা, এর মধ্যেই কত, আহা মরি!"

ঘৃণ্য গালাগালি শোনার পর পোয়াতি রাতে আর কিছু খেতে পারল না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে চোখের জলে ভাসলো। "শিউচ্ছায়" রাতের পোষাকে তার পাশেই ছিল। বুড়ীর ব্যঙ্গোক্তির বন্যা আর থামছে না। শিউচ্ছায় এই অকথ্য মন্তব্য শুনে রাগে ঘামছিল। ভিতরের উত্তেজনায় শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। বিছানা থেকে নেমে পোষাক পরে বুড়ীর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনি মেরে ফেলে দিল। তাতেও তার রাগ পড়লোনা, নিজেকে খুব নিস্তেজ মনে হল। হাতের আঙুল কাঁপছে, পুরো হাত অবশ হয়ে আসছে। তখন সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "এই স্ত্রীকে আমি কতই না ভাল বেসেছিলাম। ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনে কখনো গায়ে হাত তুলিনি। কোন দিন একটু নখের আঁচড়ও কাটিনি ওর গায়ে। আমার সেই স্ত্রী আজ কত বিরক্তিকর, রুচিহীন এক প্রগলভা নারী।"

বুড়ী তেমনি গালাগালি করতে করতে পাশের ঘরে চলে গেল। "শিউচ্ছায়" তখন তরুণী পোয়াতির একান্ত কাছে গিয়ে বলল, "তুমি কেঁদনা। কেঁদনা।

কত আর ঘেউ ঘেউ করবে। করুক না! ওতো একটা বাঁজা মুরগীর মত। অন্য মুরগীরা ডিমে তা দিলে তা ওর সয়না। তুমি যদি সত্যই একটি ছেলে প্রসব করতে পার আমি তোমাকে দুখানা রত্ন-খচিত গয়না উপহার দেব। একখানা সবুজ পান্না বসানো আংটি আর একখানা সাদা বৈদুর্যমণি।"

বাইরে থেকে বুড়ীর বিদ্রূপাত্মক চিৎকার আবার শোনা যাচ্ছিল। "শিউচ্ছায়" খুবই বিরক্ত বাধ করল। কিন্তু নিরুপায়। সে তখন গায়ের পোশাক খুলে রেখে কম্বল মুড়ি দিল। তরুণীর খোলা বুকের উপর নিজের মুখ আলতো ভাবে রেখে সোহাগের সুরে ফিস ফিস করে বলল, "একখানা সাদা বৈদুর্যমণি বুঝলে…"

যত দিন যায় পোয়াতির তলপেট ক্রমে স্ফীত হতে থাকে। অগত্যা বুড়ী গিন্নী একজন দাইয়ের বন্দোবস্ত করল। এমন সুখবরটা পাড়ায় পাড়ায় প্রচার করতেও ভুল করলো না সে। প্রসূতীর উপযোগী রঙীন পোষাক আর শিশুর জন্য কাঁথা সেলাইয়েরও ব্যবস্থা হলো।

নিষ্ঠুর গ্রীষ্মকাল শেষ। পরিবারের সবাই আশায় আশায় নয় মাস কাটিয়ে দিল। শরতের শুরুতে মৃদুমন্দ হাওয়া আর উজ্জ্বল মিষ্টি আলোয় সারাটি গ্রাম উদ্ভাসিত। আকাঙ্খিত শুভ মুহূর্তটি সমাগত। সমস্ত পরিবেশে কেমন যেন আনন্দের শিহরণ বইছে। শিউচ্ছায়ের নিজের অবস্থাটা চাপা উত্তেজনায় দোদুল্যমান। তাকে উঠোনের মধ্যে ঘন ঘন পায়চারী করতে দেখা যাচ্ছে। হাতে একখানা জ্যোতিষশাস্ত্র মতের পাঁজি। মাঝে মাঝে পাঁজির পাতা উল্টিয়ে বলছে, "ব্যাঘ্র গ্রহ প্রভাব উত্তুঙ্গে।"

কখনও বা তার উদ্বিগ্ন চোখের দৃষ্টি সামনের ঘরের বন্ধ জানলার দিকে নিবদ্ধ হতেও দেখা যায়। ঐ ঘর থেকেই দাই এর নীচু গলার ফিসফাস কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। তার চোখ কখনও বা শরৎ আকাশের খণ্ড মেঘে ঢাকা সূর্যের দিকে নিবদ্ধ হয়ে যায়। এক সময় জানলার দিকে উঁকি মেরে সে রাঁধুনী ওয়াঙ মেয়েকে প্রশ্ন করে, "এখন কেমন?"

ওয়াঙ মেয়ে প্রথমে নীরবে মাথা নাড়ল। তারপর উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলো, "একটু ধৈর্য ধরুন এক্ষুনি জানতে পারবেন।"

তারপর পাঁজি হাতে করে শিউচ্ছায় ফের উঠোনের এমাথা ওমাথা করতে লাগল।

এই টানাপোড়েন চলছিল গোধূলির আবছায়া নেমে আসা পর্যন্ত। সারা গ্রামে কেরোসিনের লম্ফ জ্বলে উঠলো যেন বসন্তের ফোটা ফুলের মালা। এই শুভ মুহূর্তে সদ্যোজাত একটি শিশুর আকুল কান্না বাইরে থেকে শোনা গেল। আনন্দের আতিশয্যে 'শিউচ্ছায়' বুঝি বা নিজেই কেঁদে ফেলে।

শিউচ্ছায় পরিবারে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। রাত্রে কেউ কিছু খাবেনা তবু সকলেই খাবার টেবিলে জড় হয়েছে। বুড়ী গিন্নী ঝি চাকরদের উদ্দেশ্যে বলল, "খবরটা কিছু সময় গোপন রাখতে হবে। খুশীতে বেশী মাতামাতি করলে কুদৃষ্টির প্রভাব থেকে ছেলেটাকে বাঁচানো যাবেনা। এই মুহূর্তে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, 'ও বাড়ীতে কি হয়েছে?' বলবি মেয়ে হয়েছে।"

বুড়ীর কথায় সবাই মাথা নেড়ে সায় দিল। সবাই সব কিছু জেনে শুনেও না বোঝার হাসি হাসল।

এক মাস পরে নবজাতকের কোমল শুভ্র মুখে শরতের রোদ লাগল। সবাই দেখলো তরুণী মা রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে শিশুর গায়ে তেল মাখাচ্ছে। কৌতূহলী প্রতিবেশীরা তাকে ঘিরে দাঁড়াল। কেউ শিশুর নাকের প্রশংসা করল, কেউ মুখের, কেউবা ছোট দুটি কানের। কেউবা মন্তব্য করল, ছেলের মাকে দেখতে বেশ সুন্দর লাগছে। আগের চেয়ে অনেক ভাল। চেহারায় লাবণ্য এসেছে। শরীরও গোলগাল হয়েছে। বুড়ী গিন্নী ঠাকুমার মত নানারকম বিধি নিষেধের উল্লেখ করে তরুণী মাকে বলছিল, "অনেক হয়েছে। বেশী ঘষে মেজে ছেলেটাকে কাঁদিয়ে দিওনা বাছা।"

শিশুর নামকরণের সময় উপস্থিত হয়েছে। শিশুর শিউচ্ছায় পিতা অনেক চিন্তা করেও নামের জুৎসই চীনা ক্যারেক্টার খুঁজে পেলনা। বুড়ী গিন্নী ভেবেছিল, চীনা বচনের পুঁথি থেকে নাম বেছে নেওয়া হবে। দীর্ঘ জীবন, ধন সম্পদ ও সম্মান, সুখ-শান্তি, আনন্দ বা উল্লাস, এ সবের মধ্যে একটা উপযুক্ত নাম নিশ্চয় আছে। সবচেয়ে ভাল নাম তার যা মনে এসেছিল তা হল, দীর্ঘায়ু শব্দের চীনা ক্যারেক্টর যেমন অভিজ্ঞ বয়স ইত্যাদি। শিউচ্ছায় অবশ্য এর একটিও পছন্দ করেনি। কারণ তার মতে এগুলো অতি সাধারণ গতানুগতিক এবং নীরস। শিউচ্ছায় সেই থেকে মাসাবধি নামের বিবর্তন ও নামের ইতিহাসের বই ঘাঁটলো কিন্তু তেমন শ্রুতিমধুর, সর্বদিক থেকে সুন্দর একটি নাম খুঁজে পেল না। তার ইচ্ছা এমন একটি নাম দিতে হবে যার অর্থ এক দিকে ছেলের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণ এবং অন্য দিকে এ তার অধিক বয়সের সন্তান—এই দুই ভাব প্রকাশ পাবে। এ ধরনের অর্থবহ একটি নাম খুঁজে পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। শিশুর বয়স যখন তিন মাস তখন সে তাকে নিজের হাঁটুর উপর বসিয়ে রেখে টিমটিমে লম্ফের আলোতে মোটা কাঁচের চশমা চোখে বইয়ের পাতা উল্টিয়ে একটি নাম খুঁজছিল। শিশুর মা তখন ঘরের এক কোণে বসে সুদূরের ফেলে আসা দিনগুলির কথা ভাবছিল। অজান্তেই এক সময় বলে উঠল, "আচ্ছা, ছেলের নাম 'শরৎ সোনা' রাখলে কেমন হয়?"

ঘরের মধ্যে যারা ছিল তারা সবাই অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে আরও কি বলে তা শোনবার জন্য।

"শরৎকালে ওর জন্ম। শরতের অমূল্য উপহার। 'শরৎ-সোনা' নামটা বেশ মানায়।"

"চমৎকার।"

শিউচ্ছায় আবেগে আত্মহারা হয়ে তরুণী বউকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "চমৎকার। দেখতো কত সময় আর কত উদ্যম বাজে নষ্ট করেছি। সত্যই তো এখন আমার জীবনের শরৎকাল। বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে। ছেলে জন্মালো শরৎকালে। এই শরৎ কালই ফসল পাকার সময়। সুতরাং শরৎ-সোনা নিখুঁত নাম। শরৎকালেই ক্ষেতের ফসল ঘরে আসে। অমিও আমার বহু আকাঙ্খিত ফল ঘরে নিলাম এই শরৎকালে।"

এমন একটা সুন্দর নামকরণের জন্য শিউচ্ছায় তার বন্ধকী বৌয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সবার সামনেই সে মন্তব্য করল, "লেখাপড়া শিখলেই সব কিছু হয় না। প্রতিভা হল ঈশ্বরের দান।"

যার সম্বন্ধে এত বড় প্রশংসা সে কিন্তু একটুও স্বস্তি পাচ্ছিল না। মনের অব্যক্ত বেদনায় তার অধঃনমিত চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। বেদনাহত মনের মধ্যেই শুধু অনুরণিত হ'ল, "এতো আমার প্রতিভা নয়, ফেলে আসা বসন্ত মণির কথা ভাবতে গিয়েই এ নাম আমার মনে এসেছে।"

শরৎ-সোনার চেহারা দিনে দিনে মিষ্টি হয়ে উঠছে। মা ছেলের সম্পর্ক ক্রমেই মধুরতর হচ্ছে।

কাউকে দেখলে শিশুর ছোট্ট ছোট্ট দুটি টানা টানা চোখ অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে। পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দূর থেকে দেখলেও মাকে চিনতে তার ভুল হয় না। মায়ের যেমন ছেলেই একমাত্র আকর্ষণ ছেলেও তেমন সারাদিন মাকে আঁকড়ে থাকে। শিউচ্ছায় গভীর স্নেহে শিশুকে আকর্ষণ করতে যায় কিন্তু শিশু তার বাপকে আমল দেয়না। শিউচ্ছায়ের বুড়ী গিন্নী প্রয়োজনাতিরিক্ত সোহাগ ঢেলে একথাই প্রমাণ করতে চায় যে এ শিশু একমাত্র তারই। তবুও ঐ শিশুর ডাগর চোখের কাছে সে অচেনা আগন্তুকই থেকে যায়। তা হোক শিশুর ঐ কৌতুহল ভরা সরল স্থির দৃষ্টি বুড়ীর মনকে কেড়ে নিয়েছে।

শীতের লেজুড় ধরে বসন্ত হাজির হল। গ্রীষ্মের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যাবে এর পরেই। মা ছেলের সম্পর্ক যতই গভীর হচ্ছে অভাগী মায়ের

ছেলেকে ছেড়ে যাবার দিন ততই এগিয়ে আসছে। বাড়ির সকলেই ভাবতে শুরু করল, এইতো আর কিছুদিনের মধ্যে বন্ধকী নারীর চুক্তির তিন বছর পূর্ণ হবে। কচি শিশুটার কথা চিন্তা করে শিউচ্ছায় কথাটা তার বুড়ী গিন্নীর কানে তুললো। তার ইচ্ছা আর একশো "য়ুয়্যান" দিয়ে বৌটাকে চিরদিনের জন্য কিনে রাখে। এ কথা শুনে বুড়ী গিন্নী ঝাঁঝালো গলায় বলল, "ওকে কিনে রাখবার আগে আমাকে বিষ দিও।"

শিউচ্ছায় অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলনা। রাগ চেপে রেখে নিজের মনেই জ্বলতে লাগল। তারপরে জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "তুমি কি বুঝতে পারছো না, মা হারা একটা কচি শিশু—"

স্বামীকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বুড়ী গিন্নী তীব্র ব্যঙ্গোক্তি ছুঁড়ে দিল, "ওক্, তাহলে তুমি আমাকে ছেলের মায়ের আসনে চাইছোনা! কচি ছেলেও কি কচি মায়ের জন্য বায়না ধরেছে নাকি?"

এদিকে অভাগিনী মায়ের মনেও দুই বিরুদ্ধ চিন্তার সংঘাত চলছিল। বসন্তমণিকে ছেড়ে আসার পর থেকে সে কেবলই ভাবছিল তিনটা বছর কোনমতে কেটে গেলেই সে ছেলের কাছে ফিরে যেতে পারবে। এই কথা মনে ছিল বলেই শিউচ্ছায়ের বাড়ির ক্রীতদাসী জীবন সে সহজভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিল। বসন্তমণি তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু শরৎসোনা তার কাছে একেবারেই বাস্তব। শরৎসোনাকে ছাড়তে না পারলে তাকে বসন্তমণিকে ছাড়তে হয়। এসব কথা বহুদিন ধরে ভেবে ভেবে তার মনে আকুতি জেগেছিল, এই নতুন সংসারে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবার জন্য। বসন্তমণির বাপের যা অবস্থা তাতে হয়ত বেশীদিন সে বাঁচবে না। ঐ শক্ত ব্যামোই হয়ত তার কাল হবে। তাই একটা পরিকল্পনাও তার মনে এসেছিল। দ্বিতীয় স্বামীকে অনুরোধ করবে, সে যদি বসন্তমণিকে দত্তকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করে। তাহলে তার দুই ছেলেই মায়ের কাছে থাকতে পারবে। গ্রীষ্মের দুপুর বেলা, ভিতর মহলের বারান্দায় বসে শরৎসোনাকে বুকের দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে কতবার মনে হয়েছে, বসন্তমণি এসে তার পিছনে দাঁড়িয়েছে। তাকেও কাছে এনে দুই ছেলের সঙ্গে কথা বলে সময় কাটাতে পারলে মায়ের মনে কত সুখ। কিন্তু হায়! কোথায় বসন্তমণি!

কখনও কখনও বাড়ীর বুড়ী গিন্নী মুখে দয়া আর চোখে নিষ্ঠুরতা নিয়ে তার এই আনমনাভাব গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করত। তাতেই সে সভয়ে উপলব্ধি করেছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিৎ। বুড়ী তাকে ঝানু গোয়েন্দার মত অনুসরণ করছে। তার কোলের শিশুটা যখন হাসে কাঁদে তখনই এ জ্বালা থেকে খানিকটা সোয়াস্তি পায়।

শিউচ্ছায় তার পরিকল্পনা কিছুটা পরিবর্তন করেছে। ঠিক হয়েছে সেই ঘটকী সান মেয়েকে তার বন্ধকী স্ত্রীর প্রথম স্বামীর কাছে পাঠান হবে। চেষ্টা করে দেখবে, ত্রিশ অথবা বড় জোর পঞ্চাশ য়ুয়ান দিলে তার স্ত্রীর বন্ধকের মেয়াদ আরও তিন বছরের জন্য বাড়ানো যায় কিনা। আর তিন বছর পার হলে শরৎসোনার বয়স হবে পাঁচ বছর। তখন অনায়াসে ছেলে মা ছেড়ে থাকতে পারবে। প্রস্তাবটা বুড়ী গিন্নীর কানে যেতেই সে ভগবান বুদ্ধের স্তব আওড়াতে আওড়াতে বলল, "হে প্রভু অমিতাভ, ঐ মেয়েছেলেটার নিজের বাড়িতে একটা নিজের ছেলে আছে। তুমি তাকে এই বুড়োটার কবল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে তার আসল স্বামীর সঙ্গে ঘর করার সুযোগ দাও প্রভু!"

শিউচ্ছায় এই ভৎ'সনার উত্তরে কোনরূপ উত্তেজনা প্রকাশ না করে তার গিন্নীকে বোঝাতে চেষ্টা করল, "তুমি একবার ভেবে দেখ, মাত্র দু'বছর থেকেই কচি শিশুটা মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হবে এটা কি ভাল?"

বুদ্ধের স্তোত্র বইখানা নিচে রেখে বুড়ী জোর দিয়ে বলল, "আমি তাকে মানুষ করতে পারি। একটি শিশুর সেবা যত্ন করা কি আমার পক্ষে এতই অসম্ভব? তুমি ভয় পাচ্ছ, আমি দুধের শিশুটাকে খুন করে ফেলবো, না?"

বুড়ী কোন যুক্তি গ্রাহ্য করছেনা দেখে শিউচ্ছায় হাল ছেড়ে বাইরে চলে গেল। বুড়ী কিন্তু ছাড়লনা। তাকে অনুসরণ করতে করতে বলল, "আমার ছেলে নেই বলেই আর একটা মেয়েছেলেকে ঘরে এনেছিলাম। তোমার বুড়ো বয়সের পিরীতের জন্য নয়। শরৎসোনা এখন আমার। তুমি ভেবোনা সংসারটা শুধু তোমারই। আমি বানের জলে ভেসে এসেছি। তোমার যা ইচ্ছা তাই করবে। তোমার ভিমরতি হয়েছে, মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে, বুঝলে? বয়স যত বাড়ছে ততই কচি খোকাটি হয়ে যাচ্ছো। আসলে তুমি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছো। আর ক'বছর বাঁচবে এ্যাঁ? সে খেয়াল আছে? ওই সোমত্ত মেয়েছেলেটাকে গলায় ঝুলিয়ে তেজ আর পৌরুষ কতদিন চলবে বলতে পার? আমি সতীন নিয়ে বাকী জীবনটা গুঁতোগুঁতি করতে পারবনা বলে দিচ্ছি। তুমি যতই ছলাকলা দেখাও না কেন, হ্যাঁ।"

শিউচ্ছায় স্ত্রীর এই কদর্য জ্বালাময়ী উক্তি শোনবার জন্য একটুও থামলনা। দ্রুতপায়ে বুড়ীর নজরের আড়ালে চলে গেল।

গ্রীষ্মের শুরুতে ছেলেটার মাথার একধারে একটা ফোঁড়া হয়েছিল। কখনো সখনো সামান্য জ্বরও হত। বুড়ী মন্দিরে মন্দিরে ধর্ণা দিয়ে ভগবান বুদ্ধের চরণামৃত এনে ছেলের ফোঁড়ায় মালিশ করত। জোর করে খানিকটা চরণামৃত শিশুটাকে খাইয়েও দিত। ছেলের গর্ভধারিণী মা অবশ্য এই ছোটখাট অসুখের কোন গুরুত্ব দিতনা। ঐসব ঔষধপথ্য খাওয়াবার সময়

চেঁচাতে চেঁচাতে ছেলের গায়ে ঘাম দিত বলেই তার আপত্তি। সুযোগ পেলে সে ওই চরণামৃত জাতীয় কটু স্বাদের ওষুধ ছুঁড়ে ফেলে দিত। টের পেলেই বুড়ী স্বামীর কাছে নালিশ করত, "দেখ গিয়ে তোমার সোহাগিনীর মাতৃস্নেহ। ছেলেটার অসুখ বিসুখের দিকে একটুও খেয়াল করে না। রাক্ষুসী মানতেও চায়না যে ছেলেটা আমার রোগা হয়ে যাচ্ছে। হৃদয়ের স্নেহই গভীর, বুঝলে, ওই ভাড়াটে ভালবাসা মিথ্যা। ওকে দিয়ে ছেলের কোন কল্যাণ হবে না বলে দিচ্ছি।

ক্রীতদাসী মায়ের চোখের জল আর শেষ হয় না। শিউচ্ছায়ও কখন আর বুড়ীর গঞ্জনার প্রতিবাদ করে না।

বাড়ির নব জাতকের প্রথম জন্মদিন খুব ঘটা করে পালন করা হল। বাড়ীর সকলে সারাদিন ধরে নানা কাজে ব্যস্ত। ত্রিশ থেকে চল্লিশজন অতিথি নিমন্ত্রিত হয়েছে। প্রত্যেকেই নতুন পোশাক ও অন্যান্য নানা ধরনের উপহার দিয়েছে নব জাতকের কল্যাণ কামনা করে। কেউ এনে দিল সেমাইয়ের প্যাকেট, কেউ বা রূপোর সিংহ শিশুর গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। রৌপ্যখচিত দীর্ঘজীবী দেবদূতের মূর্তি এনে কেউ কেউ শিশুর টুপিতে এঁটে দিল। অতিথিরা সকলেই শিশুর বহু বিচিত্র কর্মজীবন ও দীর্ঘায়ু কামনা করল। গৃহস্বামীর মুখ আনন্দে ও ভাবাবেগে দীপ্ত হয়ে উঠছিলো। দেখা গেলো তার দুই গালে সূর্যাস্তের রক্তরাগ গরিমা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

সেই আনন্দ মুখর দিনের শেষ বেলায় উৎসব যখন সবে শুরু হবে তখন একজন অনাহূত অতিথি উঠানের এক কোণে এসে দাঁড়াল। গোধূলির আবছা আলো যায় যায়। সকলের চোখ পড়ল সেই আগন্তুকের দিকে। রুগ্ন বীভৎস চেহারা। দুই চোখ কোটরাগত। জবুথবু গেঁয়ো লোক। পরনে ছিন্ন ভিন্ন শততালি পোশাক। মাথার চুল লম্বা। একটা কাপড়ের পুঁটলী বগলে নিয়ে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। গৃহস্বামী বিস্মিত হয় তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কোত্থেকে এসেছেন?"

জড়িয়ে আসা গলায় আগন্তুক কি উত্তর দিল গৃহস্বামী তা বুঝতে পারল না। সহসা তার মনে হল এ সেই চামড়ার ব্যবসায়ী হবে। গলার স্বর একটু নীচু করে বলল, "আপনি আবার উপহার আনলেন কেন? বাস্তবিকই আপনার উপহার আনার দরকার ছিলনা।"

অতিথি উত্তর দেবার আগে সসঙ্কোচে গৃহস্বামীর দিকে তাকাল। তারপর বলল, "আমি...আমি চাই...আমি এসেছি আপনার স্ত্রীর দীর্ঘজীবন এবং হাজার..." কি যে সে বলছে তা সে নিজেই জানেনা। তবুও অর্থহীন কি সব বলতে বলতে কাগজের মোড়কটা খুলছিল। হাতের আঙুলগুলো কাঁপছে

দেখা যাচ্ছে। অনেক কাগজের মধ্য দিয়ে এক ইঞ্চি দৈর্ঘ প্রস্থ বিশিষ্ট চারটি চীনা ক্যারেকটার বার করে পর পর একসঙ্গে সাজিয়ে রাখল। সব মিলিয়ে মানেটা দাঁড়াল এই রকম—"দীর্ঘায়ুর কাছে উত্তর পর্বতও যেন হার মানে।" শিউচ্ছায়ের বুড়ী গিন্নী দূর থেকে উঁকি মেরে আগন্তুককে একবার দেখে গেল। মনে হল সে মোটেই খুশী হয়নি। এরপর শিউচ্ছায় আগন্তুককে ভোজ টেবিলের কাছে এগিয়ে নিয়ে গেল। এই নতুন অতিথি সম্বন্ধে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে কৌতূহল পরিলক্ষিত হল। অবশ্য সে সামান্য কলগুঞ্জন বেশীক্ষণ স্থায়ী হলনা।

অতিথিরা দীর্ঘ দুই ঘণ্টা ধরে মদ্যপান আর সুস্বাদু ভোজ খেতে খেতে উন্মাদনায় হৈ হট্টগোল শুরু করে দিয়েছে। একে তো আবেগ ও উত্তেজনায় অধীর তার ওপর দলে দলে ভাগ হয়ে আঙুল উঁচিয়ে ধাঁধায় হারিয়ে এ ওকে বেশী মদ গিলতে বাধ্য করেছে। এই সব হৈ হুল্লোড় আর বিশৃঙ্খলায় কারো কথা কেউ বুঝতে পারছে না। সেই চামড়ার ব্যবসায়ীই কেবল দুই পেয়ালা মদ খেয়ে শান্ত ও নীরব ছিল। অতিথিদের মধ্যে কেউই তাকে এতটুকু আমল দেয়নি। অবশেষে ঐ রঙীন পানীয়ের প্রভাব যখন তাদের প্রায় কাবু করে এনেছে তখন তারা তাড়াহুড়া করে এক এক বাটি ভাত গলাধঃকরণ করতে শুরু করল। সকলেই শেষবারের মত শিশুর প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে যে যার লণ্ঠন হাতে নিয়ে টলতে টলতে বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

চামড়ার ব্যবসায়ী কিন্তু শেষপর্যন্ত অবশিষ্ট খাবার চেঁচে পুছে খেল। চাকরেরা যখন এঁটো পরিষ্কার করতে এলো তখন সে খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লো। তারপর ধীরে ধীরে বারান্দার এক অন্ধকার কোণে এগিয়ে গিয়ে দেখলো তার সেই একান্ত আপন অভাগিনী স্ত্রী তার সঙ্গে একটু দেখা করার জন্য চোরের মত অপেক্ষা করছে। দেখা হতেই সে ক্ষুণ্ণ বিষণ্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করল, "কেন তুমি এখানে এলে ?"

"তুমি ভেবোনা আমি শখ করে এখানে এসেছি। না এসে উপায় ছিলনা।"

"এলেই যদি তবে বেলাবেলি এলেই তো ভাল হত। এত দেরী করে এলে কেন ?"

"তুমি তো বুঝতে পার, এরকম দিনে এলে খালি হাতে আসা যায়না। সামান্য কোন উপহার কেনার পয়সাই বা আমি কোথায় পাই ? সেই ভোর থেকে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। নানা ওজর দেখিয়ে কত লোকের কাছে হাত পেতেছি। তারপর শহরে গেলাম জন্মদিনের উপহারটুকু কিনতে। সারাদিন এমনি হেঁটে ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়লাম তাইতো এত দেরী।"

"বসন্ত মণি কেমন আছে ?"

স্ত্রীর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "বসন্ত মণির জন্যই তো আমাকে এখানে আসতে হল।"

মায়ের মন নিমেষে শংকিত হয়ে উঠলো। তার মুখেও যেন স্বামীর কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

"বসন্ত মণির জন্য ? কি হয়েছে তার ?"

স্বামী রুগ্ন কণ্ঠে থেমে থেমে বলতে লাগল, "সারা গ্রীষ্মকালটাই লক্ষ্য করলাম, বসন্ত মণির শরীরটা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। শরতের শুরুতে সে একেবারেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়লো। ডাক্তারও দেখাতে পারলাম না আর এক ফোঁটা ওষুধেরও ব্যবস্থা করতে পারলাম না। বসন্ত মণি এখন একেবারেই মরণাপন্ন। এখনও যদি আমরা তার জন্য কিছু করতে না পারি তাহলে সে আর বাঁচবে না।"

এই পর্যন্ত বলে সে ঢোক গিলল। তারপর নেহাৎ অসহায়ের মত বলে ফেললো, "এই কারণেই তোমার কাছ থেকে কয়েকটা টাকা ধার নিতে এসেছি।"

মনে হল তীব্র যন্ত্রণায় সেই অভাগিনী মায়ের চেতনা এখনই লোপ পাবে। কান্নায় তার বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠলো। কিন্তু এই বাড়ির আনন্দ মুখর এই দিনে সবাই যখন শরৎ-সোনার দীর্ঘায়ু কামনা করে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে তখন তার মা কি চোখের জল ফেলতে পারে ? প্রাণপণ শক্তিতে চোখের জল চেপে রেখে বলল, "আমার কাছেও তো টাকা পয়সা কিছু নেই। আমার নিজের হাত খরচের জন্য এরা মাসে দুই মাও করে আমাকে দেয়। আমার তো কোন খরচ নেই। তাই সে পয়সা বাচ্চাটার জন্যই খরচ করা হয়। এখন তা'হলে কি হবে ? কে এখন বসন্ত মণির দেখাশোনা করছে ?"

"আমাদের প্রতিবেশীদের কাছে তাকে রেখে এসেছি। আমার ধারণা ছিল বিকালের মধ্যেই ফিরে যেতে পারব। আমি তাহলে এখনই রওনা দি।" কথাটা শেষ করে সেই অসহায় চামড়ার ব্যবসায়ী নিজের অশ্রুভেজা চোখ দুটো নিজেই মুছে নিল। আর সেই দুঃখী নারীর মাতৃহৃদয় তখন তীব্র-ভাবে উতলা হয়ে উঠলো। অতি কষ্টে ঢোক গিলে বলল, "একটু দাঁড়াও। দেখি শিউচ্ছায়ের কাছ থেকে কিছু ধার পাই কিনা।"

এ ঘটনার পর মাত্র কয়েকটা দিন কেটেছে। ছেলের অসুস্থতার কথা ভেবে ভেবে ক্রীতদাসী মা ক্রমেই আনমনা হয়ে পড়ছে। এর মধ্যে বসন্ত মণির আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। এক রাত্রে বিছানায় শুয়ে শিউচ্ছায় তাকে জিজ্ঞাসা করল, "সবুজ জেড পাথরের যে আংটিটা তোমাকে আমি দিয়েছিলাম সেটা কোথায় ?"

"শরৎ-সোনার জন্মদিনের সেই রাত্রে আমি সেটা আমার স্বামীকে দিয়ে দিয়েছি। আংটিটা বাঁধা রেখে সে কিছু টাকা সংগ্রহ করবে।"

শিউচ্ছায় অস্বস্তিতে অধীর হয়ে বলে উঠলো, "আঃ, তুমি শুধু তোমার প্রথম স্বামী আর প্রথম সন্তানের কথাই ভাবছো। আমি যে তোমার জন্য কত ব্যাকুল সেদিকে তোমার ভ্রূক্ষেপ নেই। বেশ, আমি ভেবেছিলাম তোমাকে আরও দু'বছর রাখবো। এখন দেখছি তার আর দরকার নেই। তুমি বরং এই বসন্তের প্রথম দিকে চলে যাও।"

ভাগ্য বিড়ম্বিতা নারী তখন বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে চোখের জল ফেলতে লাগল। কয়েকদিন পরে শিউচ্ছায় আবার আংটির কথা উল্লেখ করল, "তুমিতো জাননা, ঐ আংটিটা ছিল অমূল্য সম্পদ। আমি ওটা তোমাকে দিয়েছিলাম এই ভেবে যে, আংটিটা দিয়ে তুমি শরৎ সোনাকে আশীর্বাদ করবে। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, সুযোগ পেয়েই তুমি টাকার বিনিময়ে ঐ আংটিটা বন্ধক দেবে। ভাগ্যিস আমার গিন্নী কিছু জানেনা। টের পেলে তার কোঁদল তিন মাসেও থামবে না।"

শিউচ্ছায়ের কাছ থেকেও যখন ছোট খাট আঘাত আসতে লাগল তখন থেকেই ক্রীতদাসী নারীর দাসত্বের ব্যথা নির্মম হয়ে উঠল। শুধু মনই নয় ক্রমে তার শরীরও ভেঙে পড়তে লাগল। মুখশ্রী বিবর্ণ পাণ্ডুর হয়ে গেল। চোখের দৃষ্টিতে নীরস কারুণ্য দেখা দিয়েছে। বিদ্রূপ আর অশ্লীল গালাগালি শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। তার ওপর বসন্তমণির অসুখের কথা ভেবে ব্যথায় তার বুক ফাটে। দুই চোখ শুধু বাইরে পথের দিকে নিবিষ্ট হয়ে থাকে। যদি তাদের গাঁয়ের কোন লোক এই পথ দিয়ে যায়। তার কাছে থেকে যদি বসন্তমণির কোন খবর পাওয়া যায় এই আশায়। ছেলের অসুখ এতদিনে সম্পূর্ণ সেরে গেছে কিনা জানবার জন্য মন বড় উতলা। কিন্তু কোন খবর সে পেলনা। কতবার তার মনে হয়েছে আর দুই এক য়্যুয়ান শিউচ্ছায়ের কাছ থেকে ধার নিয়ে বসন্তমণির জন্য কিছু খেলনা পাঠিয়ে দিতে পারলে ভাল হত। মা কাছে নেই, বাবা বাড়িতে থাকেনা, কি নিয়ে রোগা ছেলেটা দিন কাটায়! টাকা হয়ত পাওয়া যাবে কিন্তু ছেলের খেলনা পৌঁছে দেবার লোক পাওয়া যাবেনা। শরৎ-সোনাকে কোলে নিয়ে বাড়ির দরজায় বসে পথের দিকে তাকিয়ে থাকা, পথচারীদের যাওয়া-আসা লক্ষ্য করা এখন তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। এ বাড়ির গিন্নী এসব মোটেই পছন্দ করেনা। সে বার বার স্বামীর কাছে নালিশ জানায়, "চোখের মাথা খেয়ে কি দেখতে পাওনা? তোমার ভাড়া করা সোহাগিনীর মন উচাটন হয়েছে। এখন তার একদণ্ডও মন টিক্‌ছেনা। পুরনো স্বামীর স্বাদ পাওয়ার জন্য

পাখা মেলে উড়ু উড়ু করছে।"

গভীর রাতে কখনও কখনও শরৎ-সোনাকে বুকে চেপে ধরে স্বপ্নের ঘোরে মা কেঁদে উঠেছে। তাতে শরৎ-সোনা ভয় পেয়ে চিৎকার করেছে। আর শিউচ্ছায়েরও ঘুম ভেঙে গেছে। শিউচ্ছায় প্রশ্ন করে, "কি হয়েছে? রোজ রাতে এত কান্নাকাটি কেন?"

ছেলের মা কোন জবাব দেয়না, অ'া-অ'া করে শরৎ-সোনাকে ঘুম পাড়ায়। শিউচ্ছায় বার বার প্রশ্ন করে, "তুমি স্বপ্নে এমন আর্তনাদ করে ওঠ যে, আমার ঘুম ভেঙে যায়। কি দেখছো স্বপ্নে? তোমার বড় ছেলে মারা গেছে?"

মহিলা আর চুপ করে থাকতে পারেনা। সে বলে, "আমার মনে হল, আমি এক ভয়াবহ কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।"

গৃহস্বামী অবশ্য এরপর আর কোন প্রশ্ন করল না। কিন্তু ছেলের মা সেই কবরের দৃশ্যের কথা ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে পড়লো। তার মনে হল, এভাবে আর বেঁচে থাকা কেন? ঐ কবরে যেতে পারলে প্রাণটা জুড়োয়।

শীতকাল শেষ। ছোট পাখীরা ইতিমধ্যেই জানলার আশে পাশে উদাস সুরে বিদায়ের গান শুরু করেছে। তাও মতাবলম্বী পুরোহিত এলেন বাড়িতে। প্রচলিত বিধি অনুযায়ী তিনি প্রথমে শিশুকে অন্য খাদ্য খাওয়ালেন। এর উদ্দেশ; শিশু আজ থেকে মায়ের দুধ ছেড়ে দিল। পুরোহিত শিশুকে নবজীবনে প্রবেশ করালেন। শাস্ত্রবিধি মতে আচার আচরণের মধ্য দিয়ে গর্ভধারিণী মায়ের সঙ্গে শিশুর চিরবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত পাকাপাকি হয়ে গেল। তারপর নির্দিষ্ট দিনটি উপস্থিত হল র'াধুনী ওয়াঙ্ মেয়ে শিউচ্ছায়ের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, "একটা ডুলি ডাকবো?"

বুড়ী স্তোত্র জপ করতে করতে বলল, "আরে না। হেঁটেই যাক। বাড়িতে পৌঁছে ডুলিওয়ালাকে ভাড়া দিতে হবে না? ওর ভাড়া দেবার মুরদ আছে? যার স্বামী দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায়না তার বৌয়ের এত বিলাসিতার দরকার কি? দশ মাইল পথ এমন কিছু দূরত্ব নয়। ওর মত বয়সে আমিও রোজ দশ থেকে পনের মাইল পথ হাঁটতাম। ওর পা দু'টো তো আমার চেয়ে লম্বা। এটুকু পথ হাঁটতে ওর অর্ধেক দিনও লাগবে না।"

সকালবেলা শরৎ-সোনাকে পোশাক পরাতে পরাতে মায়ের দুই চোখে অশ্রুর স্রোত বয়ে গেল। অবুঝ শিশু মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নিত্যদিনের মত আধো আধো সুরে ডাকছিল, "মাসী···! মাসী···!"

শিউচ্ছায় গিন্নী গর্ভধারিণী মাকে হুকুম করেছিল শিশুকে মাসী ডাক শেখাবার জন্য। কারণ শরৎ-সোনা তো তাকেই মা ডাকবে। ছেলের মাসী ডাকে মা কে'দে কে'দে সাড়া দিচ্ছিল। মা ছেলেকে বোঝাতে চাইলো,

"তুই তো কিছুই বুঝতে পারছিস না মানিক। এই অভাগিনী মায়ের সঙ্গে তোর . চিরবিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। এ বাড়ির মা-ই তোর মা। তার কাছেই তোকে মানুষ হতে হবে। কোনোদিন তার অবাধ্য হস্‌নে বাবা। তোর চিরদুঃখী মায়ের কথা কখনও মনে আনিস্‌না।"

মায়ের কান্নার মধ্যেই কথাগুলো বোবা হয়েছিল। দেড় বছরের শিশুর কাছে এসব কথার মূল্য কি? বিদায়ক্ষণের একটু আগে শিউচ্ছায় বিষণ্নমুখে মহিলার পাশে এসে দাঁড়ালো। তার হাতে ছিল কিছু খুচরো পয়সা। সে ভদ্রভাবেই বলল, "পয়সা ক'টা নাও। এতে দুই য়্যুয়ান আছে।"

বন্ধকী মা ছেলের জামার বোতাম এঁটে দিতে দিতে হাত বাড়িয়ে পয়সা ক'টা নিয়ে নিল। আর নীরবে নিজের জামার ভেতরের পকেটে সযত্নে রেখে দিল এই দয়ার দান। এই সময় স্বামীর দয়া দাক্ষিণ্যের প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টি হেনে বুড়ী গিন্নী স্বশরীরে উপস্থিত হল। স্বামীকে একটুও আমল না দিয়ে সে অসহায়া মহিলার প্রতি বাক্যবাণ ছুঁড়ে দিল, "আর মায়া কেন? ছেলেকে আমার কোলে দাও। তোমার যাবার সময় আবার ছেলেটা কেঁদে না ফেলে।"

গর্ভধারিণী মা হয়েও ছেলের সম্বন্ধে তার বলার কিছু নেই। অবোধ শিশু কিছুতেই মায়ের কোল থেকে যেতে চাইল না। ছোট্ট হাত দিয়ে বুড়ীর গালে প্রতিবাদের ছোট্ট ছোট্ট চাপড় মারতে লাগল। বুড়ী রেগে গিয়ে বলল, "ও যখন আসতেই চাইছে না তখন ওকে নিয়ে ঘরে গিয়ে জলখাবারটা না হয় খেয়েই যাও।"

খাবার দিতে এসে রাঁধুনী ওয়াংঙ্‌ মেয়ে বলল, "পেট ভরে খেয়ে নাও বাছা। সারাদিন তো হাঁটতে হবে। গত দু সপ্তাহ ধরে তুমি তো কিছু খাচ্ছোই না। একেবারে রোগা হয়ে গেছ। আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখেছ কখনও? আজ অন্ততঃ পুরো এক বাটি ভাত খেয়ে নাও। দশ মাইল হেঁটে যাওয়া কি মুখের কথা!'

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে সে উদাস কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা জানালো, "তোমার কথা আমি ভুলবনা।"

বাইরে কড়া রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। আবহাওয়া বেশ উজ্জ্বল। শরৎ-সোনা তখনও মাকে ছাড়তে চাইছে না। বুড়ী তখন ক্ষিপ্ত হয়ে ছেলেটাকে নিল মায়ের কোল থেকে। শিশু প্রাণপণে চেঁচায় আর ছোট্ট পা দিয়ে বুড়ীর পেটে ঘন ঘন লাথি মারে। কচি হাত দিয়ে বুড়ীর মাথার চুল টানে। অসহায়া মা তখন সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে অতি কাতর কণ্ঠে মিনতি জানাল, "দুপুরের খাওয়া অবধি তোমরা আমাকে থাকতে দাও।"

একথা শুনে বুড়ী গিন্নী অসভ্য বর্বরের মত চিৎকার করে উঠলো,

"হারামজাদী, এই মুহূর্তে তোর পোঁট্‌লা পুঁট্‌লী নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা। দুপুরের খাওয়া অবধি, তারপর রাতের শোয়া অবধি, অহো! কত আব্দার।"

বুড়ীর চিৎকারে তার দুই কানে যেন তালা লেগে গেল। সেই মুহূর্তে শিশুর কান্নাও তার কানে এলোনা। নিজের পুরনো কাপড় চোপড়ের পুঁটলিটা বাঁধতে বাঁধতে তার ছলছল চোখ দুটো শেষবারের মত বাড়িটা দেখে নিল। বাড়ির অন্দর মহল থেকে শিশুর কান্না আবার তার কানে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। রাঁধুনী ওয়াঙ্‌ মেয়ে তাকে সান্ত্বনা দেবার ছলে পেছনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল কি কি জিনিস সে নিয়ে যায়। তারপর দেখা গেলো ধীরে ধীরে ছোট্ট বোঁচকাটি বগলদাবা করে ক্রীতদাসী মা এ বাড়ির বন্ধন ছিন্ন করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে।

সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতেও শরৎ-সোনার কান্না তার কানে এসেছিল। এমনি ক্লান্ত ধীর পদক্ষেপে সে যতক্ষণে এক মাইল পথ পার হয়েছে সারাক্ষণই তার মনে হয়েছে শিশুর কান্না দুই কানে তেমনি বাজছে। আগুন ঝরানো তেজী রোদ্দুরে তার সামনের পথ যেন আর ফুরোতে চায়না। অসীম আকাশের মত এ পথেরও বুঝি আর শেষ নেই। কোন এক অজানা নদীর পার ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় এসে দেখল নদীর খাঁড়ি অঞ্চলের জল স্ফটিকের মত টলমল করছে। জলে ঝাঁপ দিয়ে সে তার এই মর্মান্তিক পথ চলার অবসান ঘটাতে চাইল। কিন্তু পারল না। শান্ত স্রোতস্বিনীর পাশে কিছুক্ষণ বসে তার মন বদলে গেল। আবার সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে শরীরটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

দুপুর পেরিয়ে যাবার পর এক গাঁয়ের এক বৃদ্ধ চাষার কাছ থেকে জানতে পারল, এখনও পাঁচ মাইল পথ বাকি। সে বিনীত হয়ে সেই বৃদ্ধ চাষীকে বলল, "পো ফু' [জেঠা মশাই] আমি আর হাঁটতে পারছি না, কোথাও থেকে আমাকে একটা ডুলি সংগ্রহ করে দিতে পারেন ?"

"তুমি কি অসুস্থ ?"

"হ্যাঁ।"

তার শরীর তখন এত ক্লান্ত যে, সে আর দাঁড়াতে পারলনা। গ্রামে ঢোকবার মুখে একটা ঢালু চত্বরের ওপর বসে পড়ল।

বৃদ্ধ চাষী তাকে আবার জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কোথা থেকে আসছো ?"

প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে সে বলল, "এই দিকেই আমার বাড়ি। আমি বাড়ি যাচ্ছি। সকালে রওনা দেবার সময় ভেবেছিলাম এটুকুন পথ হেঁটে যেতে পারব।"

মহিলার অবস্থা দেখে বৃদ্ধের মায়া হল। সে তখন পাশের গ্রাম থেকে একটা ঢাকনা ছাড়া ডুলি আর দুইজন বাহক যোগাড় করে দিল।

বেলা গড়িয়ে প্রায় চারটা বেজে গেছে। ডুলিবাহকরা একটা গ্রামের সঙ্কীর্ণ নোংরা রাস্তার মোড়ে ডুলিটা কাঁধ থেকে নামিয়েছে। ডুলির মধ্যে মাঝবয়সী মহিলা ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়েছে। তার মুখশ্রী বিবর্ণ ফ্যাকাশে, বাঁধাকপির খোলার মত হলদে। দুই চোখ নির্লিপ্ত নীমিলিত। নিশ্বাস প্রশ্বাস অতি ক্ষীণ। রাস্তার লোকজন তাকে অবাক হয়ে দেখছিল। এক দঙ্গল ছেলে মেয়ে চেঁচামেচি করতে করতে ডুলি বাহকদের পিছনে পিছনে ছুটছিল। মনে হচ্ছিল যেন সহসা গ্রামের মধ্যে কোন অলৌকিক বস্তুর আবির্ভাব হয়েছে। ছেলেদের দঙ্গলে বসন্তমণিও ছিল। ডুলিওয়ালাদের পিছনে সেও হ্যাট হ্যাট করতে করতে শুয়োর তাড়ানোর মত তাড়া করছিল। কিন্তু ডুলিওয়ালারা যখন তাদেরই বাড়ির দিকে মুখ ফেরালো তখন সে বিস্ময় বিহ্বল চোখে দুই হাত কেমন প্রসারিত করে থমকে দাঁড়ালো। ডুলিটা যখন তাদের দোর গোড়ায় থামল তখন সে একটা বাঁশের খুঁটির সঙ্গে হেলান দিয়ে বোকার মত তাকিয়ে রইল। অন্য ছেলেমেয়েরা ভীরু পায়ে এক জায়গায় জড় হয়েছে। মহিলা ডুলি থেকে নেমে বসন্তমণিকে সেখানে দেখে অতিশয় মর্মাহত হল। তার পরণে ছিল ময়লা পোশাক, রুক্ষ অবিন্যস্ত চুল। তিন বছর আগে লম্বায় যেটুকু দেখে গেছে প্রায় সেইটুকুনই আছে। চেহারাটা আরও রুগ্ন। সহসা সে কান্নাভরা আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকলো, "বসন্তমণি!"

ছেলেমেয়েরা সকলেই ভয়ে চমকে উঠলো। বসন্তমণিরও চাপা আতঙ্ক। সে এক দৌড়ে ঘরে গিয়ে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরলো। আর সেই হতভাগিনী মা নোংরা আলোবাতাস বিবর্জিত স্যাঁতসেতে ঘরের এক কোণে বিমর্ষ ও স্তম্ভিত হয়ে পড়ে রইল। অনেক অনেকক্ষণ এমনি কাটলো। স্বামী স্ত্রীর কেউই কথা বলতে পারলনা। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ক্রমেই ঘনিয়ে এসেছে তখন তার স্বামী হতাশাবনত মাথা সামান্য তুলে স্ত্রীকে বলল, "এভাবে বসে না থেকে রাতের রান্নার ব্যবস্থা কর।"

এই বিষণ্ন পরিবেশের গুমোট কাটিয়ে ওঠবার জন্য মহিলা তখন জোর করে উঠে ঘরের কোণে চালের হাঁড়িটা হাতড়ে দেখে আবার ফিরে এলো। তারপর অস্ফুট ধরা গলায় বলল, "কি রাঁধবো? চালের হাঁড়ি যে খালি।"

স্বামী কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, "চালের গোলাওয়ালার বাড়ি থেকে ফিরে এসেছো তো তাই খুঁজে পাচ্ছনা। ওই কোণায় সিগারেটের লম্বা ঠোঙাটা

দেখতে পাচ্ছ তো, ওর মধ্যেই এবেলার চাল আছে।"

খাওয়া দাওয়ার পর রাতে বাপ ছেলেকে বলল, "বসন্তমণি, আজ তুমি মার সঙ্গে ঘুমাও।"

ছেলে উনানের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল। মা কাছে গিয়ে আদর করে বলল, "বসন্তমণি, আমার সোনা!"

ছেলে ক্রমেই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। মা যখন বেশী আদর করতে আরম্ভ করল তখন সে সেখান থেকে দৌড়ে পালাল। অনেক দুঃখে কেঁদে কেঁদে মা বলল, "এরি মধ্যে ভুলে গেছো?"

ধূলো ময়লা আর ঝুল জড়ানো সঙ্কীর্ণ খাটিয়ায় শুয়ে মায়ের চোখে ঘুম আসেনা। কত আদরের প্রথম সন্তান বসন্তমণি মায়ের পাশে শুয়ে আছে অচেনা অপরিচিতের মত। ভাবতে ভাবতে এক সময় মনে হল, শরৎসোনাই তার পাশে শুয়ে আছে। কি মিষ্টি নাদুস নুদুস ননীর মত শরীর। মাতৃস্নেহের আকুতি নিয়ে তন্দ্রার ঘোরে সে যে তাকে কত আদর করল। বুকের আরও কাছে টেনে নিয়ে কতবার হাত বুললো তার গায়ে।

শান্ত শীতল সীমাহীন রাতের অন্ধকার ভ্রূক্ষেপহীন ভাবে সময়ের বুকে বয়ে চলেছে।

অনুবাদ / সুখলাল

ক্ষত।। নর্মান বেথুন

মাথা ওপরে কেরাসিনের বাতিটা একটা উজ্জ্বল মৌচাকেব মতো নাগাড়ে গুঞ্জন সৃষ্টি করছে। মাটির দেওয়াল। মাটির মেঝে। মাটির বিছানা। সাদা কাগজের জানলা। রক্ত আর ক্লোরোফর্মের গন্ধ। ঠাণ্ডা। ভোর তিনটে, ১লা ডিসেম্বর, উত্তর চীন, লিন চু'র কাছে অষ্টম রুট বাহিনীর সঙ্গে।

ক্ষত-সমেত মানুষ।

ক্ষতগুলো ক্ষুদ্র শুষ্ক পুষ্করিনীর মতো কালো-খয়েরি মাটি মাখামাখি। ক্ষতগুলোর কিনারা ছেঁড়াখোঁড়া, কালো পচের ঝিল্লিযুক্ত। পরিপাটি ক্ষত, তারই নীচে গভীরে লুকিয়ে রেখেছে পুঁজ, বাঁধ-বাঁধা নদীর মতো বৃহৎ সবল মাংসপেশী আর তার চারপাশ কুরে চলেছে, উষ্ণ স্রোতস্বিনীর মতো মাংসপেশী ঘিরে তার মাঝ দিয়ে প্রবাহিত। ক্ষত, বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে, পচনশীল অঁকিড বা দলিত কার্নেশন, রক্ত-মাংসের বীভৎস পুষ্প। ক্ষত, দলা দলা কালো রক্ত বমনকারী, অমঙ্গলসূচক গ্যাসের বুদবুদ মিশ্রিত, দ্বিতীয় দফার এখনো ক্ষান্তিহীন রক্তস্রাবের তাজা ঝলকের ওপর ভাসমান।

পুরনো নোংরা ব্যাণ্ডেজগুলো চামড়ার উপর রক্ত-আঠায় চিটিয়ে রয়েছে। সাবধান। আগে বরং ভিজিয়ে নাও। উরুর মাঝ দিয়ে। পা'টা তুলে ধরো। এ তো দেখা যাচ্ছে বিরাট একটা ঢলঢলে লাল মোজার মতো। কি ধরনের মোজা? বড়দিনের মোজা। সেই সবল সুন্দর হাড়ের ডাণ্ডাটা বর্তমানে কোথায়? ডজন খানেক টুকরোয় পরিণত। আঙুলে করে এগুলো কুড়িয়ে নাও, কুকুরের দাঁতের মতো সাদা, তীক্ষ্ণ ও এবড়ো-খেবড়ো। এবার স্পর্শ করে দ্যাখো। আর কিছু পড়ে রইল কি? হ্যাঁ, এই যে। সব কটা হ'ল? হ্যাঁ। না না। এইখানে আরেকটা টুকরো। এই মাংসপেশীটা কি নিষ্প্রাণ? চিমটি কাটো ওখানে। হ্যাঁ, এটা নিষ্প্রাণ। কেটে বাদ দিয়ে দাও। এটা সারবে কি করে? এককালের অত শক্তিশালী আর বর্তমানের এই ছিন্নভিন্ন, এই ক্ষতিগ্রস্ত, এই ধ্বংসপ্রাপ্ত মাংসপেশীগুলো কি করে তাদের সগর্ব আকর্ষণশক্তি ফিরে পাবে? টেনে ধরা, আলগা দেওয়া। টেনে ধরা, আলগা দেওয়া। কি মজাই

না ছিল। এখন আর তা হবার নয়। এখন তা বিনষ্ট। এখন আমরা শেষ হয়ে গেছি। এখন আমরা নিজেদের নিয়ে কি করবো?

পরের জন। একেবারে শিশু যে! সতেরো! পেটে গুলিবিদ্ধ। ক্লোরোফর্ম। তৈরি? পেরিটোনিয়ালের উন্মুক্ত গহ্বর থেকে বেগে গ্যাস বেরোচ্ছে। পায়খানার গন্ধ। প্রসারিত অন্ত্রের গোলাপী নাড়ি। চারটে ছিদ্র। ওগুলো বুজিয়ে দাও। ফিতের বাঁধন পাকিয়ে নাও। বস্তিদেশ স্পঞ্জ ক'রে দাও। নল। তিনটে নল। বন্ধ করা কঠিন। ওকে গরম রাখো। কি ভাবে? ওই ইঁটগুলো গরম জলে ডুবিয়ে দাও।

পচ হচ্ছে অলক্ষ্যে বিস্তারশীল এক চতুর ব্যক্তি। এই লোকটা কি জীবিত? হ্যাঁ, বেঁচে আছে। কারিগরী অর্থে এখনো জীবিত। নাড়ির মধ্যে দিয়ে ওকে নুন-জল দাও। ওর দেহের অসংখ্য ক্ষুদ্র কোষগুলো হয়তো খেয়াল করতে পারবে। হয়তো স্মরণে আসবে উষ্ণ লবণাক্ত সমুদ্রের কথা, পিতৃপুরুষের বাড়ির কথা, প্রথম খাদ্য-গ্রহণের কথা। নিযুত বছরের স্মৃতি সমৃদ্ধ কোষগুলো হয়তো স্মরণ করবে অন্যান্য জোয়ার ভাঁটার কথা, অন্যান্য সমুদ্রের আর সমুদ্র ও সূর্য হতে প্রাণের জন্মলাভের কথা। ফলে ওরা হয়তো ওদের ক্লান্ত ক্ষুদ্র মাথা উঁচু করবে, প্রাণ-ভরে পান করবে, জীবন ফিরে পাবার জন্যে আবার জুড়ে দেবে সংগ্রাম। এরকম একটা ফল পাওয়া যেতেও পারে।

আর এই একজন। ওকি আর কখনো ফসল তোলার সময় ওর বলদটার পাশে পাশে ছুটবে, আনন্দে খুশীতে চেঁচাতে চেঁচাতে? না, ও আর কোনদিন দৌড়বে না। এক পায়ে দৌড়নো যায় নাকি? ও কি করবে? কেন, বসে বসে অন্য বাচ্চাদের দৌড় দেখবে। তুমি আমি যা ভাববো, ও-ও তাই ভাববে। করুণা ক'রে কি লাভ? ওকে করুণা ক'রো না। করুণা ওর আত্মোৎসর্গকে ছোট করবে। চীনকে রক্ষা করতে চেয়েই ও এই কাজ করেছে। ওকে কোলে তুলে নিয়ে সাহায্য করো। আরে, এ তো শিশুর মতো হালকা! হ্যাঁ, তোমার শিশু, আমার শিশু।

মানব দেহ কি অপূর্ব, এর অঙ্গগুলো কি নিখুঁত, কি নির্ভুল এর গতিবিধি, কি বাধ্য, গর্বিত ও সবল। আর কি ভয়ানক যখন ক্ষত-বিক্ষত! জীবনের ক্ষুদ্র শিখাটি ম্লান থেকে ম্লানতর হয়, তারপর দপ ক'রে জ্বলে উঠে নিবে যায়। নিবে যায় যেমন মোমবাতি নিবে যায়। শান্তিতে সুস্থিরে। ফুরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে সে তার প্রতিবাদ জানায়, তারপর আত্মসমর্পণ। যা বলার ব'লে নেয়, তারপর নীরব।

আরো আছে? চারজন জাপানী বন্দী। ওদের ভেতরে নিয়ে এসো। এখানে এই যন্ত্রণার সমাজে কেউ কারুর শত্রু নয়। রক্তমাখা পরিচ্ছদটা কেটে

ফেল। ওই রক্তস্রাবটা বন্ধ করো। অন্যদের পাশে ওদের শুইয়ে দাও আরে, এদের যে ঠিক ভাইয়ের মতো দেখাচ্ছে! এই সৈন্যরা কি পেশাদার নরঘাতক? না, এরা অপেশাদার সৈন্য। হাতগুলো মেহনতী মানুষের। এরা সৈন্যের সাজে শ্রমিক।

আর নেই। সকাল ছ'টা। সত্যি, কী ঠাণ্ডা এই ঘরটা! দরজাটা খুলে দাও। ওই দূরে গাঢ়-নীল পাহাড়টার ওপরে, পুবের দিকে একটা ম্লান আবছা আলোর রেখা দেখা দিচ্ছে। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই সূর্য উঠবে। শয্যাগ্রহণ ও ঘুম।

কিন্তু ঘুম আসবে না। এই নিষ্ঠুরতার, এই বোকামির কারণ কি? জাপান থেকে নিযুত মেহনতী মানুষ এলো নিযুত চীনা মেহনতী মানুষকে হত্যা বা ক্ষত বিক্ষত করতে। জাপানী শ্রমিকরা কেন আক্রমণ করবে তাদেরই শ্রমিক ভাইদের, যারা স্রেফ বাধ্য হয়েই আত্মরক্ষা ক'রে চলেছে? চীনাদের মৃত্যুর ফলে জাপানী মেহনতী মানুষেরা কি লাভবান হবে? না, লাভবান হওয়া আদৌ সম্ভব নাকি? তাহলে ঈশ্বরের দোহাই, বলো না কার লাভ হবে? এই খুনে অভিযানে জাপানী শ্রমিকদের পাঠানোর জন্যে কে দায়ী? এর থেকে কার লাভ? কি করে জাপানী শ্রমিকদের রাজী করাতে পারলো চীনা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে—ওদেরই দরিদ্র ভাই, ওদেরই দুঃস্থ সঙ্গীদের বিরুদ্ধে?

এটা কি সম্ভব যে অল্পসংখ্যক ধনী ব্যক্তি, এক সংখ্যালঘু শ্রেণীর জন্য কয়েক এক নিযুত দরিদ্র মানুষকে রাজী করিয়েছে আরেক নিযুত মানুষের ওপর আক্রমণ চালনায়, তাদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে? যাতে ধনীরা আরো ধনবান হতে পারে?

ভয়ঙ্কর চিন্তা! ওরা কি করে এই দরিদ্র মানুষদের চীনে আসতে রাজী করাল? সত্যি কথাটা জানিয়ে দিয়ে? না, সত্যটা জানলে এরা কখনোই আসতো না। ওদের কি সে সাহস ছিল যে এই মেহনতী মানুষদের বলে, ধনীরা কেবল সস্তা কাঁচামাল, আরো বড় বাজার, আরো বেশী মুনাফাই চায়? না, ওরা এদের বলেছে যে পাশবিক যুদ্ধটা "জাতির অদৃষ্টে" আছে, এই লড়াই "সম্রাটের গৌরবের" জন্যে, এই লড়াই "রাষ্ট্রের সম্মানে", এই লড়াই তাদের "রাজা ও রাজ্যের" জন্য।

মিথ্যা! নারকীয় মিথ্যা!

যত অন্যায় আগ্রাসী যুদ্ধের—যেমন এই যুদ্ধটার হোতাদেরও খুঁজে বার করা উচিত। খুঁজে বার উচিত তাদেরই মধ্যে থেকে যাদের এই অপরাধের মাধ্যমে লাভবান হবার সুযোগ রয়েছে। যেমন খুঁজে বার করা হয় হত্যা

ইত্যাদি অন্যান্য অপরাধের হোতাদের। জাপানের আট নিযুত মেহনতী মানুষ, গরীব চাষী, কারখানার বেকার শ্রমিক—এরা কি লাভবান হবে? আগ্রাসী যুদ্ধের তামাম ইতিহাসে, স্পেনের মেক্সিকো বিজয় থেকে ইংলণ্ডের ভারত দখল, ইটালীর ইথিয়োপিয়া ধর্ষণ—কোথাও কি দেখা গেছে যে এইসব "বিজয়ী" রাজ্যের শ্রমিকেরা লাভবান হয়েছে? না, এ ধরনের যুদ্ধে এরা কখনো লাভবান হয় না।

নিজেদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদই কি জাপানের মেহনতি মানুষের ভোগে লাগছে? ভোগে লাগছে কি সোনা, রূপো, লোহা, কয়লা, তেল? বহুপূর্বেই এই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ওদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখন এর মালিক ধনীরা, শাসক শ্রেণী। আর যে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ওই খনিগুলো চালায় তারা চরম দারিদ্র্যে দিন কাটায়। কাজেই চীনের সোনা, রূপো, লোহা, কয়লা আর তেলের সশস্ত্র লুণ্ঠন বাবদ ওরা কি ক'রে লাভবান হবে? এক দেশের ধনী মালিকেরা নিজেরা মুনাফা লুটবে বলেই না অন্য দেশের সম্পদ করায়ত্ব করতে চাইছে? এরা কি চিরকালই তাই করেনি?

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে জাপানের যুদ্ধবাজ আর পুঁজিপতিরাই সেই একমাত্র শ্রেণী যারা এই গণহত্যার, এই আইন-সিদ্ধ উম্মাদনার দরুণ লাভবান হতে পারে। ওই ধর্ম অনুমোদিত নরহত্যা, ওই শাসক শ্রেণী, আদত রাষ্ট্রই আজ আসামীর কাঠগড়ায়।

তাহলে কি আগ্রাসী যুদ্ধ, উপনিবেশ বিজয়ের যুদ্ধ, এ-সবই কেবল জাঁদরেল ব্যবসা? হ্যাঁ, তাই মনে হবার কথা। মিথ্যেই জাতীয় অপরাধের এই সব উদ্যোক্তারা চেষ্টা করছে গালভরা নানা অন্তঃসারশূন্যতার আর আদর্শের নিশানের পিছনে তাদের আসল উদ্দেশ্য গোপন করার। ওরা যুদ্ধ করে মানুষ মেরে বাজার দখল করতে, কাঁচামালের জন্যে করে ধর্ষণ। ওদের কাছে বিনিময়ের চেয়ে চুরিটাই সহজ, কেনার চেয়ে সহজ খুন করা। এই হল যে কোন যুদ্ধের গোপন রহস্য। ব্যবসা। মুনাফা। মুনাফা। রক্ত-মুদ্রা।

সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে সেই ব্যবসার আর রক্তের ভয়ঙ্কর নির্দয় দেবতা যার নাম মুনাফা। চির ক্ষুধার্ত শিশু-রক্তপিপাসু দেবতার মতোই অর্থ চায় সুদ, চায় প্রতিদান। এবং এই লালসা মেটাবার জন্যে সে করবে না হেন কাজ নেই, লক্ষ লক্ষ নরহত্যা পর্যন্ত। সৈন্যবাহিনীর পিছনে থাকে যুদ্ধবাজরা। যুদ্ধবাজদের পিছনে লগ্নী পুঁজি আর পুঁজিপতিরা। রক্তসূত্রে ভাই, অপরাধের সূত্রে সাথী।

মানব জাতির এই শত্রুদের চেহারাটা কি রকম? ওরা কি কপালের ওপর কোন চিহ্ন রাখে যাতে দেখেই চেনা যায়, এড়িয়ে চলা যায় আর

অপরাধী বলে অভিযুক্ত করা যায় ? না। উলটে ওরাই হচ্ছে সম্মানিত জন। ওদের শ্রদ্ধা করা হয়। নিজেদের ওরা ভদ্রলোক বলে থাকে এবং অন্যেরাও ওদের ওই নামেই ডাকে। শব্দটার কি হাস্যকর প্রয়োগ! ভদ্রলোক! এরাই রাষ্ট্রের খুঁটি। ধর্মের খুঁটি, সমাজের খুঁটি। এরা এদের বাড়তি ধনসম্পদ থেকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দয়া-দাক্ষিণ্য চালায়। প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থ সাহায্য করে। এরা এদের ব্যক্তিগত জীবনে দয়ালু ও বিবেচক। এরা আইন মানে, নিজেদের আইন, সম্পত্তির আইন। কিন্তু একটা চিহ্ন আছে যা দেখে এই ভদ্র বন্দুকধারীদের চেনা যায়। ওদের আর্থিক লাভের বহর কমিয়ে দেবে বলে ভয় দেখাও অমনি ওদের মধ্যকার পশুটা একটা ক্রুদ্ধ গর্জন করে জেগে উঠবে, ওরা বর্বরদের মতো নিষ্ঠুর হয়ে দাঁড়াবে, পাগলদের মতো পাশবিক, ঘাতকদের মতো অনুতাপশূন্য। মানব জাতিকে যদি অগ্রসর হতে হয় তবে এই এদের মতো লোকগুলোকে বিলোপ করা দরকার। এরা যতদিন বাঁচবে পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি আসবে না। মানব সমাজের যে-যে প্রতিষ্ঠান এদের বাঁচবার অনুমতি দেয় সেগুলোকে অবশ্যই লোপ করতে হবে।

এই লোকগুলোই ক্ষত সৃষ্টি করে।

অনুবাদ / সিদ্ধার্থ ঘোষ

লু শুন (১৮৮১—১৯৩৬)

চেচিয়াঙ জেলায় শাও শিঙে জন্ম। প্রকৃত নাম চৌ সু রেন। পিতামহ পিকিঙে উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী। ঘুষের দায়ে ধরা পড়ে ঠাকুর্দা যখন জেলে যান লু শুন তেরো বছরের কিশোর। সেই সময় বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তিন বছরের ভাই মারা যায়। লু শুনের মা (পারিবারিক নাম লু) ছিলেন এক কৃষক রমণী। মার দৃঢ়তা এবং অধ্যবসায়ের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় লু শুনের কর্মবহুল জীবনে। আঠারো বছর বয়সে লু শুন তাঁর গ্রাম দেশ ছেড়ে নানকিঙে চলে আসেন নৌ-বাহিনীর শিক্ষায়তনে ছাত্র হয়ে। পরবর্তীকালে জাপানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র থাকা কালীন রুশ-জাপান যুদ্ধের ওপর একটি "ল্যাণ্টার্ন স্লাইড"-এ চীনের সাধারণ মানুষের মুণ্ডচ্ছেদের দৃশ্য দেখে তাঁর মন গভীর ভাবে আলোড়িত হয়। শরীরযন্ত্রের চিকিৎসক যে আগামী দিনে মানব মনের চিকিৎসক হবেন এই সত্যটি সেই দিনই নির্ধারিত হয়ে যায়।

১৯০২ সালে লু শুন টোকিও থেকে ফিরে এসে জীবিকা হিসেবে নিজের জেলায় শিক্ষকতা শুরু করেন। পিকিঙ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমেত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন তিনি এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেন, জার্মান এবং রাশিয়ান ভাষা থেকে প্রচুর অনুবাদ করেন। ১৯২১ সালে তাঁর 'আ কিউ-এর সত্য কাহিনী' প্রকাশিত হলে কথ্য ভাষা 'পাই হুয়া' প্রবর্তনের জন্য বিপ্লবী আন্দোলন নতুন মদৎ পায়। রম্যাঁ রলাঁ বলেছিলেন এই গল্পটি তাঁকে এতই নাড়া দেয় যে তিনি শেষ পর্যন্ত অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। এডগার স্নো বলেছেন, সাহিত্য শৈলীর বিচারে তিনি 'চীনের শেকভ' আর সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের বিচারে 'চীনের গর্কি'। তাঁর রচিত গ্রন্থ তালিকায় আছে, নতুন আঙ্গিক 'ৎসা-কাম' (বিক্ষিপ্ত চিন্তা)-এ লেখা 'বুনো ঘাস', 'চীনা গদ্য সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' ও কয়েকটি গল্প ও প্রবন্ধ সঙ্কলন। 'উৎসবের দিন' কাহিনীটি

স্বল্প পরিচিত। পিকিঙ থেকে প্রকাশিত 'লু শুন-এর নির্বাচিত গল্প' বা 'নির্বাচিত রচনা সম্ভার'-এর মধ্যে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। 'চায়না রিকন্স্ট্রাক্ট'-এর একটি পুরানো সংখ্যায় গল্পটির প্রথম ও একমাত্র ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। 'উপদেশ' গল্পটি 'লু শুন : নানা লেখা' থেকে গৃহীত।

কুয়ো মো জো (১৮৯২—১৯৭৮)

কুয়ো মো-জো-র জন্ম সেছুয়ান-এ। স্কুল ছাড়ার আগেই তিনি জাপানে যান চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে। টোকিওতে পড়াশোনা শেষ করে জাপানী স্ত্রীকে নিয়ে চীনে ফিরে আসেন। কুয়োমিনতাঙ্ আমলে প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত হন। এই সময়ে তাঁর নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা বেরোয়, ফলে আবার জাপানে চলে যেতে বাধ্য হন। এই সময় কুয়োমিনতাঙ্ তাঁর দশটি গ্রন্থ এবং কিছু অনুবাদের কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

কবি, নাট্যকার, সাহিত্য সমালোচক, অনুবাদক, ছোট গল্পকার কুয়ো মো-জো প্রত্নতাত্ত্বিক হিসেবেও বিখ্যাত। হুনান অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার সম্পর্কে তিনি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা চীনা সাহিত্য আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছে। বর্তমান গ্রন্থের 'সংশয়' গল্পটি এডগার স্নো সম্পাদিত 'লিভিঙ চায়না' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

মাও তুন (১৮৯৬—)

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে চেচিয়াঙ প্রদেশের তুঙ্ শিয়াঙ্ জেলায় মাও তুনের জন্ম হয়। মাও তুন আসলে সেন ইয়েন-পিঙ-এর ছদ্মনাম। কখনো কখনো অবশ্য তিনি 'পু লাও' বা 'পিঙ শেঙ' নামেও লিখেছেন। চেঙ চেন-তো, ইয়ে শেঙ্-তাও এবং অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে একজোট হয়ে মাও তুন্ ১৯২০ সালে 'সাহিত্য গবেষণা সংস্থা' স্থাপন করেন। কমার্সিয়াল প্রেস থেকে প্রকাশিত 'নভেল্স্' নামে একটি সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন ১৯২১ সাল থেকে। এরই মাধ্যমে তিনি সামন্ততন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদীদের অবক্ষয়ী সাহিত্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন।

১৯২৬-২৭ সালে 'মিন-কুয়ো-জি-পাও' নামক বৈপ্লবিক দৈনিক কাগজটির

সম্পাদক ছিলেন মাও তুন। ১৯২৭ সালে চিয়াঙ্-কাই-শেক ক্ষমতা দখল করলে নির্মম অত্যাচার নেমে আসে কমিউনিস্ট এবং প্রগতিশীল ব্যক্তি এবং সংস্থার ওপর। মাও তুন তখন হ্যাংকাও ছেড়ে সাংহাইতে চলে আসতে বাধ্য হন। তখন থেকেই তিনি মাও তুন ছদ্মনামে লিখতে শুরু করেন।

১৯৪৯ সালে গণ প্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রীত্বের পদে অধিষ্ঠিত হন।

মাও তুন লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে 'মিডনাইট' নামে একটি উপন্যাস ও গল্প সংকলন 'স্প্রিং সিল্কওয়ার্মস অ্যাণ্ড আদার স্টোরিজ' ইংরাজীতে ভাষান্তরিত হয়েছে। আধা সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ঔপনিবেশিক চীনা সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব অন্তর্দ্বন্দ্বের অনবদ্য লিপিকার মাও তুন।

লাও শ (১৮৯৯—১৯৬৬)

লাও শ বা শু শে-ইয়ু'র জন্ম একটি মাঞ্চু পরিবারে। তিনি ১৮৯৯ সালে পিকিঙে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব বা কৈশোর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। 'পেই-চিঙজেন' (পিকিঙ-থেকে-এক-ব্যক্তি) নামে তিনি অধিক পরিচিত। নর্মাল স্কুলের মেধাবী ছাত্র লাও শ নামকুই মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী কালে ১৯২৬ সালে ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন লণ্ডন স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজের চীনা ভাষার শিক্ষক হিসাবে। প্রবাসেই তিনি প্রথম উপন্যাস লেখেন—'লাও চাঙের দর্শন'। লাও শ'-এর অধিকাংশ রচনাই পিকিঙ শহরের পটভূমিতে রচিত। ১৯৩০ সালে তিনি চীনে ফিরে এসে সিনানে চিলু বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পরে শান তুঙ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ নেন। এই সময়ে তাঁর লেখা 'রিক্সাওয়ালা' উপন্যাসটি স্বর্গত শ্রদ্ধেয় শ্রী অশোক গুহ বাংলায় অনুবাদ করেন এবং তা প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় তিনি 'অল চায়না অ্যাসোসিয়েশান অফ রাইটার্স অ্যাণ্ড আর্টিস্টস'-এর হয়ে কাজ করেন। চীনের মুক্তিলাভের পর তিনি পিকিঙে বসবাস শুরু করেন। এই সময়ে রচিত 'ড্রাগন বিয়ার্ড ডিচ' নামে একটি নাটকও বাঙলায় অনূদিত হয়েছিল। পুরানো সমাজের সঙ্গে নতুন সমাজের সংঘাতের মধ্যে দিয়ে লাও শ মানব মনের পরিবর্তন ও নতুন সমাজের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ফুটিয়ে তোলেন। শ্লেষাত্মক সরস রচনায় তাঁর একটি নিজস্ব শৈলী আছে।

রৌ শ্রি (১৯০১—১৯৩১)

চাও ফি-ফু'র ছদ্মনাম রৌ শ্রি। ১৯০১ সালে চীনের চেচিয়াঙ্‌ প্রদেশের কোন এক ছোট্ট শহরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তিনি প্রাদেশিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে একটি ট্রেনিং কলেজে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তারপর শিক্ষকতার পেশা বেছে নেন। কিছুদিনের জন্য রৌ-শ্রি চেচিয়াঙ্‌-এ নিঙহায় জেলার শিক্ষা দপ্তরে কমিশনারের কাজ করেছিলেন। এই সময়ে চীনের বিভিন্ন চিন্তানায়কদের বাস্তবধর্মী চিন্তা ধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজের আমূল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি লেখনী ধারণ করেন।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে, চীনের প্রতিবিপ্লব শেষ হবার পর শাংহাই প্রদেশে এক বামপন্থী লেখক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। রৌ-শ্রি ছিলেন সেই গোষ্ঠীর অন্যতম তৎপর লেখক। কুয়োমিনতাঙ্‌ এই গোষ্ঠীর সভ্যদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডাদেশ জারী করে। ঐ বছর জানুয়ারি মাসেই বৃটিশ পুলিশ শাংহাই আন্তর্জাতিক চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে রৌ-শ্রিকে চীনা সৈন্যদের হাতে তুলে দেয়। পরে নানকিঙ্‌ থেকে সরকারী নির্দেশ জারি হলে ১৯৩১ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী লুঙ্‌হোয়া গ্যারিশন তাঁর মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করে। একই সঙ্গে নিহত হন আরো পাঁচজন সাহিত্যিক। রৌ শ্রি-র অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে 'ফেব্রুয়ারি', 'গ্রেট ইম্‌প্রেশান' ও 'ডেথ অফ দা ওল্ড অর্ডার'। তবে এই গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত গল্পটিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলেছেন এডগার স্নো। এডগার স্নো সম্পাদিত 'লিভিঙ চায়না'-র গল্পটির শিরোনাম ছিল 'স্লেভ মাদার'। ভ্রমবশতঃ গল্পটির শিরোনাম ছাপা হয়েছে— 'মা / জৌ শি'। অনুবাদটি 'পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

শেন ৎসুঙ্‌—ওয়েন (১৯০২—)

পশ্চিম হুনানের এক গ্রামের মানুষ শেন-ওয়েন। বছর কুড়ি বয়স পর্যন্ত আধুনিক চীনের সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কয়েকটি পত্র পত্রিকা পড়ে তিনি এই সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসেন এবং লেখক হবার বাসনা নিয়ে পিকিঙে যাবেন স্থির করেন।

ছ' বছর বয়সে আঞ্চলিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম পাঠ শুরু করেন। ঠাকুর্দা ছিলেন কোয়াইচৌ (Kweichow)-র রাজ্যপাল, পিতা সৈন্য বাহিনীর পদস্থ কর্মচারী। বারো বছর বয়সে সামরিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে প্রেরিত

হন। দু বছর পরে সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে হুয়াই-হুয়াতে যান—ষোল মাস সেখানে থাকতে হয়। এখানে থাকাকালীন সাতশো মানুষের মস্তকচ্ছেদ প্রত্যক্ষ করেন। পরে তিনি হুনানের রাজস্বঅফিসে যোগ দেন। মাত্র বাইশ বছর বয়সে 'মডার্ন ক্রিটিক' পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত হন। তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'পিকিঙ্ মরনিং নিউজ'-এ তিঙ্ লিঙ্, হু হুয়ে পিন প্রভৃতির সঙ্গে। 'লাল এবং কালো' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি চালাতে তাঁকে দেউলে হতে হয়। ১৯২৪—১৯৩২ সালের মধ্যে তিনি চল্লিশটি বই প্রকাশ করেন। 'বন্দরে নাবিক' গল্পটি এডগার স্নো সম্পাদিত 'লিভিঙ চায়না' গল্প সংগ্রহ থেকে নেওয়া। ইংরাজিতে অনূদিত লেখকের গল্প সঙ্কলন "The Chinese Earth"-এ একই গল্পের একটি ঈষৎ ভিন্ন রূপ দেখা যায়। বাহুল্যবর্জিত শাণিত ভঙ্গি তাঁর রচনা শৈলীর বৈশিষ্ট। পশ্চিম হুনানের চেন নদী অঞ্চলের আকাশ বাতাস মাটির উজ্জ্বল প্রতিফলক তাঁর সাহিত্য-কর্ম। সৈনিক, ভবঘুরে, আদিবাসী ইত্যাদিরা তাঁর প্রিয় চরিত্র। তাঁকে অনেকে চীনের 'ডুমা' বলে থাকেন।

শা টিঙ (১৯০৫—)

চীনের সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে সেছুয়ান প্রদেশে জন্ম। চেঙ্তু'র প্রাদেশিক নর্মাল স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েই লিখতে শুরু করেন। ১৯৩২ সালে তাঁর প্রথম গল্প সঙ্কলন 'বিয়নড্ দা ল' প্রকাশিত হওয়া মাত্র সাহিত্য ক্ষেত্রে স্বীকৃতি লাভ করেন। শা টিঙের উলেখযোগ্য রচনার মধ্যে আছে তিনটি উপন্যাস—'অরডিয়াল', 'গোল্ড মাইনারস্' ও 'দা সোলজারস্'। তিনি চীনা লেখক গোষ্ঠীর চুঙকিঙ শাখার চেয়ারম্যান ছিলেন। 'শারদ রাত্রি' গল্পটি ১৯৪৪ সালে রচিত।

লাও শিয়াঙ

ওয়াঙ শিয়াঙ-চেন-এর ছদ্মনাম। লাও শিয়াঙের খ্যাতি সরস রচনার জন্য। গ্রামে জন্ম এবং গ্রামাঞ্চলেই প্রতিপালিত। ১৯৩০-এর দশকে তিঙশিয়েন-এ পরীক্ষামূলক ভাবে গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তার সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল জড়িত ছিলেন। সেই সময়েই এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'ইস্কুল বিদায়' গল্পটি রচিত। বর্তমান ভারতের গ্রামীণ শিক্ষা-

ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করলে বিস্মিত হতে হয় যে, পঞ্চাশ বছর আগেকার চীনা সমাজের সঙ্গে 'আধুনিক' ভারতীয় সমাজের কি বিস্ময়কর সাদৃশ্য ! গল্পটি এডগার স্নো সম্পাদিত 'লিভিঙ চায়না' গ্রন্থ থেকে গৃহীত ।

চুন–চান ইয়ে

এই সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত লেখকের গল্পটি স্বর্গত সর্বজন শ্রদ্ধেয় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত 'নতুন চীনের ছোটগল্প' নামে বই থেকে নেওয়া হয়েছে। সুদক্ষ অনুবাদক পবিত্র বাবু বাঙলা সাহিত্যে গোর্কিকে প্রথম নিয়ে আসেন, নিয়ে আসেন আধুনিক চীনা সাহিত্যর জনক লু শুন-কে (আ-কিউ এর প্রকৃত কাহিনী)। নতুন চীনের গল্প সংগ্রহও তিনিই প্রথম হাজির করেন ১৯৪৮ সালে বাঙালী দরবারে। চীন তখন মুক্তির শেষ লড়াই লড়ছে। চুন-চান ইয়ে-র পরিচিতি পবিত্র বাবুর ভাষাতেই তুলে দিচ্ছি ঃ

"তরুণ লেখক। যুদ্ধারম্ভে ছিলেন তোকিওতে। সেখানে জাপানীদের হাতে মার খান। পরে চীনে ফিরে মুক্তি বাহিনীতে যোগ দেন, চীনা যুদ্ধ সংবাদ-প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। তখনি তাঁর লেখা ইংরেজিতে অনূদিত হচ্ছে। ১৯৪৫-এ তিনি যখন কেমব্রিজে ইংরেজি সাহিত্যের গবেষণা করছেন তখন এ গল্পটি তাঁর প্রকাশিত হয় পেঙ্গুইনের 'নিউ রাইটিঙ্'—১৬শ সংখ্যায়।"

নর্মান বেথুন (১৮৯০—১৯৩৯)

কানাডার সন্তান হয়েও বেথুন সেই কমিউনিস্টদের একজন যাঁকে বিশেষ কোনো দেশের সীমারেখার বাঁধনে বন্দী করা যায়না। পৃথিবীর তামাম মানচিত্রে মানুষের জীবন সংগ্রাম যেখানেই তাঁকে দাবী করেছে, তাঁকে আমরা সেখানেই পেয়েছি। সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, যে-কোন ন্যায় সংগ্রামের অক্লান্ত নির্ভীক যোদ্ধা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন থোরেসিক সার্জেন ও শল্যচিকিৎসক বেথুন গেছেন স্পেনে, উঠতি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, এসেছেন চীনে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনযুদ্ধের মুক্তিযোদ্ধা হয়ে। কম্যুনিস্ট আদর্শের উজ্জ্বল উদাহরণ নর্মান বেথুন চিকিৎসা ক্ষেত্রের বাইরেও কবি, চিত্রকর, সৈনিক এবং শিক্ষক হিসাবে স্বাক্ষর রেখে

গেছেন। চীনা মানুষ ভেবে পেতনা কোন নামে তাঁকে ডাকবে কারণ তাদের সব ডাকগুলিই হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত—

ডঃ বেথ্যুন, আমাদের শিক্ষক।

ডঃ বেথ্যুন, আমাদের সহযোদ্ধা।

ডঃ বেথ্যুন, আমাদের চিকিৎসক।

ডঃ বেথ্যুন, আমাদের বন্ধু।

ডঃ বেথ্যুন, আমাদের আদর্শ।

ডঃ বেথ্যুন, আমাদের কমরেড।

লাল ফৌজের চিকিৎসক হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ বলি দেন ডক্টর বেথ্যুন। যুদ্ধক্ষেত্রে বেথ্যুনের নিত্য সহচর তুং (যাঁকে বেথ্যুন তাঁর 'দ্বিতীয় সত্তা' বলে সম্বোধন করতেন), বেথ্যুনের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বলেছিলেনঃ আমাদের সকলেরই একটা জীবন, কিন্তু পাই চু এন-এর অনেক জীবন। সমগ্র চীনের মানুষের কান্নাও আমাদের সেই শোককে শান্ত করতে পারবে না…

পিকিঙের কাছে শি চা চুয়াঙ-এ আজো সারা দুনিয়া থেকে মানুষ এসে নীরবে মাথা নত করে দাঁড়ায় তাঁর স্মৃতিসৌধে, গ্রানাইট পাথর দিয়ে ঢাকা কবরের সামনে। তাঁর পাশেই সেখানে শায়িত আছেন ভারতের সন্তান আরেকজন আন্তর্জাতিক মানুষ—ডক্টর কোটনিস। নর্মান বেথ্যুনের কাছ থেকে কাজ বুঝে নিতে যাবার পথে তিনি নিহত হন।

নর্মান বেথ্যুনের অবিস্মরণীয় জীবনের স্মরণীয় জীবনী 'দা স্ক্যাল্‌পেল্‌, দা সোর্ড' সম্প্রতি বাঙলায় 'মহাচীনের পথিক' নামে অনূদিত হয়েছে।